জান্‌বিবি

অর্থাৎ

ভারতের অতীত ও ভবিষ্যত ইতিহাস।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু

প্রণীত।

ঢাকা—সূত্রাপুর হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩২৫

মূল্য—দেড় টাকা।

কলিকাতা,

৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে

শ্রীহরিচরণ রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

যাঁহারা "হিন্দু" অথবা "মুসলমান" থাকিয়াও "ভারতবাসী" থাকিতে দ্বিধা বোধ করেন না একমাত্র তাঁহাদেরই প্রীতি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। ভগবান আমার জন্মভূমিকে শান্তিময় করুন, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

বিনীত—

শ্রীগ্রন্থকার।

জান্‌বিবি।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাবনা।

অনন্তরূপিণী প্রকৃতি-দেবীর মানস-রচিত অট্টালিকায় আজ দেব-সভা আহূত হইয়াছে। চারিদিকে বিজলি-জড়িত সজল-জলদ-নির্ম্মিত প্রাচীর, প্রাচীরে রামধনু-বর্ণে জগত-বৈচিত্র্য চিত্রিত রহিয়াছে। সম্মুখে হৃদি-নিহিত স্ফুটতর-বৃত্তি-গঠিত উদ্যান; উদ্যানে কোথাও সোহাগ-শিশির-সিক্ত সলজ্জ কুসুম-কলিকা প্রীতিপূর্ণ চাহনি লইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে, কোথাও অন্তঃসার সমন্বিত পুষ্পিত বৃক্ষ ডালে ডালে ঐশ্বর্য্য-গরিমা প্রকটিত করিয়া বিরাজ করিতেছে, আর আবেগ-ভ্রমর মুগ্ধ নয়নে তাহাদের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বৃক্ষের শাখে শাখে কর্ম্মফল প্রসবিত—অথচ পৌরুষ-কাক তাহাতে বৃথা চঞ্চুস্ফুট করিতে চেষ্টা করিতেছে। জ্ঞান-সূর্য্যের প্রতিভালোকে দশদিক আলোকিত, সর্ব্বত্রই হাসির বিজলি মাখা, সব হৃদয়ই ভরপুর। আশা-মলয়-বাতে সকলেই হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া উঠে, আবার নির্ব্বাণ-হিল্লোলে কোথায় একটীর পর একটী করিয়া বিলীন হইয়া যায়।

পার্শ্ব দিয়া আকাঙ্ক্ষা-সরিৎ প্রবাহিত। তাহাতে বিষাদ-প্রীতি-নিস্থৃত অশ্রুরাশি উলটি পালটি মিলিয়া মিশিয়া চলিয়াছে। ও পারেই প্রেতভূমি—পার প্রয়াসী মানব হৃদয় একটীর পর একটী আসিয়া তাহা উল্লম্ফনে এড়াইতে প্রয়াস পায়। যে শক্তিশালী, সে কৃতকার্য্য হয়, আর যে অশক্ত তাহার ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী।

এহেন মানস রচিত অট্টালিকায় বিধাতা-পুরুষ আসীন। চারিদিক হইতে প্রাণী জগতের অজস্র প্রীতির উৎস আসিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে বিলীন হইয়া যাইতেছে। সর্ব্বত্রই অচিন্তনীয়, স্বতঃ-চালিত ঘূর্ণায়মান সৃষ্টি-যন্ত্র স্থাপিত, তাহাতে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়—মাহাত্ম নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু বিধাতা পুরুষ অ-স্থির। ব্রহ্মাণ্ড-প্রান্তস্থিত সামান্য আণুবিক কীটানুর দীর্ঘ নিশ্বাস আসিয়াও তাঁহার আসন টলাইয়া দেয়, আর্ত্তের হা হা রবে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, বিপন্নের সাহায্যে তিনি হস্ত প্রসারিত করেন, জগতের মঙ্গলার্থে তাঁহার জড়ত্ব প্রাপ্তি। পৃথিবীতে যে যত বড় পরদুঃখকাতরতাও তাঁহার তত বেশী।

চারিদিক নীরব; কিন্তু ভাব-মুখর নীরবতাই এই স্থানের বিশেষত্ব। বর্ষনান্তে নিস্তব্ধ বর্ষা-রজনীতে নীরবতার যে স্নিগ্ধতা,উর্ম্মি বিলীন সাগর-বক্ষে স্থির চন্দ্রালোকে পরিস্ফুট নীরবতার যে সাত্ত্বিক ভাব, প্রথম সোহাগতৃপ্ত বালিকা বধুর রঞ্জিত বদন কমলে নীরবতার যে মনোহারিত্ব, এখানে প্রতি অণুপরমাণুতে তাহাদের সকলের একত্র সমাবেশ রহিয়াছে। সকলেই উৎফুল্ল এবং উৎকণ্ঠিত। এমন সময় বিধাতাপুরুষ গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বক্তব্য তোমার, প্রতীচ্যা সুন্দরি।"

গৃহের নিভৃত কোনে দীনবেশা এক রমণী উলঙ্গ সন্তান কোলে লইয়া বসিয়াছিল। প্রশ্ন শুনিয়া সে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দীন-নয়নে চাহিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—"কি বক্তব্য আমার তাহা কি আপনার বিদিত

নাই! পিতঃ, আপনার সৃষ্টিরাজ্যে সামান্য কীটাণুরও একটা পৃথক সত্ত্বা আছে, কিন্তু আমার প্রতি এই কঠোর বিধান কেন? আমরা সকলেই আপনার সৃষ্ট; অথচ কোন্ পুণ্যবলে প্রাচ্যা ও মধ্যাদিদি জ্ঞান-গরিমা-ভূষিতা, ঐশ্বর্য্যবতী? আমার কি মুক্তি হইবে না?"

শুনিয়া বিধাতা পুরুষ হাসিয়া অন্যত্র চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বক্তব্য তোমার, মধ্যা সুন্দরি?

প্রশ্নমাত্রে সে সগর্ব্বে উঠিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—"প্রতীচ্যার অভিযোগ শুনিয়া আমার হাসি পায়! আমি বড়—আমার সন্তান সন্ততি সাগর সেচিয়া রত্ন কুড়াইয়া আনে, সৃষ্টি খুঁজিয়া তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া বেড়ায়, হৃদয় কর্ষণ করিয়া তাহাতে সুবৃত্তি-বীজ বপন করে। আর প্রতীচ্যা, যাহার ছেলে আজও কাপড় পরিতে জানে না—সে কিনা আমাদের দিকে চাহিয়া হিংসায় জর্জ্জরিত হয়!—দেখ্, প্রতীচ্যে, বিধাতার প্রিয় পাত্রী হইয়া আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমি ছাড়া পৃথিবীর সব হেয়, বিধাতার অভিশাপগ্রস্ত। অতএব তোর্ বামন হইয়া চাঁদে হাত দেওয়ার প্রয়াসটা আমার তত ভাল লাগে না দাসী-বৃত্তি করিতে সৃষ্ট হইয়াছিস্, চিরদিন দাসী-বৃত্তি করিয়াই কাটাইয়া যা। শুধু উন্নত হৃদয়ের বড়াই করিয়া আর কি হইবে।"

বিধাতা পুরুষ বিরক্তি সহকারে অন্যত্র চাহিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বল মা তুমি, প্রাচ্যা সুন্দরি?"

সভার মধ্যস্থলে সু-উচ্চ আসনে উপবিষ্ট এক রমণী বিরাজ করিতে ছিলেন। তাঁহার অলকদাম প্রভাত-সূর্য্য-কিরণ-জালে রঞ্জিত, বক্ষঃস্থল উদ্যানজাত ফল-ফুলাদিতে সুশোভিত, গাত্র ষড়ৈশ্বর্য্য-জড়িত। বীণা-নিন্দিতস্বরে তিনি উঠিয়া বলিলেন,—"বিধিলিপি কখনও মিথ্যা হইবার নহে। প্রভাত-সূর্য্য যেমন প্রাচ্য-গগনে উদিত হইয়া, মধ্যাহ্নের মধ্যদিয়া

পশ্চিম প্রান্তে হেলিয়া পড়ে, তেমতি এই সাহিত্য-বিজ্ঞান-জড়িত জ্ঞান-রাশি প্রথমতঃ আমাতে উৎপন্ন হইয়া, মধ্যার মধ্য দিয়া, অবশেষে প্রতীচ্যার রাজ্যে প্রচার হইবে ইহাইত আপনার বিধান। তবে প্রতীচ্যার এই অভিযোগের আমিত কোন কারণ দেখিতে পাই না! আজ আমি, কাল মধ্যা, আবার দুদিন পরে প্রতীচ্যাই সকল অধিকার করিয়া বসিবে। তবে তাহার এই কাতর ক্রন্দন কেন ?

অমনি নিয়তি-দেবী উঠিয়া বলিলেন,—"সে যাহা হউক, আমাদের আদেশ, তোমরা শিখাইয়া পড়াইয়া প্রতীচ্যাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লও।"

প্রাচ্যা—"আমি তাহা পারিব না। "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্রং" এই নীতি বাক্যের উপর আমার অস্তীত্ব স্থাপিত। যাহা হইবে তাহা হইবেই; আমার মতে, তাহার জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়া আর কি হইবে! আমার কর্ত্তব্য, আমি নির্জ্জনে বসিয়া এক একটী করিয়া যাবতীয় তত্ত্বসংগ্রহ করিয়া রাখিব, কে শিখিল, বা কাহাকে শিখাইতে হইবে তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার আমার আবশ্যক নাই। প্রতীচ্যা ইচ্ছা করিলে আমার নিকট আসিয়া জ্ঞান-ভিক্ষা করিয়া লইয়া যাইতে পারে—আমি উপযাচিকা হইয়া কাহারও নিকট আত্ম-গরিমা গাহিয়া বেড়াইতে পারিব না।"

প্রতীচ্যা—"আমি ভিক্ষা করিয়া কাহারও নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই।"

মধ্যা—"তবে চিরদিনই দাসীবৃত্তি করিতে প্রস্তুত থাক।"

প্রতীচ্যা—"গর্ব্ব করিও না দিদি, এমন দিনও আসিতে পারে যখন তুমিও আমার নিকট উপযাচিকা হইয়া থাকিতে পার।"

মধ্যা—"কি ছোট মুখে বড় কথা! এইরূপ প্রগল্‌ভতার এই পরিণাম!" এই বলিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় মধ্যা সেই দেবসভামাঝে প্রতীচ্যাকে লাঞ্ছিত করিল।

বিধাতাপুরুষ নীরবে সব দেখিতেছিলেন। এখন গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"শুন তোমরা, সৃষ্টির নিয়ম এই যে, জ্ঞানী অজ্ঞানকে শিখাইয়া নিজের সমকক্ষ করিয়া তুলিবে; কারণ, এইরূপ পরস্পর উন্নতিতেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনায়াস-সাধ্য হইয়া আসে। এই বিশ্বাসেই প্রাচ্যা ও মধ্যাকে এতদিন উচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু এখন দেখা গেল যে তাহারা এই পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য। আজ বিনা দোষে প্রতীচ্যাকে লাঞ্ছিত করিয়া তাহারা যে পাতক অর্জ্জন করিল যুগযুগান্তরব্যাপী এইরূপ শত শত লাঞ্ছনায় তাহাদের সেই পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আজ হইতে প্রাচ্যা ও মধ্যা পরস্পর বিভিন্নজাতিতে পরিণত হইল; তাহাদের সন্তানগণ পরস্পর বিরুদ্ধমতের সমর্থন করিয়া পরস্পরের নির্য্যাতনে উভয়েই হতশ্রী হইয়া পড়িবে। আর যাও প্রতীচ্যে, আজ হইতে তুমি উন্নতিশীলা। যদিও প্রাচ্য-পরিত্যক্ত জ্ঞানই তোমার গৌরবের বিষয় হইবে, তথাপি ভূতলস্থ জল যেমন বাষ্পীভূত হইয়া পুনরায় নব বারিরূপে পৃথিবীতে গৃহীত হয়, সেইরূপ প্রাচ্যের জ্ঞানই অলক্ষিতে তোমার মধ্য দিয়া পুনরায় নূতন বলিয়া সকলের নিকট আদৃত হইবে। অতএব যাও ভাগ্যবতি, এই বাগানে প্রবেশ করিয়া তোমার ইচ্ছানুরূপ যাহা ইচ্ছা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাও। আর সর্ব্বোপরি প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে আমি তোমাকে এইটী উপহার দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি একতানাম্নী তাঁহার পার্শ্বচরীকে প্রতীচ্যার অনুগমন করিতে আদেশ করিলেন। একীভূত-হস্ত-পদ-দেহ সেই চেতনাকে হৃদয়ে ধরিয়া হাসিতে হাসিতে প্রতীচ্যা চলিয়া গেল।

বিধাতাপুরুষ—"কি, তোমরা দাঁড়াইয়া রহিলে যে?"

চক্ষুজলে ভাসিতে ভাসিতে প্রাচ্যা ও মধ্যা উত্তর করিল—"আমাদের কি উন্নতি হইবে না?"

পরদুঃখকাতর হৃদয়ে সেই স্বরও বাজিল। তিনি বলিলেন—

"তোমাদেরও উন্নতি হইবে। আপাততঃ তোমরা মানবোচিত গুণগ্রাম ভুলিয়া অবনতির সর্ব্বনিম্ন সোপানে অবতরণ করিবে সত্য, কিন্তু যদি কোন দিন একতা বলে উভয়ে উভয়কে ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করিতে পার, সেই দিনই তোমাদের উন্নতি হইবে।"

অবশেষে কালভেরী বাজাইয়া সেদিনের মত সভা ভঙ্গ করা হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

মন্ত্রণা।

"হ্যা, জীবন, ওখানে বসিয়া করিস্ কি" ?

"কেন দুপুর বেলা হ'য়েছে, আর রান্না করিয়া খাব না" ?

"মর, আজ যে তোর একাদশী, কাল এত করিয়া বলিয়া দিয়াছি, আর আজ কিনা তুই তাহাই মনে রাখিতে পারিলি না! তোর হ'ল কি" ?

"কি আর হবে? এই যা দেখ্‌ছ, তাই। আমি এখন মাটির পুতুল হইয়াছি, উপরে শুধু রঙ মাখা।"

"কিন্তু তা বলিয়া কি একেবারে ধর্ম্মকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে হয়?"

"নাগো, তোমার ধর্ম্ম হারিয়ে আমার লাভ! এই দেখ আমি অধর্ম্মের কিছুই করিতে চাহি না"। এই বলিয়া মেয়ে আধসিদ্ধ ডালভাত ফেলিয়া দিয়া, বাসনপত্র ধুইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল, পরে নিজ শয়নকক্ষে যাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

সেদিন মাঘমাসের প্রথম শুক্লৈকাদশী। হিন্দুর ঘরে ঘরে এই ব্রত অতি সন্তর্পণে উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। অনেকেই যখন সেইদিন নিরম্বু-পবাসে দিন কাটাইতেছিল, তখন হিন্দু-গ্রামের এক নিভৃত পল্লীতে, মা ও মেয়েতে উল্লিখিতরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

মেয়ের বয়স ষোড়শ বৎসর, মা প্রৌঢ়া। উভয়েই বিধবা, কিন্তু মেয়ের সবেমাত্র ছয় মাস হইল এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কোমল-হৃদয় পাঠক, ষোড়শী রমণীর বৈধব্যের কথা শুনিয়া হয়ত অশ্রুজলে

আপনার চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল! কিন্তু আমার দোষ কি? যেমনটী হইয়াছে, আমি তেমনটীই লিখিলাম। তারপরও যদি আমাকে সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় যে এই ষোড়শী রমণী আবার সুন্দরী ছিলেন—এমন সুন্দরী যে অপনার গিন্নি দেখিলেও তাহাকে হিংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না, তখন কি আপনি আমাকে শুধু নিষ্ঠুর বলিয়াই ক্ষান্ত হইবেন? আমার যাহা হয় হউক, কিন্তু আমি চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করিরা বলিতেছি যে জীবন বড়ই সুন্দরী ছিল। সেই সৌন্দর্য্যের তান, লয়, সুর, ঝঙ্কার, লিখিয়া বুঝাইবার জিনিষ নহে, অনুভব করিবার জিনিষ। দৈত্যসংহার মানসে ব্যস্ত বিধাতা-পুরুষ ব্যস্ততর হস্তে তিল তিল বস্তু সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমা-মূর্ত্তি গঠন করিয়াছিলেন, কিন্তু পৃথিবী মোহিত করিবার জন্য আপনার অবসর সময়ে অতি নির্জ্জনে বসিয়া শত শত অত্যুৎকৃষ্ট বস্তুর সমবায়ে তিনি জীবনকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই তাহাকে 'শতোত্তমা' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুধে আলতা ও আলতায় দুধ মিশ্রিত করিয়া, বিশ্লেষিত সূর্য্যকিরণে সিক্ত করতঃ, নন্দনবনের চিরবসন্ত-বিরাজিত প্রকৃতির মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া, মদনের পরামর্শানুযায়ী শিরীষ-সুকুমার তুলিকা-সাহায্যে তিনি জীবনের প্রতি অঙ্গ চিত্রিত করিয়াছেন! সেই অঙ্গগুলি নবনীত, সুকুমার, সুগঠিত, সুবিন্যস্ত ও পর্য্যায়ক্রমিক সমতানে স্থাপিত—যে স্থানেই দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে বিচিত্র সংমিশ্রণে এই সকল উপাদানগুলি একত্র এইরূপ জড়ীভূতভাবে অবস্থান করিতেছে যে তাহাদের পৃথক অস্তিত্ব নাই, অথচ সকলের সমকালীন উত্তেজনায় হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া যায়! তারপর, যদি কখনও কোকিলের পঞ্চম রাগের অনুকরণ করিতে যাইয়া মাঝখানে থামিয়া বুঝিয়া থাক, 'ঐ স্থানের ঝঙ্কারটী আরও একটু কম্পিত হইলে ভাল হইত' তবেই বুঝিতে পারিবে যে জীবনের কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। যদি কখনও হরিণ-নয়নে তাকাইয়া

অনুভব করিয়া থাক, 'ঐ স্থানের তরলতাটুকু আরও একটু সজল, স্বচ্ছ হইলে বেশ মানাইত' তবেই বুঝিতে পারিবে জীবনের চক্ষু অপার্থিব। যদি মরাল-গতি দেখিয়া তোমার সাধ না মিটিয়া থাকে, তবে একবার জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তোমার মানবজন্ম সার্থক মনে করিবে। যদি উদ্যাম-সৌদামিনী-লীলা দেখিয়া তোমার অতৃপ্তবক্ষ রুদ্ধশ্বাসে পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে জীবনের অঙ্গপ্রতি নিরীক্ষণ কর, সেখানে স্থির বিজলী-জড়িত হাবভাব দেখিতে পাইবে, কিন্তু আমার ভয় হয়, পাছে তোমার অস্তিত্বটুকু তাহাতে বিলীন হইয়া যায়! সৃষ্টির চাকচিক্য ও জড়জগতের আকর্ষণ লইয়া জীবন সৃষ্ট হইয়াছিল—কাহার এমন ক্ষমতা যে সেই আকর্ষণে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারে।

এহেন অনিন্দ্যসুন্দরী জীবনের সহিত অদূরবর্ত্তী গ্রামস্থ বড় বাড়ীর এক ছেলের বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যৌবনপ্রাপ্তির অত্যল্প কাল পরেই জীবন বিধবা হইল। তখন শরৎকাল, জীবনের শ্বশুরের চণ্ডীমণ্ডপে সুসজ্জিতা দশভূজা প্রতিমা বিরাজ করিতেছিল। জীবন রাত্রে চুপি চুপি আসিয়া উপরিস্থ মহাদেব পাড়িয়া ভগবতীর সম্মুখে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল; বলিল, "বেটী, আমি হলেম বিধবা, আর তুই স্বামিপুত্রসহ আসিয়া এখানে পূজা খাইবি? এই দেখ, আমারও যেই দশা, তোরও তাহাই।" এই বলিয়া যাবতীয় পুত্তলিকার মুণ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়া সে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

ইহার পর হইতে জীবন হিন্দুধর্ম্মে বড় বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল; এমন কি অনায়াসসাধ্য একাদশীটাও করিতে চাহিত না। গুরুজনেরা এজন্য তাহাকে সর্ব্বদাই তিরস্কার করিতেন কিন্তু জীবন শুনিয়াও শুনিত না। আজ দুদিন যাবৎ মা মেয়েকে অনেক বুঝাইয়া অন্ততঃ একাদশীর উপবাসটা করাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। জীবন চুপ করিয়া সব শুনিতেছিল

দেখিয়া মাতা বুঝিলেন, মেয়ের বুদ্ধি ফিরিয়াছে। অতএব প্রভাতে উঠিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে কার্য্যব্যপদেশে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, মেয়ে পাকের উদ্যোগ করিয়া বসিয়া আছে! তখন প্রতিবাদ করিতে যাইয়া মেয়ের নিকটে তিনি যে উত্তর পাইয়াছিলেন, তাহাই পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

জীবন সব নষ্ট করিয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। ভাবিতে লাগিল "আমার যাহা হয় হউক, প্রাণ থাকিতে আমি হিন্দুর দেবতা পূজা করিতে পারিব না। দেবতাই যদি থাকিবে, তবে আমার এই দশা হইবে কেন? এত কান্নাকাটি করিলাম, কৈ একটুকুত দেবতার প্রাণে বাজিল না; আর বাজিবেই বা কি প্রকারে? মাটীর গড়া পুতুল বৈ ত নয়! বুক চিরিয়া দেখিলেও কর্কশ মাটী বাহির হইয়া পড়ে। একবার দেখিতে হইবে হিন্দুধর্ম্মের কত বড়াই! এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিব, তবে জানিবে আমার নাম জীবন। আর সবত এক রকম আগেই ঠিক হইয়া গিয়াছে।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে জীবন উঠিয়া বসিল। পরে এক মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া জল সহযোগে তাহা পান করিল। মনে মনে বলিল "আমার ত এখনও ক্ষিধে পায় নি! কিন্তু কিছু না খাইলে পাছে ব্রত রক্ষা হয়! তাহা আমি পারিব না।"

মাতা আসিয়া অনেকবার ডাকিয়া গেলেন, তথাপি জীবন উঠিল না। তিনি আর একবার আসিয়া নারায়ণ পূজার চরণামৃত ও নির্ম্মাল্য রাখিয়া গেলেন। জীবন অবসর মত চরণামৃত বাহিরে ফেলিয়া দিল; নির্ম্মাল্য পদদলিত করিয়া ফেলিল।

অবশেষে সন্ধ্যা সমাগত হইল, মাতা অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া মেয়েকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু জীবন উঠিল না। অবশেষে

রাগ করিয়া "সারাদিন উপবাসের পর আর আমি বায়না করিতে পারি না।" এই বলিয়া তিনি অন্যত্র যাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

তখন জীবন ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। দিয়া এক অভিনব ব্যাপারে মনোনিবেশ করিল। আগুল্ফলম্বিত কেশ দাম সুবাসিত তৈলে সিক্ত করিয়া, তদ্দ্বারা এক অপূর্ব্ব কবরী রচনা করিল। সযত্নরক্ষিত একখানি সাড়ী বাহির করিয়া তাহা কুচাইয়া পরিল, পরে নতজানু হইয়া মুকুরের নিকট মুখ দেখিতে বসিল। মরি! মরি! সে কি অঙ্গ ভঙ্গিরে! সু-উচ্চ বক্ষঃ নিশ্বাসে প্রশ্বাসে উঠিতেছে, পড়িতেছে, সুগঠিত দেহলতা হেলিয়া দুলিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছে! চঞ্চল আঁখি কখনও উর্দ্ধ কখনও অপাঙ্গে, কখনও অধোদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে! ভ্রূ-কুঞ্চিত হইতেছে। আর চম্পকাঙ্গুলি সর্ব্বাঙ্গে বিচরণ করিয়া সকল অভাব মোচন করিতেছে! এইরূপে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। পরে সব যথাযথ ন্যস্ত হইলে পর জীবন হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল "এ আগুনেও যদি সবদগ্ধ করিতে না পারিলাম, তবে স্রষ্টার অগ্নিবরণ হওয়াই বৃথা।"

এইরূপে সজ্জীভূত হইয়া জীবন অতি সন্তর্পণে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। বাড়ীর পার্শ্বেই আম্রকানন, নিবিড় বৃক্ষ-শ্রেণী জ্যোৎস্না ছাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে ধীরে ধীরে সেখানে আসিয়া এক নিভৃত বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। বসিয়া চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; যেন কাহারও অনুসন্ধান করিতেছে। বহুক্ষণ তদবস্থায় অতিবাহিত হইল। তৎপর সে বিরক্ত হইয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, একবার বক্ষোপরি নিরীক্ষণ করিল, আরবার হেলিয়া নিতম্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, পরিহিত বসনখানা খুলিয়া পুনরায় পরিল; পরে নীরবে দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিতে লাগিল। এমন সময় অলক্ষিতে কে আসিয়া

তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করিল। জীবন ফিরিয়া চাহিয়া ভ্রু-ভঙ্গি করিয়া বলিল "তবু ভাগ্যি, তুমি এলে! বাড়ীর এত আদর-সোহাগের মধ্যে কি আমাদের কথা মনে থাকে!" আগন্তুক আবেগ ভরে জীবনের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল "কেন এমন কথা বল্‌ছ জীবন, তুমি কি বুঝিতে পার না যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজ না থাকিলে আমি এক মুহূর্ত্তও দেরী করি নাই ?"

জীবন—"তোমাদের আবার কাজ ? তোমরা পুরুষ মানুষ, চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে আসিয়াও রাধা-কুঞ্জে কাঁদিতে কাঁদিতে মানভঞ্জনের অভিনয় করিয়া থাক! বৌদি অভিমান করে নাইত ?"

আগন্তুক দুঃখিত হইয়া বলিল,—"কেন ও কথা বল্‌ছ, জীবন, কাহারও মান অভিমানে আমার বড় আসে যায় না। কিন্তু তোমার কাছে কোন্ কথাই বা গোপন করিয়াছি! বাবার মৃত্যুর পর দাদাই রাজ্য শাসন করিতেছেন; আমি কনিষ্ঠ, শাস্ত্রের বিধান রাজভোগ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিয়াছে। ভোগে যাহারা স্পৃহাশূন্য, দেহটার প্রয়োজনীয়তা যাহারা স্বীকার করে না, তাহারাইত শাস্ত্র প্রণেতা! কি করিয়া জানিবে তাহারা অতৃপ্ত ভোগ-বাসনা লোককে কিরূপ উন্মত্ত করিয়া দেয়! জানত বহরই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি; আমি তাহাই প্রার্থনা করিয়াছিলাম। দাদাকে কত অনুনয় করিলাম, তিনি শুনিলেন না। অবশেষে আজ মাকে বলিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন দাদাই নাকি বহর শাসন করিবার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র! তাই বাদানুবাদে একটু দেরী হইয়া গিয়াছে।"

শুনিয়া জীবন অনেকক্ষণ মৌনভাবে চিন্তা করিল, পরে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল "কি ?"

জীবন—"একটা কাজ করিতে পারিবে ? তোমার মঙ্গল হইবে।"

আগন্তুক—"তোমার আদেশে না করিতে পারি কি? মঙ্গলামঙ্গলের আমি বড় একটা ধার ধারি না!"

জীবন—"তবে শুন, তোমার দাদা যে কাজ করিয়াছেন তাহা বস্তুতঃই বড় বিগর্হিত, তাহাকে ইহার প্রতিফল দিতেই হইবে। কিন্তু তুমি একা এতটা করিয়া উঠিতে পারিবে না। আমবাগের মহম্মদখাঁর নাম শুনিয়াছ ত? তিনি বহুদিন হইতে বহর দখল করিবার চেষ্টায় আছেন। তুমি যাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনি সহায় হইলে তুমি অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। তখন তোমার ইচ্ছামত সকল বন্দোবস্ত করিয়া লইও। নতুবা বহর না পাইলে আমার শান্তি হইবে না। কি বল?"

আগন্তুক—"তাহাতে আমার কোন অমঙ্গল হইবেনাত?"

জীবন—"কিছুই নয়, বরং ইহাতে তোমার সকল বিষয়েই সুবিধা হইবে। যাও, কার্য্য সমাপনান্তে পুনরায় আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।" এই বলিয়া জীবন প্রস্থানোদ্যত হইল।

আগন্তুক বাধা দিয়া বলিল—"একটু অপেক্ষা কর, আর একটা নিষ্ঠুরতার অভিযোগ শুনিতে হইবে।"

জীবন—"ছিঃ! একেবারে অধীর হইওনা। আগে তোমার সব স্থির হউক, তারপর আমিত তোমারই!" এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:○:—

হিন্দু-গ্রাম।

অতি পূর্ব্বকালে যখন রামায়ণ রচিত হইয়াছিল অথচ রাম জন্মগ্রহণ করে নাই, যখন আঁধার ও আলোকের বিষম দ্বন্দ্বে জগতে প্রথম ঊষার জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিতেছিল, তখন পৃথিবীর সভ্যতার কেন্দ্র স্বরূপ এক অতি সমৃদ্ধিশালী জনপদ বর্ত্তমান ছিল, লোকে তাঁহাকে হিন্দুগ্রাম বলিয়া অভিহিত করিত। এই দেশ বর্ণনা করিতে যাইয়া আমরা নিজ অক্ষমতার পরিচয় দিতে বসিয়াছি! যে দেশে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশে লোকে উলঙ্গ হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহাকে নদনদী-বহুলা সাগরবেষ্টিতা, শস্য শ্যামলা বলিয়া বর্ণনা করিয়া আর কি হইবে! ঐশ্বর্য্যময়ী প্রকৃতিকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াও যাঁহার ভোগের মাত্রা সীমবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, এমন দিন ছিল যখন সেই দেশবাসী সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে যাইয়া চক্ষু মুদিয়া প্রাণ খুলিয়া বসিয়া থাকিত! যে দেশ স্বেচ্ছায় কর্ম্মভূমি আখ্যা গ্রহণ করিয়াছে, জ্ঞানকে কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই দেশবাসী কর্ম্মকে কামনা-বর্জ্জিত করিয়া অনুষ্ঠান করিত। সমাজ সমস্যার বিচিত্র সমাধানে যে দেশে সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ অতি সংযতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীতা তথায় ছিল না; একের মুখের গ্রাস অন্যে কাড়িয়া লইতেও অক্ষম ছিল, সে দেশ তখন শান্তিময়, প্রাণময় ও সুখময় ছিল! ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতকে বৃত্তাকারে গ্রথিত করিয়া যে দেশ ধর্ম্মকে মৃত্যু রহিত ও মৃত্যুকে ভয়শূন্য করিয়াছে, দেবত্ব যথায়

মানব সাধনালব্ধ, একমাত্র সে দেশবাসীই নিজকে জগতে "সোহং" বলিয়া পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছিল! সেই দেশেরই শ্মশানের উপর রাজত্ব করিয়া রাম রাম রায় যে ইতিহাসের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন, আজ আমরা তাহারই বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি!

সংসারে রায় মহাশয়ের এক স্ত্রী ও দুই ছেলে ছিল। বড় ছেলের নাম অমৃত, ছোট ছেলের নাম অমর। উভয়েই বিবাহ করিয়াছিল, বড় বউএর নাম আদৃতা, এবং ছোট বউএর নাম ছিল লাঞ্ছিতা। রাজকীয়গুণে অমৃত পিতার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অমর কিছুই আয়ত্ত করিতে পারে নাই! তাহার সহস্র দোষের মধ্যে অবিবেচনাই ছিল সর্ব্বপ্রধান দোষ।

পিতার মৃত্যুর পরে অমৃত শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তখন বহর ছিল হিন্দুগ্রামের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। মহম্মদ খাঁর আক্রমণ হইতে বহর রক্ষা করিবার জন্য অমৃত ইহাকে আরও সুরক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অমর কিন্তু বহরের লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। নিজ বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য সে যে উপায় অবলম্বন করিতে চলিয়াছিল, তাহার পরিচয় পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

জীবনের নিকট হইতে বিদায় হইয়া অমর ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া আসিল; আসিয়া দেখে লাঞ্ছিতা তখনও তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। ভালবাসা পরকে আপন করিতে সক্ষম, কিন্তু আপনকে কত খানি আপনার করিতে পারে তাহা যিনি কখনও প্রকৃত ভালবাসা পাইয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন। অমর তাহা সম্পূর্ণই বুঝিয়াছিল, তাই সে কখনও লাঞ্ছিতার নিকট ধরা না দিয়া থাকিতে পারিত না। আজ কিন্তু এতরাত্রি পর্য্যন্ত লাঞ্ছিতাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অমর কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল, "তুমি এখনও ঘুমাও নাই! কেন?"

চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু লইয়া লাঞ্ছিতা বলিল, "তা'ত বলিয়াছি, ঐটী আমার দোষ, আমার এ দোষের ক্ষমা করিতেই হইবে।"

অমর আর কিছু বলিল না, নিঃশব্দে বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িল। আর লাঞ্ছিতা স্বামীকে ক্লান্ত ও অবসন্ন ভাবিয়া নিকটে বসিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল। স্নেহের একটা অদ্ভূত প্রভাব আছে, বর্ষার জলপ্লাবনের ন্যায় ধীরে ধীরে কার্য্য করিয়া তাহা নিতান্ত উষর ক্ষেত্রকেও সরস করিয়া দেয়! জীবনের জ্বলন্ত রূপরাশি অমরের বাসনাজড়িত হৃদয়কে দিক্‌ভ্রান্ত পতঙ্গের ন্যায় আকর্ষণ করিলেও, লাঞ্ছিতার প্রেমপূর্ণ সেবার কমনীয় প্রভাব সে অনুভব না করিয়া থাকিতে পারিল না। অমনি সে উঠিয়া বলিল, "না, না, মুক্তি দেও আমাকে, লাঞ্ছিতা! তোমার এই স্নেহ-নিগড়ই আমার যাবতীয় বৃত্তিকে জড়ীভূত ও অসার করিয়া রাখিয়াছে! আমি একবার জীবন উপভোগ করিয়া দেখি।"

লাঞ্ছিতা—"কি উপভোগ করিবে?"

অমর—"বল দেখি, পৃথিবীতে কি কি উপভোগের বস্তু আছে?"

লাঞ্ছিতা—"যশঃ, মান, পবিত্রতা, আত্মপ্রাসাদ, নিজের বিবেক প্রভৃতি।"

অমর—"তা নয়, সৌন্দর্য্য ও প্রভুত্ব। আমি তাহাই উপভোগ করিব।"

লাঞ্ছিতা—"তাহাতে লাভ?"

অমর—"লাভ শান্তি।"

লাঞ্ছিতা—"শান্তি! শান্তি? কেমন শান্তি! যাহাই হউক, তুমি যাহা উপভোগ করিতে পার, আমিও তোমার সঙ্গে তাহা উপভোগ করিব। আমাকে বারণ করিবে না ত?"

অমর—"তাহা হইবে না, লাঞ্ছিতা, ইহা তোমার বড় বাড়াবাড়ি। আমি কাল অন্যত্র যাইব।"

লাঞ্ছিতা—"কোথায় যাইবে ?"

অমর—"তাহা বলিব না।"

লাঞ্ছিতা—"তবে আমি ?"

অমর—"তোমার কর্ত্তব্য তুমি স্থির করিয়া লইও, আর আমার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিও না।"

পর দিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া অমর আমবাগের উদ্দেশে চলিয়া গেল। অমরের এই পলায়ন ভারতের ইতিহাসের এক যুগান্তরকারী ঘটনা। আজ তাহার পরিণাম আমরা লিখিতে বসিয়াছি, কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের রক্তে সেই ইতিহাস কালের পৃষ্ঠায় যে ভাবে লিখিত রহিয়াছে, মানব-লেখনী তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। আর কত কাল পরে আমরা সেই দৃশ্য ভুলিয়া যাইতে পারিব ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

ভ্রাতৃদ্রোহ।

তিন দিন পরেই সংবাদ আসিল মহম্মদখাঁ বহর দখল করিয়াছেন। অমৃত তখন রুগ্ন-শয্যায় শায়িত ছিলেন। কাজেই তিনি আত্মরক্ষার জন্য আবশ্যকীয় আয়োজনাদি করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ অমর তাহার অধীনস্থ লোকজন লইয়া বিপরীত দিক হইতে বহর আক্রমণ করিয়াছিল। এই উভয় দলের মধ্যে পড়িয়া অমৃতের সৈন্যগণের মধ্যে অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল, কতক শত্রুদলভুক্ত হইয়া গেল, আর যাহারা বিশ্বস্ত, তাহারা পলাইয়া আসিয়া হিন্দুগ্রামে সংবাদ জ্ঞাপন করিল।

কিন্তু অমর হাতে হাতে তাহার অবিমৃষ্যকারিতার ফলভোগ করিল। মহম্মদখাঁ যখন দেখিলেন বিপক্ষের লোকজন সব হটিয়া গিয়াছে, অমনি তিনি অমরের লোকদিগকে অকস্মাৎ ভীষণবেগে আক্রমণ করিলেন। তাহারা সকলেই তখন লুণ্ঠন কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, অতএব সমবেত হইয়া বাধা প্রদানের তাহাদের ক্ষমতা রহিল না। অবিলম্বেই তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যে যেদিকে পারিল পলাইয়া গেল। বহর সম্পূর্ণরূপে মহম্মদখাঁর করতল-গত হইল। অমর কোনমতে আত্মগোপন করিয়া হিন্দুগ্রামে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

আদৃতা—"ছোট-বউ, ঠাকুর-পো বাড়ী আসিয়াছেন ?"

শান্তিতা—"হাঁ।"

আদৃতা—"যাত, তাহাকে একবার পাঠিয়ে দে এখন। তিনি ডাক্‌ছেন।"

লাঞ্ছিতা জড়সড় হইয়া বলিল—"হাঁ দিদি, তোমরা তাঁহাকে ক্ষমা করিবে!"

আদৃতা—"মর, সে কি করিয়াছে? রাজত্ব করিতে গেলে এমন লুঠপাঠ সহ্য করিতেই হয়। যা, এখন তাহাকে পাঠিয়ে দে গে।" এই বলিয়া সে আদরে লাঞ্ছিতার চক্ষু মুছাইয়া দিল।

লাঞ্ছিতা আসিয়া অমরকে বলিল—"তোমাকে দিদি ডাক্‌ছে।"

অমর—"আমি যাইতে পারিব না। তাহাদিগকে মুখ দেখাইতে আমার লজ্জা করে।"

ছোটবউ দুঃখিত হইয়া বলিল—"ভাইয়ের নিকটেই যদি মুখ দেখাইতে পারিবে না, তবে অন্যে কি বলিবে? কেন এমন কাজ করিতে গিয়াছিলে?" এই বলিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

অমরও তখন ভাবিতেছিল "কেন এই কাজ করিলাম?" অমনি এক খানা সুন্দর মুখ তাহার মনে উদয় হইয়া সব গোলমাল করিয়া দিল। যাহা হউক, অমর আসিয়া অপরাধীর ন্যায় ভাইয়ের শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিল। তিনি বলিলেন—"অমর, তুমি নাকি মহম্মদখাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছ?"

অমর কোন উত্তর করিতে পারিল না; অধোবদনে বসিয়া রহিল। অমৃত বলিলেন—"যাক, যাহা হইয়াছে তাহা ফিরিবার নয়। এখন এস, আমরা উভয়ে একত্র হইয়া বহর দখল করিয়া লই। আমার এখন কিছু করিবার শক্তি নাই, তোমার উপরেই এই কাজের ভার অর্পণ করিলাম, তুমি সকল বন্দোবস্ত করিয়া লও।"

তারপর অন্যান্য দু'চার কথার পর অমর বিদায় হইল। কিন্তু পথে

আসিতে আসিতে সে ভাবিল "যা'র পরামর্শে এতটা করিয়াছি, তাহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া আমি কিছুই করিতে পারিব না।"

সন্ধ্যার পর আবার নিভৃতে জীবনের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। জীবন অত্যধিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এখন কি করিবে স্থির করিয়াছ?"

অমর—"দাদা বলিতেছেন আমরা উভয়ে মিলিয়া পুনরায় বহর দখল করিয়া লই।"

জীবন—"তাহা কখনই করিও না! তুমি বুঝিতেছ না, ইহাতে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে। তোমার দাদা এখন পীড়িত, সে এখন কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না; তাই তোমাদ্বারা কার্য্য উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করে। পুনরায় বহর দখল হইলে, তুমি কি মনে কর, তিনি তোমাকে বহর ছাড়িয়া দিবেন?"

অমর—"তবে এখন কি করিব?"

তখন দুইজনে মিলিয়া অনেক পরামর্শ হইল! অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সব ঠিক হইলে অমর বলিল "তুমি আগে?"

জীবন—"না তুমি।"

অমর—"না, আমি আগে যাইতে পারিব না।"

জীবন ভাবিল "আমাকেত যাইতেই হইবে, নতুবা আমি এই কণ্টক শয্যায় আর থাকিতে পারিব না। তারপর অমর যায় ভালই, আর না যায়—মধু থাকিলে ভ্রমরের অভাব হইবে না।"

অতএব জীবন স্বীকৃত হইল। দুষ্টা জীবন সেদিন অবিশ্রান্ত মদিরা ঢালিয়া অমরকে উন্মত্ত করিয়া গেল।

তৎপর দিন এক বৃদ্ধা আসিয়া বড়বউএর নিকট কি চুপি চুপি বলিয়া গেল। সে শান্তিতাকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিল "দেখি ছোটবৌ, তোর

আঁচলটা।" এই বলিয়া সে অঞ্চল গ্রহণ করিয়া তাহাতে একটা গ্রন্থি দিয়া দিল। লাঞ্ছিতা বলিল "একি ?"

আদৃতা—"তোর্ গ্রন্থিটা কিছু শিথিল হইয়া গেছে, একটু সামলাইয়া চলিতে হয়, বোন্।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কুলত্যাগ।

জীবন বাড়ীতে আসিয়া এক অপূর্ব্ব সাজসজ্জা করিতে বসিল। একখানা রঙ্গিন পেশোয়ারী পরিয়া বক্ষে কাচলী আঁটিয়া দিল। সর্ব্বোপরি রেশমের জামা পরিধান করিল। তারপর পায়ের দশ অঙ্গুলি হইতে কপালের টিপ্ পর্য্যন্ত যেখানে যে গহনা ধরে তাহা একটী একটী করিয়া পরিল। আজানুলম্বিত যুগ্মবেণী সর্পবৎ পৃষ্ঠে দোলাইয়া দিয়া, কারুকার্য্যখচিত সুন্দর জুতা পায়ে দিল। অবশেষে একখানা পাতলা রেশমের আবরণে সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া, মুখাবরণে বদন ঢাকিয়া, ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। জীবন পূর্ব্ব হইতে এই সকল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল

বাহির হইবার সময় অসতর্কতা বশতঃ পা ঠোকয়া সে পড়িতেপড়িতেও রহিয়া গেল। পাশের ঘরেই মাতা শুইয়া ছিলেন, কিন্তু জীবন একবারও তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না। তখন তাহার প্রাণের ভিতর দিয়া অদমনীয় আবেগ-স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল; এত ভাবিবার তাহার অবসর কোথায়?

মাঠে আসিয়া জীবন দেখিল, উপরে চন্দ্র হাসিতেছে, সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। আবার চাহিয়া দেখিল, আকাশ অসীম, অনন্ত, প্রান্তর কুলকিনারা রহিত। ভাবিল "ইহাদেরও যদি এত কাল কুল-কিনারা না থাকিতে পারে, তবে আজ হইতে আমারও থাকিল না—আমরা সকলেইত

ভগবানের সৃষ্ট।" ইহা ভাবিয়া সে মনে একটু শান্তি পাইল। তখন আপন মনে গান গাহিতে গাহিতে পথ অতিক্রম করিয়া চলিল।

যাইতে যাইতে এক পথিকের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। জীবন ভয় পাইবার মেয়ে ছিল না, জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কোথা যাবে ?

পথিক—"বহর। তুমি ?"

জীবন—"আমি স্ত্রীলোক, আমিও বহর যাইব।"

পথিক—"কোথা হইতে আসিতেছ ?"

জীবন—"হিন্দুগ্রাম হইতে।"

পথিক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"হিন্দুগ্রাম হইতে বহর! কেন ?"

জীবন—"আমি মহম্মদখাঁর নিকট যাইতেছি !"

পথিক—"মহম্মদখাঁর নিকট !"

জীবন—"হাঁ, আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব।"

পথিক—"তোমার উদ্দেশ্য কি ?"

জীবন—"তাহা তোমাকে বলিয়া কি হইবে। তুমি তোমার নিজের কাজে যাও।" পথিক দেখিল বড় শক্ত মেয়ে। একটু চিন্তা করিয়া বলিল "আমি মহম্মদখাঁর প্রধান সর্দ্দার—নাম কেরামত উল্লা। সংবাদ সংগ্রহ করিতে গোপনে হিন্দুগ্রামে গিয়াছিলাম। তোমার বক্তব্য শুনিলে, হয়তঃ আমার দ্বারা তোমার কোন উপকার হইলেও হইতে পারে।"

জীবন দেখিল ইহাদ্বারা কার্য্যোদ্ধার হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব সে সবিস্তারে তাহার নিকট নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। শুনিয়া পথিক বলিল—"চল, আমি তোমাকে মহম্মদখাঁর সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দিব।"

তারপর নির্জ্জনে মহম্মদখাঁর সঙ্গে দেখা হইলে, জীবন মুখাবরণ খুলিয়া দাঁড়াইল। খাঁসাহেব দেখিলেন, অপরূপ রূপ! তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন—"এই রূপরাশি কোন্ উদ্যানে প্রস্ফুটিত হয় ?"

জীবন—"আজ হইতে ইহা আপনার উদ্যানেই প্রস্ফুটিত হইবে। দাসী আপনার শরণাগত।"

খাঁসাহেব—"তোমার উদ্দেশ্য কি ?"

জীবন—"আমি মুসলমান হইব।"

খাঁসাহেব—"এতদিন হিন্দু ছিলে, এখন মুসলমান হইতে চাহিতেছ কেন ?"

জীবন—"হিন্দুরা কাফের—তাহারা ধর্ম্মের কি বুঝিবে ? তাহারা মাটির মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে, পাথর কাটিয়া দেবতা গঠন করে। হিন্দুরা অত্যাচারী, তাহারা স্ত্রীলোকদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতেছে। বিশেষতঃ তাহারা বিধবাদের বিবাহ দেয় না।"

খাঁসাহেব—"তুমি বিধবা ?"

জীবন—"হাঁ। বহুদিন হইল আমার স্বামী মরিয়া গিয়াছে।"

খাঁসাহেব বুঝিলেন ; বুঝিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। পূর্ব্বোক্ত পথিকের নিকটেও তিনি জীবনের তেজস্বিতা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিলেন, এখন বুঝিলেন, জীবন উপযুক্ত পাত্রী বটে। বলিলেন "তুমি কি সত্যই ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে মনন করিয়াছ ?"

জীবন—"নিজ আয়ত্তাধীন স্ত্রীলোককেও ভয় করিবার কারণ থাকিতে পারে, পুরুষের পক্ষে ইহা এই প্রথম দেখিলাম! খাঁসাহেব, আপনি কি স্ত্রীলোকশূন্য হিন্দুগ্রাম শাসন করিতে আসিয়াছিলেন ? কিন্তু আপনাকে প্রতারণা করিয়া আমার লাভ ? আমি নিশ্চয়ই মুসলমান হইব।"

খাঁসাহেব স্তম্ভিত হইলেন। একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তবে শুন, আজ হইতে তুমি আমার কন্যারূপে গৃহীত হইলে। তোমার ন্যায় বীর্য্যবতী মহিলা পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি। খোদার কাজে তুমিই উপযুক্ত পাত্রী। কল্যই তোমাকে দীক্ষিত করিব।

তৎপর দিন মহাসমারোহে জীবন ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিল, তখন তাহার নাম হইল "জান্‌বিবি।"

অমর কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। দেখিয়া জান্‌বিবি অতি কাতরভাবে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া অমরের নিকট দূত প্রেরণ করিল। অমর ভাবিল ইহাতে কোনই দোষ নাই, অতএব সে এই নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। বহরের রাজ-প্রসাদের এক নিভৃত কক্ষে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। স্নিগ্ধ, শুভ্র, কারুকার্য্য-খচিত প্রস্তর-দ্বারা-গঠিত এই কক্ষটী জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর স্বহস্ত-রচিত গৃহ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিল। উজ্জ্বল বেশভূষায় শরীরের যতখানি আবৃত করিয়া যতখানি মুক্ত রাখিলে আকাঙ্খার তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, জীবন সেইরূপ ভাবে সজ্জিত হইয়া অমরের অতি নিকটে দাঁড়াইয়া বলিল,—"কেন আসিবে না, এই রাজত্ব তোমার হইবে, এই রাজ-ভোগের অধিকারীও তুমি, তোমার অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছি।" অমর আর হিন্দুগ্রামে ফিরিতে পারিল না, ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভোগসুখে নিমগ্ন হইল। তখন তাহার নাম হইল "আমির-মিঞা।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

লাঞ্ছিতা।

পরদিন লাঞ্ছিতা ঘরে বসিয়া দুধ গরম করিতেছিল, এমন সময়ে একজন প্রতিবেশিনী আসিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগা ছোট বউ, তোমাদের ছোটবাবু নাকি জীবনকে লইয়া মুসলমান হইয়া গেছে?"

লাঞ্ছিতা—"তা'তে তোর্ কি? তোর্ এত হিংসা হইয়া থাকেত তুই যা না! কে বারণ করিতেছে!"

প্রতিবেশিনী—"মর, তুই যাকে যা ইচ্ছা তাই বল্‌বি! নিজের ভাতার ঘরে পুরিয়া রাখিতে পার না, আবার পরের সঙ্গে লাগিতে এস কেন? বাহিরে লোকে যে ছিঃ! ছিঃ! করিতেছে, তাহাদের মুখ বন্ধ করিবে কি করিয়া? আঃ! ছিঃ! লজ্জার কথা!"

লাঞ্ছিতা আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"বাহিরে যা হয় হউক, এখানে আসিয়া সেসকল বলিবার তুই কে?" এই বলিয়া সে এক ঘটী জল প্রতিবেশিনীর অঙ্গে ঢালিয়া দিল। সে লাঞ্ছিতাকে অকথ্য গালি দিতে দিতে নিজের বাড়ী চলিয়া গেল।

লাঞ্ছিতার আর দুধ জাল দেওয়া হইল না। তাড়াতাড়ি নামাইতে গিয়া সে দুধ সমেত বাটীটী উননের মধ্যে ফেলিয়া দিল। অঙ্গারগুলি সোঁ সোঁ শব্দে নিভিয়া গেল। তখন সে ঘরে আসিয়া কাঁদিতে বসিল, "পোড়া লোকগুলি মরে না কেন? তাহাদিগের মুখে আগুন লাগে না কেন? পরের দোষ দেখিতে ভগবান তাহাদের চক্ষু দিয়াছেন কেন? এসব ভগবানের ভারি অবিচার! তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন ত আমাদের

দুইজনকেই শুধু সৃষ্টি করেন নাই কেন? তাহা হইলে এত কথা কে বলিত!"

ভাবিতে ভাবিতে জীবনের কথা তাহার মনে উদয় হইল। অমনি সে পুনরায় ভাবিতে লাগিল, "আবার দেখ, ভগবানের অবিচার, সে জীবনকে সৃষ্টি করিয়াছে! সৃষ্টি করিয়াছিল ত তাহাকে এতরূপ দিয়াছিল কেন? রূপ দিয়াছিল ত সে বিধবা হইল কেন? নিশ্চয়ই আমার সর্ব্বনাশ করাই ভগবানের ইচ্ছা! আর দেখ, জীবনের বাড়াবাড়ি! সে কেন তাহার দিকে দৃষ্টি করিল! পরপুরুষের দিকে কি এইরূপে চাহিতে আছে! ছি!" আবার ভাবিতে লাগিল, "তাঁহার কি কিছুই দোষ নাই?" "কিছুই না। ঐ পোড়ারমুখিই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে! যত দোষ তাহার রূপের! রূপের ডালা খুলিয়া জীবন কেন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল? তিনি ফিরিয়া চাহিলেন—এমন কে না চায়? কিন্তু আর ফিরিতে পারিলেন না—ডাকিনীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন! জীবন ডাকিনী, ঐ ডাকিনীই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে!"

অতএব সেদিন আর লাঞ্ছিতার খাওয়া হইল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে রাত্রি অতিবাহিত করিল।

প্রভাতে উঠিয়া সকলে দেখিল, লাঞ্ছিতা উচ্ছৃঙ্খল-বেশা, চুলগুলি আলু থালু হইয়া গিয়াছে, বসন অবিন্যস্ত, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, মুখখানা কালিমা মাখা। দেখিয়া বড়বউ বলিল "ছোটবউ, তুই এমন হইয়া গিয়াছিস্? কেন, আমরা থাকিতে তোর চিন্তা কি?" লাঞ্ছিতা বলিল, "না দিদি, আমাকে তোমরা তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেও। তাহারও সেই গতি আমারও তাহাই!" শুনিয়া আদৃতা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। তৎপর সে স্বামী ও শাশুরীকে যাইয়া এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। তাহারা লাঞ্ছিতাকে জানিতেন, তাহার দুঃখ কত গভীর তাহাও বুঝিলেন।

কিন্তু কোন সান্ত্বনাই লাঞ্ছিতাকে নিরস্ত করিতে পারিল না, সে বহরে আসিয়া অমরের সেবায় নিযুক্ত হইল। বিদায়ের সময়ে প্রণত বধূর মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া শাশুরী বলিয়া দিলেন,—"যাও মা, আমার গৃহলক্ষ্মি, অমর এখন পথ ভুলিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু আমার বিশ্বাস তুমি নিকটে থাকিলে আবার সে পথ চিনিবে। তাহাকে বলিও, অমৃতও আমার যত আদরের অমরও ততই, এখনও আমি তাহাকে কম স্নেহ করি না, করিবও না। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার মঙ্গল হইবে।"

যথাসময়ে লাঞ্ছিতা আসিয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিল। ইহার একযুগ পরে যখন আমাদের এই ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে তখন মহম্মদখাঁ আমিরকে বহরের প্রতিনিধি রাখিয়া স্বর্গগত হইয়াছেন। সংসারে তাঁহার এলেম নামে একমাত্র মেয়ে ছিল, তাহাকে তিনি সর্ব্বতোভাবে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। এলেম আমিরের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। তখন লাঞ্ছিতাও ফকির নামে এক পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন, আদৃতার এক পুত্র হইয়াছিল, নাম সন্ন্যাসী। ইহাদের ইতিহাসই আমাদের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রতিদ্বন্দ্বীতা।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। প্রেম-বিহ্বলা গঙ্গা ভাবলহরীতে নাচিয়া নাচিয়া সাগর-সঙ্গমে ছুটিতেছিল। দুই দিকে বিস্তীর্ণ বালুকা-ধবল সৈকত, অদূরে বৃক্ষলতাসমাকীর্ণ জনপদশ্রেণী আকাশ-প্রান্তস্থিত নিরবচ্ছিন্ন মেঘমালার ন্যায় শোভা পাইতেছিল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কেবল মধ্যে মধ্যে আবেগ-স্ফীত-বক্ষ উচ্ছৃঙ্খল তরঙ্গগুলি মৃদু গর্জ্জনে আছাড়িয়া পড়িয়া সৈকত-পদে বিলীন হইয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে এইরূপ এক ক্ষিপ্ত তরঙ্গ একটী মৃতপ্রায় মনুষ্যমূর্ত্তি কুলে রাখিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

মূর্ত্তিটী নিশ্চল, নিস্পন্দ, যেন দেহে প্রাণের চিহ্ন মাত্রও নাই; শরীরের স্থানে স্থানে আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান, সিক্ত বসনাবৃত দেহখানা দেখিলে বোধ হয় লোকটী এখনও যৌবনসীমা অতিক্রম করিয়া যায় নাই। মাথার উপর দিয়া একটা কর্কশ পেচক ডাকিয়া গেল, অদূরে মাংস-লোলুপ পশুগণের বিকট চীৎকার শ্রুত হইতে লাগিল, অবশেষে একটা ধৃষ্ট-শৃগাল পদাঘাতে সেই আত্মবিস্মৃত যুবকের দেহে নিজের অস্তিত্বের সংজ্ঞা আনিয়া দিল। যুবক তখন বিভোর, পূর্ব্ব-স্মৃতি-বিরহিত এবং স্বীয় অবস্থাজ্ঞ। সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া অবশ-ক্লান্ত দেহটাকে

ইতস্ততঃ—বিক্ষিপ্ত চরণের উপর বহন করিয়া সে একদিকে চলিতে লাগিল। চক্ষু আবৃত; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সে ভূভাগের দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। কিছু পথ অতিক্রম করিলেই পশ্চৎদিক হইতে শব্দ হইল "পথিক, এই মল্লভূমি উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইও না।" কিন্তু সেই স্বর যুবকের কর্ণে প্রবেশ করিল কিনা সন্দেহ; সে পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। আবার গম্ভীরস্বরে ধ্বনিত হইল, "পথিক বেগ সম্বরণ কর, নতুবা প্রতিফল অনিবার্য্য।"

যুবক স্থির হইয়া দাঁড়াইল; অমনি এক বলিষ্ঠ পুরুষ আসিয়া দৃঢ়রূপে তাহার হস্ত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"পথিক, এই মল্লভূমিতে আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি।"

যুবক বিস্মিত হইয়া বলিল "আমি অন্ধ।"

পুরুষ—"অন্ধেরও মল্লযুদ্ধে অধিকার আছে।"

যুবক—"আমি নিতান্ত অবসাদগ্রস্ত।"

পুরুষ—"বীরগণ অবসাদকে নিকৃষ্ট তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে।"

যুবক—"আমি নির্য্যাতিত এবং ক্ষুৎ-পিপাসাকুল, আমাকে দয়া করুন।"

পুরুষ—"প্রতারকেরাও এরূপ ভাণ করিয়া থাকে বটে; তোমাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে।"

যুবক—"কি! এত নির্দ্দয়তা! বিপদ্‌গ্রস্ত শত্রুকেও আক্রমণ করিতে লোকে দ্বিধা বোধ করিয়া থাকে, আর আমি অবসন্ন, ক্ষুধাতৃষ্ণা-প্রপীড়িত, এবং সকাতরে আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি, তথাপি আমাকে তুমি মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিতেছ! তুমি কে?"

"আমি? আমার নাম তেজোবন্ত সিংহ, আমিই মল্লযুদ্ধে এই নামে জগতে বিখ্যাত হইয়াছি। বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে, পৃথিবীর সুদূর

প্রান্ত হইতে আগত শত শত যোদ্ধাকে আমি অনায়াসে পরাজিত করিয়াছি। আর জান, আমার বাহু-বলেই হিন্দুদেশ রক্ষিত হইতেছে; এ বাহুতে শক্তি না থাকিলে এত দিনে এই দেশ উচ্ছন্ন হইয়া যাইত। আমি একবারে দশ জনকে পরাজিত করিতে পারি, কিন্তু এককালে শত জন মুসলমানের মাথা না ভাঙ্গিয়া দিতে পারিলে যে আমার সাধনাই ব্যর্থ হইবে। তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?"

"আমিও এ দেশেরই অধিবাসী।"

নেজোবন্ত—"কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ চাই। আমার নিয়ম এই যে, যেকেহ এই মল্লভূমিতে আগমন করিবে তাহাকেই বল-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হইবে; তথাপি আমি কোন হিন্দুর সঙ্গে সহসা বল-পরীক্ষায় অগ্রসর হই না। তোমার এই অবস্থা হইল কেন?"

যুবক—"সে অনেক কথা। বড় কুক্ষণেই যাত্রা করিয়াছিলাম, সম্পদ-মদমত্ত আমি, সঙ্গে লোক-জনও যথেষ্ট ছিল। প্রকাণ্ড নৌকা দুইখান পাল তুলিয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিল; সতত তর তর সড় সড় শব্দ, কত তরঙ্গ নৌকার তলে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল, আমরা কত জনপদ অতিক্রম করিয়া আসিলাম। হঠাৎ দেখি, একখানা দ্বিতীয় নৌকা আমাদেরই সমবেগে অগ্রসর হইতেছে! দেখিয়া বুঝিলাম, তাহাদেরও ঐশ্বর্য্য গরিমা সামান্য নহে। বোধ হয় আমাদের উভয়েরই মনে হিংসার উদ্রেক হইয়া থাকিবে! কারণ, সম্পদ-মদ, কৃত্রিম মদ অপেক্ষা কম অনিষ্টকর নহে! আমরা প্রতিদ্বন্দ্বীতার ব্রতী হইলাম। হঠাৎ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া উঠিল "এই দেখ, এই বাতাসটা আমাদের পালে লাগিয়েছে।" আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম "মিছে কথা,—এই বাতাস আমার পালে লাগিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।" তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না ত?"

তেজোবন্ত—"বলিয়া যাও।"

যুবক পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, "তারপর ইহা লইয়া আমাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল, কিন্তু বিপক্ষ কর্ত্তৃক আমি বড় নির্দ্দয় ভাবে আক্রান্ত হইলাম—নিষ্ঠুর আঘাতে আমাদের তরীখানা জলমগ্ন হইল, সেই সঙ্গে আমিও ভাসিয়া চলিলাম। বোধ হয় ঢেউগুলি আমাকে বহন করিয়া কুলে রাখিয়া গিয়াছে।"

শুনিয়া তেজোবন্ত গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল, "ও, বুঝিয়াছি, তুমি কখনও হিন্দু নও।"

যুবক—"কেন ?"

তেজোবন্ত—"হিন্দুর ছেলে কখনও ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া বীরত্ব প্রকাশে পরাঙ্মুখ হয় না—তাহাদের পিতামহিগণ উপবাসের উপর সংযম শিক্ষা করিয়া ইহার সত্যতা জগতে প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। আর হিন্দুগণ শক্তির উপাসনা করিয়া থাকে, বীরত্বই তাহাদের একমাত্র সাধনার বস্তু। নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া যদি অদমনীয় তেজের সহিত বিপক্ষদলের উপর আসিয়া পড়িতে, তবেই দেখিতে পাইতে যে সকল বাদবিসম্বাদ দ্বিধা বিভক্ত জলরাশির ন্যায় মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।"

যুবক মাথা নাড়িয়া বলিল—"বল প্রকাশে কতটা হয় ?"

তেজোবন্ত—"বল প্রকাশে কতটা হয় ? বল প্রকাশে সব হইতে পারে। বজ্রাঘাতে পর্ব্বত—শৃঙ্গ বিদীর্ণ হইতে দেখিয়াছি, প্রবল ঝড়—বেগে উচ্চশির বৃক্ষও অবনত হইয়া যায়, দৈত্যগণ নিজ ক্ষমতাবলে স্বর্গে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, সিংহ-শিশু নিজবলে মেষযূথ ধ্বংশ করিয়া যায়! আর প্রভুত্বই বল, কি ধন, মান, যশঃ, যাহাই বল, শক্তি না থাকিলে কিছুই লাভের সম্ভাবনা নাই।"

"মিছে কথা।" এই বলিয়া পশ্চাৎদিক হইতে হঠাৎ এক অদ্ভুতবেশী পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার পরিধানে ছিন্ন কন্থা, মস্তকে দীর্ঘ জটাজুট, হস্তে প্রকাণ্ড যষ্ঠি। আসিয়াই সে বলিতে আরম্ভ করিল,—"মিছে কথা, প্রকৃতির নিষ্ঠুর মূর্ত্তি শুধু সংহার-মানসে প্রকটিত হইয়া থাকে, আসুরিক শক্তির নিকট দেবগণ ক্ষণমাত্র পরাজিত হইয়াছিলেন, আর পাশবিক বল বিধ্বস্ত করিতে পারে সত্য কিন্তু তাহা রক্ষণক্ষম নহে। এস যুবক, তুমি এই ধ্বংশ-নীতির উপাসনা করিও না। আমি তোমাকে আশ্রয় দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম" এই বলিয়া সে যুবকের হস্ত ধরিয়া অগ্রসর হইল।

"সাবধান পাপাত্মা! এ পর্য্যন্ত প্রতিপদে তুমি আমার সাধনার বাধা প্রদান করিয়া আসিতেছ; পাগল বলিয়া তোমাকে এতদিন ক্ষমা করিয়াছি, কিন্তু আর নয়। তোমার এইরূপ প্রশ্রয়ে হিন্দু-গ্রামের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইবে।" এই বলিয়া তেজোবন্ত পার্শ্বস্থ অনুচরগণকে আদেশ করিল, "পাপাত্মার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া এই অপরিচিত যুবককে কারাগারে নিক্ষেপ কর—কাল তাহার পরীক্ষা হইবে।"

অনুচরগণ যখন এই আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইল, পাপাত্মা নিজ সামর্থ্যানুযায়ী তাহাদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পরাজিত ও আহত হইয়া আশ্রিতকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—

দীক্ষা।

হিন্দুগ্রামের এক নিভৃত প্রান্তে তেজোবন্তের বাসগৃহ। দুই দিক ঘিরিয়া গঙ্গা নদী প্রবাহিতা, অন্য দুই দিক প্রশস্ত পরিখা বেষ্টিত, মধ্যে এক বিস্তীর্ণ ময়দান, তাহারই এক কোণে গঙ্গাতীরের উপর এক সুদৃঢ় দুর্গ। চারিদিকে উচ্চ, নীচ, সমকোণ, চতুষ্কোণ ও বর্ত্তুলাকার বিবিধ প্রকার গুম্বজশ্রেণী—কোনটী দুর্গের উপর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, কোনটী বা উঠিতে উঠিতে দুর্গগাত্রে মিশিয়া গিয়াছে। গঙ্গার দিকে ভূমি পর্ব্বত-গাত্রবৎ একেবারে নামিয়া গিয়াছে,—কেবল একদিকের অপেক্ষাকৃত ঢালু-স্থানের উপর প্রস্তর নির্ম্মিত সোপান-শ্রেণী যেন হস্তপ্রসারিত করিয়া দৈত্য-পুরীবৎ সেই দুর্গটীকে পূত সলিলা জাহ্নবীর সংস্পর্শে আনিয়া দিয়াছে। তীরের উপর ঝাউ, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষরাজি, স্থানের রমণীয়তা সম্পাদনের জন্য নহে, কিন্তু শত্রু-লক্ষ্য ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে, শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের পল্লব-মধ্যবর্ত্তী বিরল রন্ধ্র-পথে দুর্গের আভা, শরৎকালীন সতত-ভ্রাম্যমান-মেঘান্তরালবর্ত্তী চন্দ্রবৎ, জলপথ-যাত্রীর দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে।

অন্য দুইদিকে পরিখার প্রান্তে প্রান্তে সমব্যবধানে নির্ম্মিত বহু রক্ষীগৃহ, প্রত্যেকটীই ক্ষুদ্র, বাতায়ন-বিরল বা অপ্রশস্ত দরজা বিশিষ্ট, কিন্তু অস্ত্রাদিতে পরিপূর্ণ। ইহা ব্যতীত সমস্ত ময়দানটী একটা রুক্ষ প্রাণহীনতার আভাস প্রদান করিত। কোথাও বৃক্ষের চিহ্নমাত্র বিদ্যমান

নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে স্তূপীকৃত প্রস্তররাশি, আর শত্রুকে বিপদগ্রস্ত করিবার মানসে কৃত গুপ্তগর্ত্ত বা সূক্ষ্মাগ্র বংশদণ্ড-সমাচ্ছন্ন পর্য্যায়ক্রমিক সজ্জীভূত স্তর। অবশিষ্ট ময়দানটী, দৈত্যকর্ষিত ভূখণ্ডবৎ, বৃহৎ বৃহৎ মৃত্তিকাখণ্ডে আচ্ছাদিত;—যেন শত্রু আসিয়া সমভাবে অগ্রসর হইতে না পারে।

দুর্গের সম্মুখভাগে প্রশস্ত সিংহদ্বার; তাহার এক পার্শ্বে শক্তিরূপিনী কালীদেবীর মন্দির,—তেজোবন্ত একমাত্র শক্তিরই উপাসনা করিত। অপর পার্শ্বে বন্দীগৃহ,—সুরক্ষিত করিবার মানসে গৃহের এত সন্নিকটে স্থাপিত হইয়াছে। ইহার পশ্চাৎভাগেই অন্দর,—সেস্থানের দৃশ্যপট অতীব মনোরম এবং চিত্তাকর্ষক; যেন প্রকৃতীদেবী সমস্ত দুর্গটীর সজীবতা আকর্ষণ করিয়া তথাজাত প্রত্যেক বস্তু-গাত্রে নিজ হস্তে মাখিয়া দিয়াছেন। চারিদিকে ফুলের বাগান, ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, রাস্তাঘাট আবর্জ্জনা-বর্জ্জিত, মধ্যে মধ্যে ফলবান বৃক্ষ, চিরস্নিগ্ধ মলয় প্রবাহিত, সকল জিনিষই সুবিন্যস্ত এবং সযত্ন-গঠিত;—দেখিলেই বোধ হয় যেন এই নির্দ্দয় পুরীতেও মূর্ত্তিমতী করুণার অঙ্কে লক্ষ্মীদেবী বিরাজিতা।

শান্তা দেখিয়া শুনিয়া নিজ হস্তে এই সকল কার্য্য করিত—সে তেজোবন্তের একমাত্র মেয়ে—অতি শৈশবেই মাতৃহীনা। তেজোবন্ত এ পর্য্যন্ত তাহাকে পালন করিয়া আসিয়াছে; একটীমাত্র মেয়ে; একমাত্র স্নেহ ও আদরের ধন, সংসারের আশ্রয়, অন্ধের যষ্ঠি কি যাহাই বল, তাই তেজোবন্ত তাহাকে বিবাহ দেয় নাই! কিন্তু শান্তা বড় হইয়াছিল; আর কতদিন চলিবে?

সৌভাগ্যবশতঃ শান্তার এক বন্ধু জুটিয়াছিল, তাহার নাম শ্যামা। শ্যামা তাহার প্রতিবেশী-তনয়া, অতি শৈশবেই মাতাপিতৃহীনা—তাই অন্য আত্মীয় অভাবে এ পর্য্যন্ত তেজোবন্তই তাহাকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে লালন

পালন করিয়া আসিয়াছে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে বিবাহ দিয়াছে। তেজোবন্ত শ্যামাকে স্নেহ করিত কিন্তু সেই স্নেহ শান্তাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল, কারণ শ্যামা বীর্য্যবতী রমণী—তেজোবন্ত একমাত্র বীর্য্যেরই উপাসক। পাঠক, তোমরা হয়তঃ বলিবে যে, এই রাণী দুর্গাবতীর দেশে রমণীর তেজ-বীর্য্যের সংবাদে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই; কিন্তু শ্যামার প্রকৃতি নির্ভীক হইলেও তাহাতে একটু বিচিত্র বিশেষত্ব ছিল। শ্যামা স্বভাবতঃ উগ্র, কিন্তু শান্তপ্রভাবাধীনে তাহার উগ্রতা অধিকতর কোমল ভাব ধারণ করিত। শ্যামা প্রখর-বুদ্ধি-সম্পন্না, কিন্তু স্থির-বুদ্ধিবিরহিতা। শ্যামা গর্ব্বিতা, কিন্তু নিজের জন্য নহে, সমগ্র রমণী-জাতীর পক্ষ হইয়া সে ভাবিত, পুরুষগুলি নিতান্ত দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য এবং সর্ব্বতোভাবে রমণী-গণের সাহায্যাপেক্ষী বা পদতলস্থ, এই ভূতলশায়ী শিবের উপর উদ্যমশক্তি নৃত্য করিতেছে। কিন্তু তা বলিয়া শ্যামার হৃদয়ে অন্যান্য কোমলতর বৃত্তিগুলির অভাব ছিল না। সে অত্যধিক রহস্যপ্রিয় ছিল, স্নেহে বিহ্বল হইত, আর প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারিত। যাঁহার হৃদয়ে এ সব আছে, কঠিন হইলেও তাহা উর্ব্বরতাবিহীন নহে।

আমরা তেজোবন্তের সাধনার কথা বলিয়াছি কিন্তু তাহা বিবৃত করা হয় নাই। তেজোবন্ত বীর্য্যবান্ পুরুষ বটে কিন্তু নিতান্ত একগুঁয়ে ও সঙ্কীর্ণমনা। মুসলমানগণের উপর সে অত্যন্ত বিদ্বেষভাব পোষণ করিত। কোন এক সময়ে সে বাণিজ্যব্যপদেশে বহুর গিয়াছিল, তথায় আদান-প্রদান সম্বন্ধে মতান্তর উপস্থিত হওয়ায় লালবক্স নামক জনৈক মুসলমানের নিকট সে বিশেষরূপে নির্য্যাতিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া ফিরিয়া আসে। তথন অমৃত হিন্দুগ্রামের শাসনকর্ত্তা, প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে তেজোবন্ত যাইয়া তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু তেজোবন্তের মর্ম্মস্পর্শী আবেদন তাহার সিংহাসন টলাইতে পারিল না।

বিফল মনোরথ হইয়া তেজোবন্ত আত্মহত্যায় কৃতসঙ্কল্প হইল। তখন শ্যামা তাহার পরিবারভুক্ত, সে বলিল "বাবা, আত্মহত্যা কাপুরুষের শ্রেষ্ঠ সম্বল, কিন্তু পুরুষকার সকল দুর্ব্বলতা পদদলিত করিয়া চলিয়া যায়। আপনি শক্তি সঞ্চয় করুন, একদিন নিশ্চয়ই আপনার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে" সেই দিন হইতে একমাত্র মুসলমানদিগকেই নির্য্যাতিত করিবার জন্য সে হিন্দু-গ্রামে মল্ল-সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছিল।

কোন মুসলমান ভুলেও সেই স্থানে আসিয়া পড়িলে তাহার আর নিস্তার ছিল না। প্রথমতঃ তাহাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করা হইত, তৎপর তাহাকে পরাজিত, অপদস্থ এবং নানা প্রকারে হতশ্রী করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। পাঠক, পূর্ব্বোক্ত যুবকের সঙ্গে ব্যবহারেই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন।

যুবককে বন্দী-গৃহে আবদ্ধ করিয়া তেজোবন্ত গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল ; তৎপর শ্যামাকে নিকটে ডাকিয়া বলিল,—"শ্যামা, কারাগৃহে আজ বন্দী আবদ্ধ রহিয়াছে, এই লও চাবিগুলি, সতর্কতার সহিত রক্ষা করিও।" এই বলিয়া এক তাড়া চাবি শ্যামার হস্তে ফেলিয়া দিয়া সে কার্য্যব্যপদেশে অন্যত্র চলিয়া গেল। বলাবাহুল্য শ্যামাকে তেজোবন্ত অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিত।

নিশীথ রাত্রি। চতুর্দ্দিকের নীরবতার মধ্যে প্রিয় সখীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া শান্তা জিজ্ঞাসা করিল, "সই, আজ কি তিথি?"

শ্যামা—"আজ পূর্ণিমা"।

শান্তা—"বোধ হয় নির্ম্মল চন্দ্রকিরণে পৃথিবী উদ্ভাসিত হইয়া হাসিতেছে, চল্ না সই, এ সময়ে একবার বাগানে বেড়াইয়া আসি।"

শ্যামা—"এই তোর্ এক দোষ। আচ্ছা বল্ ত, আজ তুই এমন হ'লি কেন?"

শান্তা—"কি জানি ভাই, আমার শরীরটা যেন কেমন লাগিতেছে। বোধ হয় একটু অসুখ করিয়া থাকিবে।"

শ্যামা—"পোড়া কপাল যেমন আমার, আমি কি আর কিছুই বুঝিতে পারিনে? যখন হইতে কারাগারে বন্দীর কথা তোর কাণে প্রবেশ করিয়াছে, তখন হইতেই ঐ চির-প্রফুল্ল মুখখানিতে আর হাসি দেখিতে পাই নাই! আচ্ছা, বল্ ত, কারাগারের বন্দীর জন্য প্রতিদিন এইরূপ অনাহারে থাকিয়া কি লাভ?"

গৃহ অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন ছিল, তাই শ্যামা দেখিতে পাইল না যে এই কথার উত্তর দিতে যাইয়া শান্তার তুষারধবল গণ্ডস্থল বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অবশেষে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া শান্তা উত্তর করিল, "তাহা আমি কি ক'রে জানিব, বোন্! পৃথিবীতে কিসের জন্য কি হইতেছে তাহা তুমিই কি বলিতে পার?"

শ্যামা—"তা বটে। কাল বাবাকে বলিয়া দিব তুই বড় ক্ষেপেছিস্।" শ্যামা তেজোবন্তকে পিতৃ সম্বোধন করিত।

শান্তা একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিল! কিছুকাল উভয়েই নীরব; পরে শ্যামা ডাকিল "সই?" কোন উত্তর নাই। অনুভবে বুঝিতে পারিল শান্তা কাঁদিতেছে। বুঝিয়া শ্যামা স্নেহে আত্মহারা হইল, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—ইহা তাহার প্রকৃতিগত একটা বিশেষত্ব। অমনি সস্নেহে শান্তাকে তুলিয়া লইয়া বলিল, "চল্, সই, বাহিরে বেড়াইয়া আসি; তোর কাজে আমি কোন্ দিন অমত করিয়াছি।"

উভয়ে বাহিরে আসিয়া দেখিল রজনী হাস্যময়ী; জ্যোৎস্নার রূপে অঙ্গ মিশাইয়া ফুলগুলি নাচিয়া নাচিয়া দুলিতেছ; স্নিগ্ধ নৈশবায়ু সেবনে উভয়েরই চিত্তের সমতা সম্পাদিত হইল। তখন উদ্যান-মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্যামা বলিল, "দেখ্ সই, একটা মোমের পুতুল

ছিল। যতদিন বাক্সে আবদ্ধ ছিল ততদিন বেশ, কিন্তু একদিন কে জানি তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছে; অমনি সূর্য্যকিরণে গলিয়া গলিয়া তাহাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে দেখিয়াছি।”

শান্তা—“আর একটা পাথরের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ছিল, ষড়ঋতুতে ঝড়-বৃষ্টি অবিচ্ছেদে সেটা মস্তক উর্দ্ধে তুলিয়া প্রকৃতির কোলে দাঁড়াইয়া থাকিত; কিন্তু পৃথিবী শস্যপূর্ণা হইলে সামান্য ওষধী বৃক্ষও যখন তাহার আংশিক কর জগতের ধন-ভাণ্ডারে দান করিয়া ধন্য হইত, তখন ঐ উচ্চশির অনুর্ব্বর মূর্ত্তি নীরবে দাঁড়াইয়া তাহার স্বাতন্ত্রের পরিচয় প্রদান করিত। যদি পৃথিবীর কোন কাজেই না আসিতে পারিলাম, তবে এই জীবন ধারণে লাভ কি?” এই কথা বলিতে বলিতে তাহারা কারাগৃহের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন শান্তা পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, “আর দেখ্‌ সই, এই কারাগারটা, আমি এক মুহূর্ত্তের তরেও বিস্মৃত হইতে পারি না। কেন এই নির্য্যাতন? কেন এইরূপ হিংসা-বিষে জর্জ্জরিত হওয়া? আমি আমি এবং তুমি তুমি আছ বলিয়াই কি তাহা এত দোষণীয়? কি অনিষ্টকর নীতি অবলম্বন করিয়াই এই কারাগার নির্ম্মিত হইয়াছে! স্মরণ করিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে! বহু দ্বার বিশিষ্ট গৃহ— কিন্তু এক একটী দ্বারে যেন যমপুরীর এক একটী দৃশ্য চিত্রিত রহিয়াছে। ঐ দেখ প্রত্যেক দ্বারের উপরিভাগে পর্য্যায়ক্রমে লিখিত রহিয়াছে, “নির্য্যাতন, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা প্রতিদ্বন্দ্বীতা, স্বাতন্ত্র .....!” না! আর এ দৃশ্য সহ্য করিতে পারি না! আজ আমি ইহার প্রতিকার করিব।” এই বলিয়া সে প্রত্যেক দ্বারের নীচে নীচে পর্য্যায়ক্রমে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া রাখিল, উদারতা, প্রেম, ক্ষমা, সাহচর্য্য ও একতা। লিখিয়া শ্যামার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল “আচ্ছা সই, কোনটী শ্রেয়?”

এমন সময় বন্দীর করুণ স্বর তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল, “জল,

যে কেহ নিকটে আসিয়া থাক এই তৃষ্ণার্ত্ত বন্দীকে একটু জল দানে পরিতৃপ্ত কর।" যুবক, সখীদ্বয়ের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছিল।

শুনিয়া শান্তা বিচলিত হইল, শ্যামা কাঁপিয়া উঠিল, এবং সাগ্রহে সখীর হস্ত ধরিয়া বলিল, "চল্ সই, গৃহে যাই। নিশীথে এইরূপ বন-ভ্রমণ আমাদের শোভা পায় না।"

শান্তা হঠাৎ সে স্থানে বসিয়া পড়িল। বলিল, "আমি যাইব না।" অতএব শ্যামা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।"

আবার করুণস্বর শ্রুত হইল, "হায়! এই নির্দ্দয় পুরীতে কে আমাকে জলদানে পুনর্জ্জীবিত করিবে?"

শান্তা উদ্বেলিত কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল, "সই, আমরা হিন্দুর ললনা, কোন্ প্রাণে তৃষ্ণার্ত্তকে প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া যাইব?" উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "বন্দি, ক্ষণমাত্র অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে সাহায্য করিতেছি।" এই বলিয়া সে দ্রুত পাদবিক্ষেপে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং কিছু পানীয় ও আহার্য্য লইয়া ফিরিয়া আসিল। শ্যামা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কারাগৃহের দরজা উন্মুক্ত করিয়া দিল। বন্দী নিকটে আসিলে শান্তা বলিল, "তুমি কি অন্ধ?"

বন্দী—"এপর্য্যন্ত আমার তাহাই বিশ্বাস ছিল বটে, কিন্তু এখন বুঝিতেছি বালুকণায় আমার চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে।" শান্তা ধীরে ধীরে তাহার চক্ষুতে জল সিঞ্চন করিল; কিছুকাল পরেই বন্দী চক্ষু মেলিয়া চাহিল। শান্তা দেখিল—বন্দী যুবক, পদ্মপলাশ-লোচন, উন্নত-গ্রীব, বিশাল-বক্ষ এবং আর যাহা কিছু তাহা এখানে বলিয়া কাজ নাই। দেখিয়া বুঝিল এ সামান্য লোক হইবে না।

যুবক একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া সখীদ্বয়ের দিকে চাহিয়া বলিল,—"আপনারা আজ আমার যে উপকার করিলেন, তজ্জন্য চির-কৃতজ্ঞ থাকিব।"

শুনিয়া শ্যামা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বন্দী অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—“কেন ?”

শ্যামা—“আপনারা পুরুষ মানুষ, এই সকল কথাগুলি যেন আপনাদের একেবারে মুখস্থ হইয়া গিয়াছে! “চির কৃতজ্ঞ থাকিব,” “আজ্ঞাধীন দাস,” এই সব স্তব-স্তুতিত আমরা সৃষ্টির আদি কাল হইতে আপনাদের নিকট পাইয়া আসিতেছি! আপনারা প্রতিজ্ঞায় যেমন কল্পতরু কার্য্যে কিন্তু তেমন নন—আপনার দ্বারা আর বেশী কি হইবে ?”

যুবক—“কেন, আমি কি আপনাদের কোনই উপকারে আসিতে পারি না ?”

শ্যামা—“এই যা পারেন, আমার এই সইএর বর জুটিতেছে না, পারেন যদি, অবসর মত তাহার জন্য একটুকু প্রার্থনা করিবেন।”

যুবক চাহিয়া দেখিল, শান্তা মুখরা-সখীর অন্তরালে আত্মগোপন করিতে প্রয়াস পাইতেছে।

এমন সময়ে অদূরে কাহার পদশব্দ শুনা যাইতে লাগিল। শুনিয়া ত্বরিত গতিতে দুই সখী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। আর সেই নিস্তব্ধ রজনীতে নিভৃত কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া যুবক দেখিল, “বাসন্তীশুক্লা রজনী; চির কল্যাণময়ী প্রকৃতি-দেবী যেন জগতের উদ্বোধন ব্রতে নিযুক্তা! অবনী-অন্ত অম্বর-কেশ তাহার দেহ ছাইয়া পড়িয়াছে, মলয়-হিল্লোলে উন্মুক্ত অঞ্চল দুলিতেছে; বিকশিত-কুসুম-পরিশোভিত দেহ, হস্তে নব পল্লব-রাজি, পরিধানে শ্বেত বসন, অর্ঘ্য কুসুম গুচ্ছ। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, যেন বেদনা-শঙ্কিত অঙ্কে সুপ্তা পৃথিবী শায়িতা। ঊর্দ্ধে অপলক-আঁখি নিশা-নাথ বিগলিত ধারায় স্নেহ বর্ষণ করিয়া একদৃষ্টে তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছে; নীচে, কূলে কূলে তরতর-বাহি নদী-হৃদয়ে, ঊর্ম্মি নিচয় লুকিয়া লুকিয়া পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া এক চাঁদে শত চাঁদ গড়িতেছে।

প্রতিফলিত চন্দ্রালোকে, পৃথিবীর নীরবতায়, এবং নদী-হৃদয়ের তর তর শব্দে সর্ব্বত্রই যেন একতান, একসুর,—দেখিয়া যুবকের প্রাণও সেই একই সুরে বাজিয়া উঠিল।

কিন্তু হঠাৎ এক স্বর্গীয় সঙ্গীতে যুবকের সেই ধ্যান ভঙ্গ হইল। সে উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতে লাগিল :—

সমান হৃদয় হউক মোদের, হউক সমান প্রাণ।
সম কলতানে ধ্বনিয়া উঠুক সাম্য-মধুর গান॥
সমান মোদের সুখ, দুঃখ, হাসি, সমান মোদের ভাষা।
একসাথে মোরা উঠিব, পড়িব, সমান মোদের আশা॥

ভুলে যাও যত হিংসা পীড়ন, ধর্ম্ম তাহা ত নহে।
ছিড়ে ফেল যত কঠোর বন্ধন, সমাজ তাহা কি চাহে?
বিশ্বের প্রেমে অহমিকা গান ধ্বনিয়া উঠুক নিস্ব,
জাতি-অভিমান দুরে যাক্ চলে, হৃদয়ে বসাও বিশ্ব॥

আজি বিধাতার করে বাজিয়া উঠেছে মঙ্গল শুভশঙ্খ,
এস ভারতের, ওগো জগতের সবে, গঠ আজি জাতিসঙ্ঘ।
মিলন-ক্ষেত্রে মিলিয়াছি মোরা, ভেদাভেদ কিছু নাই।
এস শ্বেত, কৃষ্ণ, কাফের, যবন, আজি মোরা ভাই ভাই॥

গান থামিয়া গেল—যুবক দেখিল সেই ললিত স্বর নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে বাহিত হইয়া দুরে, বহুদুরে যাইয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে। উর্দ্ধে চাহিয়া দেখিল শাস্তা দুর্গোপরি দাঁড়াইয়া সেই সুধা বর্ষণ করিতেছিল। চতুর্দ্দিকে জ্যোৎস্নারাশি তাহার রূপের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। এক রাশি চুল বন্ধন মুক্ত হইয়া পৃষ্ঠদেশ ছাইয়া দুলিতেছিল। একটা স্তম্ভের পার্শ্বে

দাঁড়াইয়া শান্তা ফুল্লমনে গাহিতেছিল ; দেখিয়া যুবক অনুভব করিল শান্তা সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের কেন্দ্রস্বরূপ। বিহ্বলচিত্তে সে ছুটিয়া যাইতেছিল, এমন সময় পাপাত্মা আসিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া বলিল,—"পালাও, পালাও যুবক, আর ক্ষণকাল বিলম্ব করিলে বিপদ ঘটিবে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—

প্রত্যাবর্ত্তন।

পাঠক, চল আমরা এই পলায়নপর যুবকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করি। ঐ দেখ যুবক গভীর চিন্তামগ্ন, ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিতে করিতে ভাবিতেছে, "আজ একি শুনিলাম? এইরূপ মিলন-মন্ত্র আর কখনও শুনিয়াছি কি? আমি কেন, আমার পূর্ব্বপুরুষগণও বোধ হয় একমাত্র নির্য্যাতন মন্ত্রেরই উপাসক ছিলেন—কিন্তু আজ যাহা শুনিলাম তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছু আছে কি? ইহা নূতন হইলেও প্রাণের মধ্যে সঞ্জীবনী শক্তি আনিয়া দিয়াছে। নির্য্যাতন ও উদারতা, ঈর্ষা ও প্রেম, প্রতিহিংসা ও ক্ষমা, প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও সহকারীতা, স্বাতন্ত্র্য ও একতা, ইহাদের কোন্‌টী শ্রেয়?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ঐ দেখ যুবক হিন্দুগ্রামের শাসনকর্ত্তা অমৃত রায়ের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। তাহার জন্য সকলেই উদ্বিগ্ন ছিল; এখন তাহাকে দেখিতে পাইয়া সকলে সহর্ষে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। যুবক অমৃতরায়ের এক মাত্র পুত্র—নাম যাহাই হউক; সকলে তাহাকে সন্ন্যাসী বলিয়াই ডাকিত।

অমৃত পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী সকল ঘটনা আদ্যোপান্ত পিতার নিকট বর্ণনা করিল কিন্তু একস্থানে একটু চাপিয়া গেল, তাহা শাস্তা সম্বন্ধে। অমৃত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সেই দ্বিতীয় নৌকারোহী লোকটী কে, তাহা চিনতে পারিয়াছ কি?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিল—"না"

অমৃত—"আর সেই জটাজুটধারী পুরুষ, যিনি পাপাত্মা বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার কোন সংবাদ রাখ কি?"

সন্ন্যাসী কেমন করিয়া রাখিবে? স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে সেই সংবাদ আমরাও অবগত নহি। পাপাত্মা কাহার পুত্র, কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহা কেহই জানিত না; কেহই তাহার নাম অবগত ছিল না। তবে সে নিজেকে "পাপাত্মা" নামে অভিহিত করিত, তাই সকলে তাহাকে পাপাত্মা বলিয়াই ডাকিত। পাপাত্মা কখনও মুসলমান সাজিত, কখন অসভ্য ভীলের বেশ পরিধান করিত, কখন বা হিন্দুর ব্রাহ্মণ হইয়া পূজা করিতে বসিত। সর্ব্বাপেক্ষা দেশের বালকদের সহিতই তাহার অধিকতর ঘনিষ্টতা সম্পাদিত হইয়াছিল—কারণ যেখানেই পাপাত্মা সেইখানেই একদল বালক জুটিয়া করতালি দিয়া তাহার পিছু পিছু লাগিয়া যাইত। পাপাত্মা হাসিত আর বলিত "এই সময় আসিতেছে, তখন পাপাত্মা পুণ্যাত্মার ভেদাভেদ থাকিবে না—প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও।"

দ্বিতীয় নৌকারোহী কে ছিল, সন্ন্যাসী না জানিলেও আমরা তাহা বলিতে সক্ষম। তাহার নাম কেরামত উল্লা, সে এখন বহরে জান্‌বিবির সর্ব্বপ্রধান সর্দ্দার। পাঠক, গৃহ-ত্যাগের রাত্রিতে জীবনের সঙ্গে সক্ষাতের সেই বিবরণ মনে করিয়া দেখুন। কেরামত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি তাই প্রথম দর্শনেই সে সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারিয়াছিল—এবং চিনিয়াই ঐরূপ প্রতিদ্বন্দীতায় ব্রতী হইয়াছিল। যে কোন প্রকারে একটা ঝগড়া বাধান তাহার উদ্দেশ্য, তাই অতি সামান্য উত্তেজনার কারণেই সে ক্ষিপ্ত হইয়া সন্ন্যাসীকে আক্রমণ করিয়াছিল। তৎপর সন্ন্যাসীর নৌকা ধ্বংশ করিয়া সে হৃষ্টমনে বহরে চলিয়া আসিল। আসিয়াই জান্‌-বিবির সঙ্গে দীর্ঘকাল-ব্যাপী কি পরামর্শ হইল। আড়ালে দাঁড়াইয়া

সে কেরামতের সঙ্গে আবশ্যকীয় বিষয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিত। পরামর্শান্তে জান্‌বিবি জিজ্ঞাসা করিল "কি ? এত ঐশ্বর্য্য !"

কেরামত অভিবাদন করিয়া বলিল "গোলাম মিছা বলিতেছে না।"

জান্‌বিবি—"তবে ইহার প্রতিকার নিশ্চয়ই করিতে হইবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:—

উত্তেজনা।

উন্মুক্ত প্রান্তর। মধ্যস্থলে বিস্তীর্ণ দরবার-গৃহ অৰ্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা শিরে ধরিয়া ধবলশৃঙ্গবৎ শোভা পাইতেছিল। চারিদিকে বস্ত্রাবরণের গায়ে গায়ে জিঘাংসা-সুলভ প্রতিমূর্ত্তি সকল চিত্রিত রহিয়াছে। একদিকে যুদ্ধের দৃশ্য, তিরৌরী পাণিপথ হলদিঘাট প্রভৃতি যুদ্ধে হিন্দুদের যেরূপ দুর্গতি হইয়াছিল, আরাংজেবের নির্য্যাতনে তাহাদের যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল, সুলতান মামুদের হিন্দুর দেব-দেবী-মূর্ত্তি ধ্বংশের অভিযানে তাহারা যে প্রকার অপদস্থ হইয়াছিল ইত্যাদির ইতিহাস নানা শিল্প নৈপুণ্যে চিত্রিত রহিয়াছে। অন্যদিকে সমাজদৃশ্য, একস্থানে মুসলমানগণ হিন্দু বিধবাগণকে নিকা করিতেছে, কোথাও হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমানের পাককরা অন্ন খাওয়ান হইতেছে, কলমা পড়াইয়া মুসলমান করা হইতেছে; হিন্দুর ভগ্ন মন্দিরের উপর মুসলমানের মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাদের দেবমন্দির বিধ্বস্ত হইতেছে; কোথাও একজন মুসলমান দশজন হিন্দুর ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সর্ব্বোপরি ভূলুণ্ঠিত হিন্দুর উপর বিজয়োন্মত্ত মুসলমান আনন্দে নৃত্য করিতেছে। এইরূপ নানাবিধ চিত্রে সুশোভিত পট-মণ্ডপে আজ এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছে। চারিদিক হইতে অগণিত মুসলমানগণ নানা চিত্র বিচিত্র বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া সেখানে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। মৌলবিগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জাকজমকের সহিত শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে আসন জমকাইয়া বসিয়াছেন;

কেহবা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া সকলকে উপদেশ বিতরণ করিতেছেন। এমন সময় অন্দর-মহলের এক নিভৃত কক্ষে বসিয়া জান্‌বিবি বেশবিন্যাশ করিতেছিল। আমির নিকটে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে দেখিতে প্রশ্ন করিল "তুমি দরবারে যাইবে নাকি ?"

জান্‌বিবি—"হুঁ !"

আমির—"তুমি যে পরদানসীন, এত লোকের সম্মুখে বাহির হইবে কি ক'রে ?"

জান্‌বিবি—"কি, আমি পরদানসীন! কে বলিল তোমাকে এই কথা ? জান্‌বিবি কখনও গৃহকোণে বসিয়া থাকিবার পাত্রী নয় ; সে সমগ্র মুসলমানজাতির জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, সমগ্র মুসলমানজাতিকে অনুপ্রাণিত করিবে। আজ যাব, সকলকে উৎসাহিত করিব, পৃথিবীতে ইস্‌লাম ধর্ম্ম-রাজ্য স্থাপন করিব, জগতকে দেখাইব ইস্‌লাম শোণিতে কত জোর! আমি যাবনা ? আমি না থাকিলে যে এত দিনে মুসলমানগণ আবার হিন্দু হইয়া যাইত !"

অতএব আমির চুপ করিয়া রহিল। জান্‌বিবি যথাভিরুচি সজ্জিত হইয়া দেওয়ালে লম্বিত প্রকাণ্ড একখানা দর্পণে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কাণে একজোড়া দুল পরিয়া আমিরকে একটা কটাক্ষ করিল। বেচারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ জান্‌বিবির পিছু পিছু দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে দেখিল অপরূপ রূপ! অমনি আকাশ পাতাল কম্পিত করিয়া জয়ধ্বনি হইল "জয় আল্লা হো আকবরকী জয়, জয় জান্‌বিবিকী জয় !"

সভাস্থল পুনরায় নীরব হইলে জান্‌বিবি সগর্ব্বে উঠিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—"ইস্‌লামধর্ম্মের অনুচরগণ, তোমরা এই পবিত্র ধর্ম্মের উদ্দেশ্য অবগত আছ কি ? এ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এই যে, বলে হউক, ছলে হউক, অত্যাচারে কি উৎপীড়নে যে প্রকারে পার সকলকে এই ধর্ম্মের অন্তর্ভূত

করিতে হইবে। যে স্বেচ্ছায় এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে সে মুক্তি পাইবে, আর যে তোমাদের এই সৎ-উদ্দেশ্যে বাধা প্রদান করিবে, সে কাফের, তাহাকে জাহান্নামে যাইতে হইবে, তাহার সর্ব্বনাশ সাধনে কুণ্ঠিত হইও না। পৃথিবীতে তোমরা আল্লার অতি প্রিয়পাত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আল্লার ইচ্ছা যে পৃথিবীর সকলে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করুক। এইজন্য তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমাদের বাহুতে বল দিয়াছেন, শরীরে অপরিমিত তেজ দিয়াছেন, হৃদয়ে সাহস দিয়াছেন। তাঁহার এই সৎ-উদ্দেশ্য কি পূর্ণ হইবে না ?"

অমনি সেই বিশাল জনতার মধ্যে হইতে শব্দ উঠিল, "নিশ্চয়ই হইবে, জয় আল্লা হো আকৃবরকী জয় ! জয় জান্‌বিবিকী জয় !"

জান্‌বিবি—"তবে দয়ামায়ার প্রতি চাহিও না, এসকল দুর্ব্বলের সহায় ; ন্যায়পরতা, সাম্যবাদ প্রভৃতি অতল জলে ডুবাইয়া দেও, এসকল পাগলের বাণী ; নিষ্ঠুরতায় বক্ষ বাঁধিয়া সহিদ্ হইতে প্রস্তুত হও। পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া, পদভরে মেদিনী কম্পিত করিয়া, হৃদয়ে সর্ব্বধ্বংশকারী ভাব পোষণ করতঃ অগ্রসর হও, যাহা দেখিবে তাহাই পদদলিত করিবে, যাহা পাইবে তাহাই বিধ্বস্ত করিবে ! দেখিবে আকাশে সূর্য্য তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না, ভূতলে বহ্নি তোমাদিগকে গ্রাস করিবে না। প্রভঞ্জন-বেগে, ঘূর্ণাবর্ত্তের ন্যায় ভীষণতার সহিত, অশনি-সম্পাতবৎ ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে তোমরা পৃথিবীতে অশ্রুতপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন কর। সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতির উচ্ছেদের দ্বারা তোমাদের পথ চিহ্নীকৃত হউক ; ধ্বংস, কেবলমাত্র ধ্বংসই আজ হইতে তোমাদের মূল-মন্ত্র হউক।"

আবার আকাশ পাতাল কম্পিত করিয়া শব্দ উঠিল "জয় আল্লা হো আকৃবরকী জয়, জয় জান্‌বিবিকী জয় !"

জান্‌বিবি—"আর শুন, হিন্দুরা কাফের; যেহেতু তাহারা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে না; কাফের ধর্ম্মের কি বুঝিবে? অতএব যে প্রকারে পার তাহাদিগকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত কর। তাহাদের দেবমন্দির দেখিলেই তাহা ভাঙ্গিয়া মস্‌জিদ নিম্মাণ করিবে, দেবতা পাইলেই চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে; ব্রাহ্মণ দেখিলেই তাহাদিগকে কল্‌মা পড়াইয়া ছাড়িয়া দিবে। হিন্দুর বাড়ী ঘর লুট পাট করিবে, বিধবাদিগকে বিবাহ করিবে, আর হিন্দুগণ যাহা করে, তোমরা তদ্বিপরীত কার্য্য করিবে। হিন্দুদের যাহা অখাদ্য তাহাই তোমাদের খাদ্য; হিন্দুদের যাহা আচার ব্যবহার তোমাদের নিকট তাহা সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। হিন্দুরা আমাদের শত্রু, দেশের শত্রু, ধর্ম্মের শত্রু—যে প্রকারে পার তাহাদিগকে নির্য্যাতিত কর; তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিও না।

এমন সময়ে সেই জনতার মধ্যে একটা তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। কেহ বলিল "পাগল", কেহ বলিল—"না, এ ব্যক্তি হিন্দু, নিশ্চয়ই ছল করিয়া আমাদের মন্ত্রণা শুনিতে আসিয়াছে।" একজন বল পূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া জান্‌বিবির নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। সে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?"

পাগল—"আমি পাপাত্মা।"

জান্‌বিবি—"সেকি?"

পাপাত্মা—"কেন, তোমাদের সকলেই যে পুণ্যাত্মা! ধর্ম্মের নামে, যাহারা লোকের অনিষ্ট করিবে, পরপীড়ন করিবে, তাহাদেরইত পুণ্যের শরীর! ধর্ম্মের জন্য তোমরা যে প্রকার ক্ষেপিয়া উঠিয়াছ, তাহাতে ত বোধ হয় দু'দিন পরে স্বর্গে আর মানুষ ধরিবে না!"

জান্‌বিবি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল "তুমি কাফের।"

পাপাত্মা হাসিয়া উত্তর করিল—"আজ্ঞে আমি দুই। আমাকে কাফের

বলিতে চাও, তাহাতেও আপত্তি নাই, আবার মুসলমান বলিলেও আমি কোমর আটিয়া তোমাদের সঙ্গে বিবাদ করিতে আসিব না।"

জান্‌বিবি—"তুমি পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের অবমাননা করিতেছ!"

পাপাত্মা—"আর যত গুণ গাহিতেছ তোমরা! তোমাদের এই গুণগানে ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, বাহিরের লোকে দেখিবে তাহা কণ্টকময়, পরপীড়নের জীবন্ত মূর্ত্তি, আর তোমরা হৃষ্ট চিত্তে তাহার ছায়ায় বসিয়া মা'কাল ফল ভক্ষণ করিও! কেমন, সাধ মিটিবে ত?"

জান্‌বিবি বলিল—"তুমি পাগল, তোমার বাড়ী কোথায়?"

পাপাত্মা—"সে অনেক দূর।"

জান্‌বিবি—"তুমি থাক কোথায়।"

পাপাত্মা—"সর্ব্বত্র, আজ এখানে, কাল হয়ত আবার হিন্দুগ্রামে চলিয়া যাইব।"

তখন জান্‌বিবি উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"তোমরা যে কেহ এই পাগলটাকে কল্‌মা পড়াইয়া ছাড়িয়া দেও।" কয়েকজন আসিয়া ধরাধরি করিয়া পাপাত্মাকে লইয়া গেল।

জান্‌বিবি আবার বলিতে আরম্ভ করিল—"আর আজ হইতে ঘোষণা করিয়া দেও যে আমার রাজ্যে কেহই হিন্দু থাকিতে পারিবে না, এক সপ্তাহ মধ্যে এই দেশ হিন্দু রহিত হইবে। এই রাজ্যের সমস্ত দেবালয় ভাঙ্গিয়া দেও, আর তাহাদের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের স্থানে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ কর, রাস্তা ঘাটে গো-হত্যা আরম্ভ কর, যেন হিন্দুর নাম মাত্রও এই দেশে না থাকিতে পারে! মুসলমানের সঙ্গে তাহাদের সমান অধিকার থাকিবে না, আর অমার রাজ্যের বাহিরে যত হিন্দু আছে, সুযোগ পাইলেই তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করিবে; যতদিন তাহারা মুসলমান না হইবে, ততদিন তাহাদিগকে এই অতিরিক্ত হারে কর

দিতে হইবে, কিন্তু কোন মুসলমানকেই এই কর দিতে হইবে না; প্রতিজ্ঞা কর প্রতি বৎসর অন্ততঃ একবার এইরূপ কর আদায়ের যাত্রায় বাহির হইতে হইবে।"

তখন আবার দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া শব্দ উঠিল "নিশ্চয়ই বাহির হইব; জয় আল্লা হো আক্‌বরকী জয়, জয় জান্‌বিবিকী জয়।"

জান্‌বিবি—"আজ তোমাদিগকে আমি এক মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত করিব। আমি যখন হিন্দু ছিলাম, তখন আমাদের বাড়ীতে এক পাষাণের ঠাকুরের পূজা হইত, সে প্রতিদিন আমাকে ঘোরতর জ্বালাতন করিয়াছে; চল, আমাদের উদীয়মান ইস্‌লাম গৌরবের আদ্য প্রমাণ স্বরূপ আমরা সেই দেবালয় ধূলিস্মাৎ করিয়া আসি, মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলি। তোমরা প্রস্তুত থাকিও, আজ রাত্রেই আমরা এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করিব, তোমাদের উপর আল্লার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।"

তখন আবার কানন প্রান্তর কম্পিত করিয়া জান্‌বিবির জয় গান করিতে করিতে সে দিনের মত সভা ভঙ্গ হইল।

সকলেই হৃষ্ট চিত্তে নিজ নিজ বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল, কেবল একজন বাড়ীতে যাইতে বড় চিন্তা মগ্ন হইল। সে আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত কেরামত উল্লা। মূর্খ ভাবিতে লাগিল—"এই জান্‌বিবি! এত সুন্দরী! তাহাত আগে জানিতে পারি নাই। জানিলে কে সাধ করিয়া এই সুধার ভাণ্ড আনিয়া পরের মুখে তুলিয়া ধরিত! জান্‌বিবি! তুমি আমার প্রাণ! আজ হইতে তোমার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিলাম, হয় তুমি—নয় মৃত্যু! আল্লা আমার সহায় হইবে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ফকিরের দীক্ষা।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, ধীরে ধীরে দীপাবলীতে বহর সজ্জিত হইল, ধীরে ধীরে সেখানে প্রভূত লোক-সমাগম হইতে লাগিল। এমন সময় সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত হর্ম্ম্যতলে দাঁড়াইয়া মাতাপুত্রে নিম্ন লিখিতরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল। মাতার নাম লাঞ্ছিতা, আর পুত্রের নাম ফকির মিঞা। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ফকির, নগরে আজ কিসের উৎসব হইতেছে?"

ফকির—"জান্‌বিবি আজ ইস্‌লাম ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিলেন।"

লাঞ্ছিতা—"কেন, এতদিন কি ইস্‌লাম ধর্ম্মের কোন ভিত্তিই ছিল না?"

ফকির—"না থাকিবে কেন, কিন্তু তাহা এত কঠোর নহে। জান্‌বিবি বলেন, বিধর্ম্মীরা সকলেই মুসলমানের শত্রু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অতএব যে উপায়ে পার তাহাদিগকে নির্য্যাতিত কর, তাহাদের ধর্ম্মমন্দির ভাঙ্গিয়া দেও, দেবমূর্ত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ কর, এবং বল প্রকাশে তাহাদিগকে ইস্‌লাম্ ধর্ম্মে দীক্ষিত কর। জান্‌বিবি সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন ইহাই নাকি মুসলমানের একমাত্র ধর্ম্ম।"

লাঞ্ছিতা—"তারপর?"

ফকির—"তারপর, আজ আমরা হিন্দুগ্রাম লুণ্ঠন করিতে যাত্রা করিব। জান্‌বিবির মাতা একাকী এক বাড়ীতে বাস করেন, আজ আমরা যাইয়া তাহার ঘর ভাঙ্গিয়া দিয়া আসিব, দেবতা পাইলে চূর্ণ করিয়া ফেলিব। এই আয়োজনে সকলে মাতিয়া উঠিয়াছে।"

লাঞ্ছিতা তিরস্কারপূর্ণ স্বরে বলিল—"ছি! বাবা, পরের প্রাণে কষ্ট দিয়া ধর্ম্ম!"

এই ধিক্কারে পুত্র দমিয়া গেল; বলিল—"জানবিবির আদেশ যে?"

লাঞ্ছিতা—"আমাকে আগে বলিলে না কেন? জানবিবিত তোমাকে গর্ভে ধরিয়া মানুষ করে নাই। এত যত্ন করিয়া কি তোমাকে এই শিক্ষা দিলাম! নির্ম্মম, দয়াধর্ম্ম একেবারে বিসর্জ্জন দিয়াছ! ধর্ম্মের নামে নরহত্যা, পরদ্বেষ, পরপীড়ন, পরস্বাপহরণ প্রভৃতি কার্য্যে ব্রতী হইয়াছ! হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, কঠোরতা প্রভৃতি হেয় ভূষণে হৃদয়কে সুসজ্জিত করিয়াছ! হায়! হায়! কেন তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম! কেন এই কথা বলিবার আগে তোমার মৃত্যু হইল না! কেন এই কথা শুনিবার আগে আমার কর্ণ বধির হইল না! আমার এই স্নেহ-স্তন্য সর্প-শিশুকে পান করাইলেও তাহা এত বিষ উদ্গীরণ করিত না, সিংহ-শিশুকে পান করাইলেও তাহার প্রকৃতি কমনীয় হইত! যাহা স্বর্গে পড়িলে মন্দাকিনী হইত, নরকে পড়িলেও সঞ্জিবনী সুধা হইত, তাহাদ্বারা তোমাকে সস্নেহে প্রতিপালন করিয়াছি! পাষণ্ড তুই, আজি তাহার উপযুক্ত প্রতিফল দিলি! আমার হৃদয়ে আর তোর স্থান নাই, এই অঙ্ক তোকে ধারণ করিয়া অপবিত্র হইয়াছে, আজ হইতে আমি অপুত্রক হইলাম।"

ফকিরমিঞার হৃদয়ে শত শত বৃশ্চিক দংশন করিল। সে নতজানু হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার চরণ ধরিয়া বলিল, "মা, মা, আজ আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার অবোধ সন্তান।"

লাঞ্ছিতা—"তবে শুন, ইস্‌লাম ধর্ম্ম কখনও হিংসা-দ্বেষ শিক্ষা দেয় না। কঠোরতা ও সঙ্কীর্ণতা এই ধর্ম্মের অঙ্গভূষণ নহে। শুধু এই ধর্ম্ম কেন, পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম্মই নাই যাহার ভিত্তি পরপীড়নের উপর স্থাপিত। জানবিবি ভুল বুঝিয়াছেন এবং তাহার মত কার্য্যে পরিণত হইলে, ইস্‌লাম

ধর্ম্মের ভয়ানক অনিষ্ট সাধিত হইবে। সকলে ভাবিবে মুসলমান পৃথিবীতে অনিষ্ট সাধন করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা পৃথিবীর মড়ক-স্বরূপ। মহম্মদ যে ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, মহানুভব আবুবেকর, সন্ন্যাসী ওমর, পরম বিশ্বাসী আলি প্রভৃতি যাহার মন্ত্র উপাসক, উন্নতচেতা হাফেজ যে ধর্ম্মে পালিত হইয়াছিলেন, গোলেস্তা যাহার নীতি পুস্তক, সাদি যে ধর্ম্মে থাকিয়া গীত গাহিয়া গিয়াছেন, আকবর যাহার উজ্জ্বল অঙ্গভূষণ, সেই ধর্ম্মের পরিণাম যাহারা এইরূপ করিবে তাহারাই ধর্ম্মের শত্রু। আজ তোমার এই আচরণে আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি। প্রতিজ্ঞা কর, আর কখনও অত্যাচারের সাহায্য করিবে না।"

ফকির—"কখনই না।"

লাঞ্ছিতা—"বিধর্ম্মীদিগের প্রতি হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগ করিবে।"

ফকির—"নিশ্চয়ই করিব।"

লাঞ্ছিতা—"স্নেহ, প্রেম, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের অঙ্গগুলি আশ্রয় করিবে।"

ফকির—"করিব।"

লাঞ্ছিতা—"পৃথিবীর সকল ধর্ম্মেরই এক উদ্দেশ্য, প্রত্যেকেই নিজের আকাঙ্খানুরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস অবলম্বন করিয়া থাকিতে স্বাধীন; অতএব নীচ ধর্ম্ম-বিশ্বাসে অন্ধ হইয়া কাহারও প্রাণে কষ্ট দিবে না?"

ফকির—"দিব না।"

লাঞ্ছিতা—"যাহারা দিবে, যথাসাধ্য তাহাদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করিবে?"

ফকির—"করিব।"

লাঞ্ছিতা—"সর্ব্বদা আর্ত্তকে রক্ষা করিবে, ইহাতে স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মী জ্ঞান করিবে না?"

ফকির—"করিব না।"

লাঞ্ছিতা—"আমার পাদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর, সকল ধর্ম্মের সমান পোষকতা করিবে?"

ফকির মাতৃপদ স্পর্শ করিয়া বলিল—"নিশ্চয়ই করিব।"

লাঞ্ছিতা—"তবে যিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, হিন্দু মুসলমান যাহার নিকট অভেদাত্মা, যাঁহার মঙ্গলময় বিধানে আমরা সকলেই সমভাবে প্রতিপালিত হইতেছি, তিনি তোমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন। বল, ইস্‌লাম ধর্ম্মের জয়! বল, বিশ্বপ্রেমিক স্বধর্ম্ম-পালকের জয়!" ফকির তিনবার উক্তরূপ জয়ধ্বনি করিল। পরে লাঞ্ছিতা পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল—"তবে যাও, আজ হইতে এই উপদেশানুযায়ী কার্য্যে ব্রতী হইয়া আমার স্নেহের মহিমা জগতে কীর্ত্তন কর, মায়ের আশীর্ব্বাদে তুমি অবশ্য কৃতকার্য্য হইবে।"

ফকির—"যে আজ্ঞা।" বলিয়া মাতার পদবন্দনা করিয়া উঠিল। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, "আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলিনা মা!"

লাঞ্ছিতা বিস্মিত হইয়া বলিল—"তুমি কে?"

ফকির ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "পাপাত্মা!"

পাপাত্মা হাসিয়া বলিল—"হাঁ! তোমরাও দেখিতেছি তাহাই!"

ফকির—"কেন?"

পাপাত্মা—"দেখিতেছ না জগতে পুণ্যাত্মাদের কিরূপ উৎসব! পুণ্যাত্মা হবে ত পরপীড়ন কর, ধর্ম্মদ্বেষী হও, নতুবা আমারও যেই দশা তোমাদেরও তাহাই। এইমাত্র মাতাপুত্রে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে সর্ব্বধর্ম্মের পোষকতা করিবে, তবে তোমরা পাপাত্মা নও?"

লাঞ্ছিতা—"তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?"

পাপাত্মা গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল—"মা, আমি তোর্ আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। নগরের দ্বারে দ্বারে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলাম, একজনের প্ররোচনায় সকলেই মাতিয়া উঠিয়াছে, আমাকে কেহই আশ্রয় দিল না। তুই মা, ফকিরকে ভালবাসিস্, আমিও তোর্ পাদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি তোর উপযুক্ত পুত্র হইব, আমাকে আশ্রয় দে মা!" এই বলিয়া সে সত্য সত্যই লাঞ্ছিতার পদস্পর্শ করিল।

লাঞ্ছিতা বিস্মিত হইয়া বলিল—"তুমি পারিবে?"

পাপাত্মা—"নতুবা আমি তোর্ পুত্র হইবার উপযুক্ত নই।"

লাঞ্ছিতা হৃষ্টচিত্তে বলিল—"তবে তোমরা আজ হইতে আমার যুগল তনয়। তোমরা একই উদ্দেশ্যে ব্রতী হইলে। যাও, তোমাদের এই সম্মিলিত শক্তি আজ হইতে পৃথিবীর মঙ্গল-সাধনে নিয়োজিত হউক।" উভয়ে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:—

এলেমবিবি।

নির্জ্জনস্থিত মন্দির, চারিদিকে প্রাচীর-বেষ্টিত বিস্তীর্ণ ময়দান, তাহার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড চারি মহল বাড়ী। বাড়ীটি এলেমবিবির পাঠাগার।

সর্ব্বনিম্ন মহলে সাহিত্য চর্চ্চা হইত। দেওয়ালের গায়ে গায়ে চন্দ্রাতপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত পুস্তকাধার, তাহাতে আরবী, পারসী, হিন্দি, উর্দ্দু, সংস্কৃত, বাঙ্গলা, ইংরেজি, গ্রীক্, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষায় লিখিত নানাবিধ পুস্তক। পুস্তকগুলি সযত্ন-রক্ষিত, ভাষা বিভাগে পৃথকীকৃত এবং বিষয় বিভাগে স্তরীভূত। সবগুলিই সুচারুরূপে বাঁধান, চাকচিক্যময় এবং পর্য্যায়ক্রমিক সংখ্যায় চিহ্নিত। গৃহের মধ্যস্থলে একটী প্রকাণ্ড টেবিল, তাহার চারিদিক ঘিরিয়া বসিবার আসন রহিয়াছে; উপরে পাখা দুলিতেছিল, নীচে শব্দ-ধ্বংশকারী রবার-পাতে মণ্ডিত হর্ম্ম্যতল। দেওয়ালগুলি চিত্র বিচিত্র, গায়ে গায়ে কাব্যোল্লিখিত ছবি ঝুলিতেছে; কোথাও মেঘদূতের বিরহী যক্ষ গালে হাত দিয়া ভাবিতে বসিয়াছে, আবার কোথাও ধ্বংস-প্রায় ট্রয় নগর বিরাজ করিতেছে।

এই মহলের সম্মুখেই এক সুসজ্জিত উদ্যান, উদ্যানের একদিক ঘিরিয়া এক কৃত্রিম পাহাড় গঠিত হইয়াছিল। উদ্যান-ভূমি নবজাত শ্যামদুর্ব্বাদল-সমাচ্ছন্ন, তাহা আবার সমকর্ত্তিত অতএব কুসুম-শয্যানিভ। বাগানে সর্ব্বত্র নিত্য-সবুজ বৃক্ষরাজি-গঠিত কুঞ্জ, তাহাতে চিরবসন্ত বিরাজ করিত। অনন্ত—যৌবনা ফুলগুলি হাসিয়া হাসিয়া প্রীতির সুধা ছড়াইতেছে,

লুব্ধ ভ্রমর তাহাতে বসিয়া অনিমেষে মধুপান করিতেছে, কখন বা তন্ময়-চিত্তে অঙ্গ-শোভা নিরীক্ষণ করিতেছে। পাহাড়ের উপর হরিণ চরিতেছে, বিটপীর শাখে শাখে বসিয়া বিহঙ্গগণ মধুর-তান ধরিয়াছে; তর্‌তর্‌ শব্দে একটী নৃত্যশীলা নির্ঝরিণী পাহাড়ের গাত্র বাহিয়া আসিয়া যেন সমস্ত উদ্যানটীকে সজীবতা প্রদান করিতেছে। তারপর চাঁদের আলো, সন্ধ্যার তারা, ঊষার স্নিগ্ধ কমনীয় স্পর্শ, নন্দনবনের মলয় পবন, স্বর্গের জ্যোঃতি আসিয়া একে একে এই উদ্যানটী উদ্ভাসিত করিয়া যায়। কিন্তু এই স্থানের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে ষড়ঋতুতেই শুষ্ক ডালে কুসুম ফুটিয়া থাকে, আর যে একবার এই উদ্যানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে, সে কখনও ফিরিবার অবসর পায় না!

দ্বিতীয় মহলে দর্শন-পাঠ হইত। সে মহলের আড়ম্বর কিছুই ছিল না, সকল জিনিষই যেন ছাড়া ছাড়া, বাহ্যিক সম্বন্ধ-বিহীন। কিন্তু এক স্থানে একটু বিশেষত্ব লক্ষিত হইতেছিল; স্থানটি পাশ্চাত্য ধরণে সজ্জিত, চারিদিকে দর্পণ-বেষ্টিত একখানা বসিবার আসন, বসিলেই উপবেশনকারীর সর্ব্বাঙ্গ দর্পণে প্রতিফলিত হয়। অন্যত্র একটী লতা-গুল্ম-শোভিত প্রকোষ্ঠ, তাহার মধ্যে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম ও কৌপিন ঝুলিতেছে, মধ্যস্থানে একখানা কুশাসন। প্রকোষ্ঠটী হাতের লেখা পুস্তকাদিতে পরিপূর্ণ; বাহিরের সঙ্গে তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই, অথচ এক বিস্তীর্ণ রন্ধ্রপথে তথা হইতে নির্ম্মল আকাশ দেখা যাইতেছিল।

তদুপরিস্থ মহলে বিজ্ঞান ও গণিত পাঠ হইত। ইহা নানা অংশে বিভক্ত, এক অংশ বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত, এক অংশ আলোক-প্রত্যাহারে অন্ধকারাচ্ছন্ন, এক অংশে নরহত্যাকারী যন্ত্রসমূহ নির্ম্মিত হইতেছে, অন্য অংশে ব্যাধি নিবারণের জন্য সঞ্জিবনী সুধা প্রস্তুত হইতেছে। কোথাও কৃষি সম্বন্ধে, কোথাও শিল্প, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে

উপদেশের ব্যবস্থা রহিয়াছে। গগনবিহারী দূরবীক্ষণ তন্ন তন্ন করিয়া সৃষ্টির বিশালতা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। সর্ব্বত্রই শক্তিরূপিণী প্রকৃতিকে নর-আয়ত্বাধীনে আনায়ন করিয়া, তাহাকে দাসীরূপে খাটাইবার চেষ্টা হইতেছে।

সর্ব্বোপরের মহল নির্জ্জনে অবস্থিত, অতএব চিন্তাশক্তির পোষকতা করিত। এলেম প্রত্যহ পর্য্যায়ক্রমে সকল মহলে অধ্যয়ন করিয়া আসিয়া এই স্থানে ধ্যান-মগ্ন হইত। কারণ ধ্যানই জগত প্রসবিণী, যাবতীয় তত্ত্ববোধিকা। এলেম এই স্থানে বসিয়া বসিয়া গবাক্ষপথে বহুদূর নিরীক্ষণ করিতে পারিত, পরে দশজনের উদাহরণ দৃষ্টে নিজের গন্তব্যপথ স্থির করিয়া নীচে নামিয়া আসিত।

এই সর্ব্বোচ মহলে একখানা আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় এলেম নিদ্রা যাইতেছিল। বাহিরে সূর্য্যকিরণে দশদিক উদ্ভাসিত, ভিতরে আলোকের নাম মাত্রও নাই, টেবিলের উপর মিটিমিটি একটী দীপ জ্বলিতেছিল। চতুর্দ্দিক অবরুদ্ধ। এলেম এই অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছিল,—ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিলেন, ক্রমে আলোক পরিস্ফুট হইল, সূর্য্য আপনার গন্তব্যপথে একবার মাত্র ঘুরিয়া অস্তাচলে চলিয়া গেল; আবার অন্ধকার হইয়া আসিল। এলেম দেখিল সেই ভীষণ অন্ধকারে উদ্বেলিত, কলরবপূর্ণ মহাজলধি অমিত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার ভয় হইতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আবির্ভূত হইয়া সেই উদ্দাম প্রকৃতির মধ্যে অধিষ্ঠিত হইলেন! অমনি উদ্বেল প্রশমিত হইল, কলরব থামিয়া গেল, জলধি আবার শান্তভাব ধারণ করিল। এলেম দেখিল, আনন্দময়ী প্রকৃতি আসিয়া ধীরে ধীরে সেই মহাপুরুষের গলে জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন।

এলেমের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্বন্ধ নির্ণয়ে যখন সে তন্ময়তাপ্রাপ্ত, ঠিক সেই সময়ে লাঞ্ছিতার নিকট হইতে

বিদায় হইয়া পাপাত্মা ও ফকির সেই মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিল। আসিয়াই পাপাত্মা বলিল, "এই যে মা, আমি আসিয়াছি!"

এলেম—"সংবাদ কি, পাপাত্মা?"

পাপাত্মা—"আমার যাহা সাধ্য তাহা আমি করিয়াছি। সভায় যাইয়া একটু উঁকি দিয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু তাহাতে আমার সে দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা বলিবার নয়। আমি নির্য্যাতিত ও অবরুদ্ধ হইয়াছিলাম, আমার সাধ্য কি আমি তাহাতে বাধা প্রদান করি।"

এলেম—"তারপর?"

পাপাত্মা—"তারপর সারাটা বছর আমি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি, আমার বিশ্রামস্থান মিলিল না। তৎপর একস্থানে একটু আশ্রয় পাইয়াছি, যদি অনুমতি হয়ত তাহাকে দেখাইতে পারি।" এলেমের অনুমতি পাইয়া সে ফকিরকে সেই স্থানে আনিয়া উপস্থিত করিল।

এলেম বিস্মিত হইয়া বলিল—"একি! ফকির, তুমি?"

পাপাত্মা—"হাঁ মা, ইহারা মাতাপুত্রে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে কখনই অত্যাচারের সমর্থন করিবে না।"

এলেম উৎফুল্ল চিত্তে ফকিরের হস্ত ধরিয়া বলিল, "ভাই, আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। আমরা এতকাল একত্রে লালিত হইয়াছি, তাই বুঝি বিধাতা আমাদের পরস্পরের স্নেহ একই উদ্দেশ্যে ধাবিত করিয়াছেন। এস ভাই, আজ হইতে আমরা অভিন্ন-হৃদয়।" এই বলিয়া সে হস্ত ধরিয়া ফকিরকে নিকটে উপবেশন করাইল।

তখনও ফকিরের হস্তে এলেমের হস্ত সম্বদ্ধ ছিল। উভয়েই উভয়কে বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিয়াছে, একত্রে খেলা করিয়াছে, এক সঙ্গে লালিত হইয়াছে। শৈশবের লতাটীকে বৃক্ষে জড়াইয়া দিলে, তাহারা যে ভাবে বাড়িয়া উঠে, উভয়ে তদ্রূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু কই,

কোন দিনইত তাহাদের নিকট এরূপ প্রীতিপ্রদ বোধ হয় নাই। উভয়ে অনুভব করিতেছিল, যেন একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের স্রোত অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে ক্রমে ক্রমে স্পন্দিত হইয়া, তাহাদের হৃদয়ের কেন্দ্রস্থলে আসিয়া মিশিয়া যাইতেছে। কাঁপিতে কাঁপিতে ফকির অনেকক্ষণ তন্ময় হইয়া এই সুখ উপভোগ করিল, পরে সস্নেহে এলেমকে নিকটে আকর্ষণ করিয়া বলিল "এলেম, আজ হইতে তুমি আমার হইলে ?"

এলেম ফকিরের বদন প্রতি স্থির দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া বলিল—"ছি ! আমরা কাহারও নই ! আমরা জগতের মঙ্গলের জন্য সৃষ্ট হইয়াছি, জগতের মঙ্গল সাধন করিয়াই যাইব। আমাদের পৃথক অস্তিত্ব নাই, পৃথিবীর স্থিতিতেই আমাদের স্থিতি, পৃথিবীর সুখেই আমাদের সুখ, পৃথিবীর ধ্বংসেই আমাদের বিলোপ সাধিত হইবে। আমরা আপনা ভুলিয়া আজ হইতে পরের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিলাম, তুমি আমি এই মহৎ কার্য্যে এক। বল ভাই, আমরা সুখ দুঃখ অবিচ্ছেদে এই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া যাইতে পারিব কি ?"

ফকির সাদরে এলেমের মুক্ত অলকাগুলি সুবিন্যস্ত করিতে করিতে বলিল—"এলেম, তুমি এইরূপে শক্তিসঞ্চার করিলে আমি কি না করিতে পারি ?"

এলেম—"আর তুমিও আমার সহায় হইলে আমি পৃথিবীতে অসাধ্য সাধন করিতে পারি। চল, ভগবান আমাদের সহায় হইবেন।" এই বলিয়া এলেম উঠিয়া দাঁড়াইল। ফকির সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—"এলেম, পাপাত্মা কে ?"

এলেম—"তা বলিব এখন ; চল বাহিরে যাই।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—o—

বন্দী।

সন্ন্যাসী চলিয়া আসিবার পর দিন শ্যামা আসিয়া দেখিল শান্তা নির্জ্জনে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছে। সে ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া বসিল, ধীরে ধীরে শান্তার হাতখানা নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া প্রিয় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "একি! পাগল হ'লি নাকি?'

শান্তা উদাস দৃষ্টিতে শ্যামার মুখপানে চাহিয়া রহিল। শ্যামা দেখিল—শান্তার চক্ষুদুটী উজ্জ্বল, অথচ উদাস, ক্রমে তাহা বিস্ফারিত হইল, ঔৎসুক্য-ব্যঞ্জক হইল, তৎপর আবার তাহা সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। শ্যামা আরও দেখিল একখানা সাদা মেঘ আসিয়া ক্রমে ক্রমে সেই উজ্জ্বল চক্ষুদুটী ঢাকিয়া ফেলিতেছে, দেখিতে দেখিতে তাহা গাঢ়তর হইল, দেখিতে দেখিতে পদ্মকোরকে শিশির সম্পাতের ন্যায় অজ্ঞাতে তাহা ভিজিয়া উঠিল, তারপর একটু নাসিকা ফুলিল, অধর কাঁপিল, অবশেষে সেই তুষার-ধবল গণ্ডস্থল বহিয়া বর্ষার বারিধারা প্রবাহিত হইল। শান্তা শ্যামার বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

শ্যামা বলিল—"বুঝিয়াছি, তুমি মজিয়াছ!" তারপর একটু চিন্তা করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল—"কিন্তু এখনও যে জাতি কুল জানা যায় নাই!"

শান্তা—"তুমি যাহা হয় কর।"

শ্যামা—"আর আমাকেই বা করিতে হইবে কেন? তুমি যখন মজিয়াছ তখন সেও বাণবিদ্ধ হইয়াছে, নতুবা পুরুষের চরিত্র আমি এ পর্য্যন্ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই। সে আপনি আসিয়া ধরা দিবে।"

বস্তুতঃ শ্যামা ঠিক্ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছিল, পৃথিবী সূর্য্যকে আকর্ষণ করে, সূর্য্যও পৃথিবীকে আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে না ইহাই জড় প্রকৃতির নিয়ম। সন্ন্যাসী তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া শাস্তার আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু যাহা পাইল, যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার প্রাণের তৃষ্ণা মিটিল সত্য কিন্তু হৃদয় বড় আকুল হইয়া পড়িল। সে মুগ্ধনয়নে একটি বার ভিন্ন দেখিতে পায় নাই, মুগ্ধ শ্রবণে একটী গান, ক্ষণিক নূপুর ঝঙ্কার ব্যতীত শুনিতে পায় নাই, অথচ তাহাতে তাহার হৃদয়ে যে আঘাত আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহাতেই আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তারপর এই কয়দিন সন্ন্যাসী তাহাতে অবিরত আকাঙ্ক্ষা-ইন্ধন প্রদান করিয়াছে। সে সাধ করিয়া নিজেকে এই দাবানলে উৎসর্গ করিয়াছিল।

আজ চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী। হিন্দুরা এই তিথিতে গঙ্গাস্নান করিয়া থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ গঙ্গা ভারতের সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া প্রবাহিত নয়, কাজেই গঙ্গাস্নানও সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এই অভাব মোচনের জন্য ব্রাহ্মণগণের সতর্কতায় দেশে দেশে নদীর বাঁকে বাঁকে অগণিত তীর্থ স্থানের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারা বলিতেন, “গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী প্রভৃতি নদী সকলের বারি সমষ্টিতে এই সকল তীর্থ-সরিৎ পূর্ণ হইয়াছে, অতএব ইহাতে স্নান করিলে একবারে এতগুলি তীর্থস্নানের পুণ্যসঞ্চয় হয়।” অতএব ফল যাহা হইল সহজেই অনুমেয়। বৎসর বৎসর এই সকল উপতীর্থে অগণিত লোক সমাগম হইত।

হিন্দুগ্রামের অনতিদূরেই এইরূপ একটী তীর্থের আবির্ভাব হইয়াছিল। অনুকের বৃদ্ধা মাতা, স্নান না করিলে পাছে তাঁহার স্বর্গের সিঁড়ি পিচ্ছিল হইয়া যায়,—পুত্রকে আদেশ করিলেন। আদেশানুযায়ী মাতাকে লইয়া

অমৃত গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেল। সন্ন্যাসীর উপর বাড়ী রক্ষার ভার ন্যস্ত রহিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অষ্টমীর চাঁদ পৃথিবীর দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল; সন্ন্যাসী ছাদের উপর বসিয়া ধ্যানমগ্ন। সে ভাবিতেছিল "এই যে চাঁদ উঠিয়াছে, ধীর বাতাসে ফুল ফুটিয়াছে, কুমুদ বিকশিত হইয়াছে, জ্যোৎস্নাময়ী পৃথিবী হাসিতেছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সেই সজীবতা কোথায়? তাহার দেহখানিও ত এইরূপ জ্যোৎস্না-স্ফুরিত, অধর দুটী এইরূপ বিকশিত, চক্ষু দুটী এইরূপ স্নিগ্ধ কিরণ বিকীরণ করিত, কিন্তু তাহাতে যে প্রাণের অভিব্যক্তি ছিল তাহা এ জগতে আর আছে কি? আমি গর্ব্বিত ছিলাম, আমার হৃদয় বশীভূত হইয়াছে, অন্ধ ছিলাম, আমার অজ্ঞানান্ধকার ঘুচিয়া গিয়াছে, পথভ্রান্তি ঘটিয়াছিল, আমার গন্তব্যপথ স্থির হইয়াছে, হৃদয়ে শক্তি ছিল না, সে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। সে শক্তিময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী, আমি কেন, পৃথিবীর সকলের উপাসনাস্থল হইবার যোগ্য! তাহার উদ্দীপনা, সেই সঙ্গীত, পৃথিবীতে এক নূতন যুগের সূচনা করিবে, সহস্র বৎসরের জড়তা ঘুচাইয়া দিবে। আমি তাহাতেই মুগ্ধ, চিরদিন তাহারই উপাসনা করিব।"

"কিসের উপাসনা করিবে, যুবক," এই বলিয়া অকস্মাৎ পাপাত্মা আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিল "কর্ত্তব্যের না কামনার?"

সন্ন্যাসী সসম্ভ্রমে উঠিয়া বলিল, "কর্ত্তব্য কি কামনা রহিত?"

পাপাত্মা—"আমারত তাহাই বিশ্বাস কিন্তু তুমি বোধ হয় মনে ভাব যে কামনার রসে সিক্ত করিয়া উর্ব্বর ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যের বীজ অঙ্কুরিত করিবে। এদিকে তুমি কামনা লইয়াই ব্যস্ত আর দেখ না যে কর্ত্তব্যের পথে একটু একটু করিয়া নামিয়া পড়িতেছ! বহুরের কোন সংবাদ রাখ কি?"

সন্ন্যাসী বিস্মিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

পাপাত্মা বলিল—"আজ এই রাত্রে জান্‌বিবি হিন্দুগ্রাম লুণ্ঠন করিতে আসিবে।"

সন্ন্যাসী নিতান্ত বিচলিত হইয়া বলিল,—"তবে এখন উপায়?"

পাপাত্মা—"উপায় আর কি থাকিতে পারে? যে প্রকারে পার বাধা প্রদানে প্রস্তুত হও গে।" এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া লোক-সংগ্রহ-মানসে অন্যত্র চলিয়া গেল।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল, চন্দ্র অস্তাচলে যায় যায়, সন্ন্যাসী বিশ্রাম করিবার জন্য উঠিয়াছে, এমন সময় ভীষণ লোক-কোলাহল তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে উৎগ্রীব হইয়া শুনিতে লাগিল, কোলাহল ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল, তৎপর একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। কারণ জানিবার জন্য সে অধীনস্থ একজন ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিল; সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল জীবনের মাতার বাটী লুণ্ঠিত হইতেছে। শুনিয়া সন্ন্যাসী দশজন লোক লইয়া সেই বাড়ীর দিকে দ্রুত চলিয়া গেল। তখন জীবনের মাতা-ঠাকুরাণী মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিলেন—"রক্ষা কর, কে কোথায় আছ, আমার ধর্ম্ম গেল, মান গেল, সকলি গেল!" শুনিয়া সন্ন্যাসী লোক লইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"কাহার সাধ্য এই ঠাকুর মন্দির স্পর্শ করে।" অবিলম্বে দুই পক্ষে যুদ্ধ বাধিল, কিন্তু এক পক্ষ প্রাণপণে যুঝিতেছিল, তাই জান্‌বিবির লোকেরা কিয়ৎ-কাল একপদও অগ্রসর হইতে পারিল না। দেখিয়া জান্‌বিবি উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"যে ইহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবে তাহাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।" শুনিয়া একজন অগ্রসর হইল, সে আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত কেরামত মিঞা, পাপিষ্ঠ ছায়ার ন্যায় জান্‌বিবির অনুসরণ করিতে-ছিল। কেরামতের দেখাদেখি আরও দশ পাঁচ জন অগ্রসর হইল, সকলের সমবেত আক্রমণে সন্ন্যাসীর লোকজন একে একে ধরাশায়ী হইতে লাগিল;

সন্ন্যাসী মস্তকে আহত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। তখন সেই ক্ষিপ্ত জনপ্রবাহ একেবারে ঠাকুর মন্দিরের উপর আসিয়া পড়িল; দেখিতে দেখিতে তাহা ভূমিস্মাৎ হইল, নারায়ণ-চক্র চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

জান্‌বিবি অদূরেই দণ্ডায়মান ছিল; আহতা মাতা তাহাকে দেখিতে পাইয়া রুদ্ধস্বরে বলিলেন "পাপিষ্ঠা, তোর্ এই কাজ!"

জান্‌বিবি—"অন্যায় কি করিয়াছি মা, তোমার এই দেবতা প্রতিদিন আমাকে অনেক প্রকারে জ্বালাইয়াছে; আজ তাহাকে ধ্বংস করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মের ভিত্তি গঠন করিলাম। চল, তুমিও এই পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে।" শুনিয়া ক্রোধে ও দুঃখে জীবনের মাতা কথা বলিতে পারিলেন না, অধোবদনে রোদন করিতে লাগিলেন।

এদিকে সকল বিধ্বস্ত হইলে পর জান্‌বিবি মুসলমানদিগকে ফিরিতে আদেশ করিল। যাইবার সময় দেখিলেন, সন্ন্যাসী অচেতন অবস্থায় ভূমিতে পড়িয়া আছে; দেখিয়া তাহার এক বুদ্ধি খেলিল। ভাবিল, "ইহাকেই সর্ব্বপ্রথম ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে হইবে।" ইহা ভাবিয়া সে অনুচরবর্গকে আদেশ করিল "তোমরা ইহাকে বহন করিয়া বহর লইয়া চল।" বলা বাহুল্য সন্ন্যাসী নরস্কন্ধে বাহিত হইয়া অবিলম্বে বহরে আনীত হইল।

এ দিকে শান্তা চন্দ্রকিরণে উদ্যানে বসিয়া সেই রাত্রি কাটাইয়া দিল। কুহকিনী আশা আসিয়া তাহার কাণে কাণে বলিয়াছিল, এই উদ্যানেই সে প্রিয়তমের পুনরায় সাক্ষাৎ লাভ করিবে। তাই প্রতিদিন শান্তা এইরূপে তাহার প্রতিক্ষায় বসিয়া থাকে। তাহার সাজ সজ্জা করিবার কিছুই ছিল না, মল্লিকা ফুলের একছড়া হার গাঁথিয়া সে বনদেবী সাজিয়া বসিয়াছিল। শ্যামা আসিয়া দেখিয়া বলিল—"নে, এই বালাজোড়া পরিয়া অধিষ্ঠিত হ'। আজ তোর্ উদ্বোধন।"

"না সই, এ সব পরিয়া কাজ নাই, আজ আমার বিসর্জ্জনও হইতে পারে।" এই বলিয়া সে আধ আধ দুইটী কথা, আবেগপূর্ণ কয়েকটী চাহনি, এক রাশি চক্ষুর জল ও কতকটুকু লজ্জা সঞ্চিত করিয়া রাখিল। তারপর যখন কোকিল ডাকিল, স্নিগ্ধ বাতাস বহিল, উজ্জ্বল তারাগুলি মলিন হইয়া গেল, তখন তাহার হৃদয়ে এক নিরাশার স্রোত প্রবাহিত হইল। ধীরে ধীরে তাহার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। তদবস্থায় শান্তা স্বপ্নে দেখিল—"আকাশের কোলে মাধুর্য্যময় চন্দ্র হাসিতেছিল, অকস্মাৎ রাহু আসিয়া তাহা গ্রাস করিয়া গেল।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিষে বিষ।

যুদ্ধে জয়ী হইলে লোকে উৎসব করিয়া থাকে, অভীষ্ট বিষয়ে সফলতা লাভ করিলেও নরলোকে উৎসবাদির প্রথা বর্ত্তমান আছে। বিজয়োন্মত্ত জানবিবি ঘোষণা করিয়া দিল—"অদ্যাবধি এক মাস কাল বহরের নরনারী আনন্দোৎসবে মাতিয়া উঠিবে।" অবিলম্বে রাস্তা ঘাট সজ্জিত হইল, গৃহে গৃহে পতাকা উড়িতে লাগিল, রাজপথ উৎসব-রত জন-প্রবাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কিন্তু সেই আনন্দময় পুরীর মধ্যে এক নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া দুইটী বিষন্ন মূর্ত্তি! একটী ফকির মিঞা ও অন্যটী এলেম বিবি; উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে এই উৎসব-ব্যাপার দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে ফকির বলিল—"এলেম, তুমি না বলিয়াছিলে প্রবৃত্তি মনের দাসী, কিন্তু এই দেখ, তাহাই সম্পূর্ণরূপে মনের উপর আধিপত্য করিতেছে! তবে কি বিশ্বাস করিব?"

এলেম ফকিরের কাঁধে মস্তক রক্ষা করিয়া বলিল—"প্রশান্তসাগরের সঙ্গে অন্ধকারময় কূপের তুলনা করিও না, এত আলোক তাহারা কোথায় পাইবে?"

ফকির—"কিন্তু যাহাই বল এলেম, আমি আর এসব সহ্য করিতে পারিতেছি না, তোমার প্রাণে কি কিছুই বাজে না?"

এলেম,—"আমারও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে," এই বলিয়া সে একটা স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় এক ভিস্তিওয়ালা গাহিয়া যাইতেছিল—

যত সব হিন্দু-দুরাচার,
(তা'রা) অত্যাচারী, কাফের, পামর,
সয়তান অবতার।
(তা'দের) ভাঙ্গ মাথা, গুঁড় হাড়,
নির্য্যাতনে মার আর,
(তা'দের) ধর্ম্ম গেছে, সমাজ গেছে,
দেবতাগুলি শুধুই মিছে,
দু'দিন পরে ফক্কিকারী উড়ে যাবে সবাকার!
তা'রা সব হিন্দু-দুরাচার
যত সব হিন্দু দুরাচার।

ফকির তাহাকে নিকটে ডাকিয়া রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"এ গান তুই কোথায় শিখ্‌লি ?"

ভিস্তিওয়ালা—"কেন, এ গান যে জান্‌বিবি রচনা করিয়া দিয়াছে জাননা, আজ আমাদের উৎসব ?

ফকির—"কিসের উৎসব ?"

ভিস্তিওয়ালা—"তাহাও জাননা ? হিন্দুরা আজ হইতে এই—"এই বলিয়া সে জলের পাত্রটী উপুড় করিয়া দেখাইল। তার পর বা'হাতের উপর দক্ষিণ হস্তের উপর দিকটা প্রতিবার আঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিল,—"তাদের ধর্ম্ম গেছে, জাতি গেছে, সমাজ গেছে, শক্তি গেছে, সব গেছে! শুনিয়াছি তাহারা নাকি আবার মুসলমান হইবে।" এই বলিয়া সে একগাল হাসিয়া দাঁড়াইল।

ফকির—"তুই পাগল! জানিস্‌ হিন্দুরা বলিয়াছে যে এই দেশে যত ভিস্তিওয়ালা আছে তাহাদের দ্বারা তাহারা শূকর চরাইবে ?"

শুনিয়া ভিস্তিওয়ালা বলিল—"তোবা, তোবা, তোবা! তুমি কি কাফের?"

ফকির—"আমি তোমার যম"। এই বলিয়া সে ভিস্তিওয়ালার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল। তারপর তাহাকে ভূপাতিত করিয়া হস্তপদ বাঁধিয়া ফেলিল।

যখন এই কাজ সমাধা হইতেছিল, তখন কেরামত উল্লা সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। কেরামত জান্‌বিবির সর্ব্বপ্রধান সর্দ্দার, বিশেষতঃ গত রাত্রিতে সে প্রভূত বীরত্ব প্রকাশ করিয়া সকলের অতি প্রীতি-ভাজন হইয়াছিল, তাহার উপর আবার এই মহা-উৎসব, তাই বহুমূল্য চাকচিকাময় পরিচ্ছদে সর্ব্ব শরীর আচ্ছাদিত করিয়া সে জান্‌বিবির সহিত হৃষ্টমনে দেখা করিতে যাইতেছিল। পথে এই ব্যাপার দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া সে ফকিরমিঞাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"কাপুরুষ! একজন অসহায় জীবকে এইরূপে অপদস্থ করিয়া কি তোমার পৌরুষ বাড়িয়া যাইতেছে?" ফকির দৃঢ়স্বরে বলিল—"সাবধান কেরামত, আমার উপর কথা বলিবার তুমি কে? আমার কাজ আমি বেশ বুঝি।"

কেরামত—"আমার তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। আচ্ছা, কাল তুমি আমাদের সঙ্গে হিন্দুগ্রামে যাও নাই কেন?"

ফকির—"সে আমার ইচ্ছা।"

কেরামত—"কিন্তু জান্‌বিবির হুকুম অবগত আছ ত, যে ইচ্ছাপূর্ব্বক না যাইবে তাহাকে ফাঁসি যাইতে হইবে!"

ফকির—"আমার তাহাতে ভয় করিবার কিছুই নাই। তুমি জান্‌বিবিকে বলিও যে আমি বর্ত্তমান থাকিতে আর তাহাকে একটী ষড়যন্ত্রেও কৃতকার্য্য হইতে দিব না।"

কেরামত উগ্রস্বরে বলিল, "মূর্খ, নিজ ধর্ম্মের পোষকতা করিবে না?"

ফকির মিঞা ততোধিক উগ্রস্বরে উত্তর করিল,—"নীচমনা, পর ধর্ম্মের হিংসা করিবে ?"

শুনিয়া কেরামত একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। অন্যান্য গুণের মধ্যে তাহার একটী বিশেষ গুণ এই ছিল যে, সে অত্যধিক হিন্দু বিদ্বেষী ছিল। তাই ফকিরকে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অভিমত প্রকাশ করিতে দেখিয়া তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। অমনি সে ফকিরকে বারংবার আহ্বান করিয়া বলিল— "তবে এস, দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আমাদের এই বিবাদের মীমাংসা করি।"

ফকির —"আমি প্রস্তুত আছি।"

তখন দুই জনে জড়াজড়ি হুড়োহুড়ি ও মারামারি আরম্ভ হইল। অবশেষে এক সুযোগে ফকির কেরামতের বুকের উপর উঠিয়া বসিল; পরে অতি সাবধানে একটী একটী করিয়া তাহার পরিচ্ছদগুলি খুলিয়া লইয়া কেরামতকে ছাড়িয়া দিল।

কেরামত এই অবস্থাতেই জান্‌বিবির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল. তখন সে মেজের উপর বসিয়া হিন্দুগ্রাম ধ্বংসের চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। কেরামতের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া সে অমনি উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল "কি! জান্‌বিবির কার্য্যে বাধা! পর্ব্বতেরও এত গতিরোধ করিবার ক্ষমতা আছে কি ?" সদাধৃত সর্প হাঁড়ির ভিতর গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া যেরূপ অস্থির হইয়া উঠে, জান্‌বিবি ক্রোধে সেইরূপ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় সে দীর্ঘ পাদবিক্ষেপে গৃহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, অন্যমনস্কভাবে জামার আস্তিনটী গুটাইতে যাইয়া তৎসংলগ্ন বোতামটী ছিঁড়িয়া ফেলিল; দেওয়ালে একখানা সুদীর্ঘ আয়না লম্বমান ছিল, তাহাতে দৃষ্টি পড়িবামাত্র বিপরীত দিকে চক্ষু ফিরাইয়া লইল; তারপর গতি আরও ক্ষিপ্রতর হইল, শরীর ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল, গণ্ডস্থল রক্তিমাভ হইল, এই অবস্থায় সে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিতে ছুটিতে

আমির মিঞার আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব-রাত্রির অত্যধিক পরিশ্রমে আমির তখনও নিদ্রা হইতে উত্থিত হয় নাই। জান্‌বিবি আসিয়াই তাহাকে কর্কশস্বরে জাগাইয়া বলিল,—"অকর্ম্মা কাপুরুষ, হাতে সাগর সেচনের উপযুক্ত কাজ থাকিতেও তুমি অন্তঃপুর মধ্যে নিদ্রিত। আর তোমাকে লইয়া আমি ইস্‌লাম ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইতেছি? ধিক্ তোমাকে? আর ধিক্ তাহাকে, যে তোমাকে লইয়া পর্ব্বত লঙ্ঘনের প্রয়াস পায়।"

আমির অকস্মাৎ বজ্রপাতের কথা শুনিয়াছিল। আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে চমকিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল,—"কেন, কি করিতে হইবে?"

জান্‌বিবি—"কি করিতে হইবে? এই মুহূর্ত্তেই ফকিরকে পরিত্যাগ কর।"

আমির বিস্মিত হইয়া বলিল—"কেন?"

জান্‌বিবি—"সে আমাদের ধর্ম্ম কার্য্যে বাঁধা প্রদান করিয়াছে। এই উৎসবে মত্ত অনেকেই তাহার দ্বারা নির্য্যাতিত হইয়াছে, সে কেরামৎকেও অপদস্থ করিয়াছে।

আমির—"কিন্তু তাহাকে ত একবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা উচিত, নতুবা লোকে বলিবে তুমি সপত্নী-পুত্রকে হিংসাবশে পরিত্যাগ করিয়াছ।"

জান্‌বিবি—"হিংসা? সপত্নী-জ্বালায় আমি কাতর নহি, আর লোকে কি বলিবে! তাহাদিগের দিকে চাহিয়া আমি কোন্ কাজটাই বা করিয়া থাকি!"

আমির—"তথাপি তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি তাহাকে ডাকিয়া লই।" এই বলিয়া সে ফকিরের জন্য লোক পাঠাইয়া দিল।

ফকির আসিলে জান্‌বিবি তাহাকে প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"ফকির, তুমি কেরামতকে হতশ্রী করিয়াছ ?"

ফকির—"হাঁ !"

জান্‌বিবি—"কেন ?"

ফকির—"সে অযথা হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করিতেছিল ; আমি মাতৃপদ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে সর্ব্বধর্ম্মের পোষকতা না করিবে তাহার প্রতিকুলাচরণ করিব।"

জান্‌বিবি—"কি ! মাতা-পুত্রে এত ষড়যন্ত্র ! জানবিবির কার্য্যে বাঁধা প্রদানের প্রয়াস ! তবে শুন, ইস্‌লাম ধর্ম্মের অপ্রতিহত প্রভাব প্রবল বন্যার ন্যায় সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত করিবে এ কার্য্যে আমি ব্রতী ; এবং এই কার্য্যের জন্যই আমার অস্তিত্ব যে ইহাতে বিন্দুমাত্রও বিঘ্ন ঘটাইবে, সেই আমার শত্রু, ধর্ম্মের শত্রু, সমগ্র মুসলমান জাতির শত্রু। সে পিতাই হউক, কি মাতাই হউক, পুত্রই হউক, কি কন্যাই হউক, স্বামীই হউক, কি ভ্রাতাই হউক, এই প্রবল বন্যার নিকট সে তৃণবৎ ভাসিয়া যাইবে। আজ ফকির যে অপরাধ করিয়াছে, এপ্রেম সে অপরাধ করিলেও তাহাকে ক্ষমা করিব না, এমন কি আর কেহ করিলেও তোমাকে অকাতরে পরিত্যাগ করিব। ফকির তাহার মাতার সহিত এই মুহূর্ত্তেই রাজপুরী হইতে নির্ব্বাসিত হইল।"

জান্‌বিবি হেলিয়া দুলিয়া কর্ণাভরণ দোলাইতে দোলাইতে এই কথাগুলি বলিল। তখন সুপ্তোত্থিত আমির ঢুলু ঢুলু আবেশপুর্ণ-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহার বোধ হইল জান্‌বিবি বড়ই সুন্দরী, তাহার চুল গুলি সর্পযুথ সদৃশ, মুখখানা পদ্মের মত, এবং চক্ষু দিয়া তড়িৎ ছুটিতেছে। দেখিয়া সে বিমোহিত ও অবশ হইল ; কাজেই তাহার প্রতিবাদ করিবার সামর্থ্য রহিল না। ফকিরের মঙ্গলার্থে সে তাহাকে

ডাকাইয়াছিল, কিন্তু এখন বিনা আপত্তিতে পত্নী-বিসর্জ্জনে পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইল। লাঞ্ছিতা অবিচলিত; বিদায় লইবার সময় সে প্রশান্তবদনে স্বামীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আবার কবে আসিব?" আমির ইতস্ততঃ করিতেছিল; দেখিয়া জানবিবি উত্তর করিল—"আর আসিও না" কিন্তু আমির এতটা বলিতে পারিল না, সে বলিল—"আবার যখন স্মরণ করিব, তখন আসিবে, নতুবা আসিও না।"

মাতা-পুত্র ভক্তিভাবে আমিরের চরণে প্রণত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

নির্ব্বাসন।

এলেম শুনিতে পাইল ফকির ও তাহার মাতা বহর হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, কারণ, যাইবার সময় ফকির তাহার সহিত একবার দেখা করিয়া যাইবারও অবসর পায় নাই। শুনিয়া তাহার বড় রাগ হইল; ভাবিল—"কি! এত অত্যাচার! অন্য ধর্ম্মের একটু পোষকতা করিয়াছিল বলিয়াই নির্ব্বাসিত! জানবিবি ভাবিয়াছে কি সকলেই কেরামতের মত অন্ধ বিশ্বাসে তাহাকে অনুসরণ করিবে? তাহা হইলে, আমি তাহার এই ভ্রম ঘুচাইব। ফকির নির্ব্বাসিত হইয়াছে, কিন্তু এই নির্ব্বাসনের দশগুণ প্রতিশোধ নিতে আমি বর্ত্তমান আছি। আমরা একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত। তাহারা সন্ন্যাসীকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিয়াছে, ভাবিয়াছে তাহাকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া হিন্দুদিগের দক্ষিণহস্ত ভাঙ্গিয়া দিবে। আমি আজই তাহাকে মুক্ত করিয়া দিব; তখন জানবিবি বুঝিতে পারিবে যে, যতই ক্ষমতাপন্ন হওয়া যাউক না কেন, সকল উদ্দেশ্য সাধনের পথেই বহু অপ্রত্যাশিত বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়।"

এলেম বহরের রাজপুত্রীবৎ প্রতিপালিত হইয়াছিল। রাজপুরীর বাহির হইতে বা অন্য কাহারও সহিত মিশিতে তাহার বিশেষরূপে নিষেধ ছিল; একমাত্র ফকির মিঞাই, অতি শৈশব হইতে তাহার সঙ্গে লালিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও, এলেম সর্ব্বদা লোক-চক্ষুর বহির্ভূত হইয়া থাকিতে পারে নাই! এলেমের রূপ ছিল, বাহ্যিক তাহা যেরূপই থাকুক না কেন, এই রূপের আভ্যন্তরীণ বিকাশ পূর্ণমাত্রায়ই

হইয়াছিল। তিলফুলের ন্যায় নাসা, কুরঙ্গ নিন্দিত চক্ষু, বাঁধুলির ন্যায় ওষ্ঠ, এবং অন্যান্য শারীরিক সৌন্দর্য্যের চরম উৎকর্ষ তাহাতে বর্ত্তমান না থাকিলেও, তাহার কোকিল-বিনিন্দিত কণ্ঠ ছিল, নির্ম্মল সরস হৃদয় ছিল, বুকভরা সহানুভূতি এবং প্রাণভরা ভালবাসা ছিল, আর অন্যান্য মানসিক বৃত্তিগুলি সুন্দর সজ্জিত হইয়া শেফালিকা ফুলের মালার ন্যায় তাহার হৃদয়খানি বেষ্টন করিয়া শোভা পাইতেছিল। বাহিরের লোকে হয়ত এতটা বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু যেই একবার প্রেমের সংস্পর্শে আসিয়াছে, যে একবার মাত্র এই মধুরতার আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছে, সেই বিমুগ্ধ হইয়াছে। এইরূপ বিমুগ্ধ লোক যে নগরে দুই একটী ছিল না তাহা নহে। ফকির তাহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ দু'একজন বন্ধুকে মধ্যে মধ্যে প্রেমের সঙ্গে দেখা করিতে লইয়া আসিত; কিন্তু যাহারা আসিত তাহারা আর চিরজীবনে প্রেমকে ভুলিতে পারিত না। এইরূপ ভাবে অনেকে তাহার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রেম আজ তাহাদের সাহায্য লইতে মনস্থ করিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অন্ধকার রাত্রি, আকাশের কোণে বিজলি চমকিতেছিল; এমন সময় প্রায় একশত অনুচর সঙ্গে লইয়া প্রেম ছদ্মবেশে অশ্বপৃষ্ঠে সেই কারাগারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। রক্ষকদের মাত্র অষ্ট প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, প্রেম সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া অনায়াসে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া সন্ন্যাসীকে মুক্ত করিয়া দিল এবং একজন বিশ্বস্ত রক্ষক সঙ্গে দিয়া তাহাকে হিন্দুস্থানের প্রান্ত সীমায় পৌছাইয়া দিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় [illegible] এই সংবাদ অবগত হইল। তখন সে দীপালোকিত কক্ষে বসিয়া আমিরকে হিন্দুধর্ম্ম ধ্বংসের উপদেশ দিতেছিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটা ঝটিকা বাতাস আসিয়া প্রদীপটা

নিভাইয়া দিয়া গেল ; আমির দেখিল অন্ধকারে জানবিবির চক্ষু দুটী মাণিকের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে। জানবিবি বজ্রকণ্ঠে আদেশ করিল— "আজ এই মুহূর্ত্তে এলেমকে আমার পুরীর বাহির করিয়া দেও। ফকিরের যেই দশা তাহারও তাহাই।" আমির বারণ করিতে সাহস করিল না।

তখন সেই অতীত প্রায় তৃতীয় যামে এলেম এক বস্ত্রে সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। তখন মুসলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল, আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন। চতুর্দ্দিকে কেবল খর প্রবাহিত বায়ুমণ্ডলের শ্রবণ-বিরোধী তীব্র নির্ঘোষ, আর মধ্যে মধ্যে অবান-কম্পিত ভীষণ বজ্র-নিনাদ। কিন্তু এলেম ভীত বা বিচলিত হইল না, এই বিষাদেও সে কর্ত্তব্যের এক সুমধুর সুরের আহ্বান অনুভব করিল। অতএব ধীরে ধীরে সে প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর উলঙ্গ মূর্ত্তির সম্মুখে বাহির হইয়া পড়িল ঝড়ের বেগে হেলিয়া দুলিয়া, বৃষ্টি-বিন্দু-সম্পাত-বেগে নবনীত সুকুমার অঙ্গ সঙ্কুচিত প্রসারিত করিয়া, অকম্পিত দেহে সে ধীরে ধীরে পথ বাহিয়া চলিল। বারি-নিষিক্ত দেহ তাহার সৌন্দর্য্যকে চতুর্গুণ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু এই সকল সৌন্দর্য্য দেখিবার লোক রাস্তায় একটীও ছিল না, কারণ, মানব শান্ত-সৌন্দর্য্যের উপাসক মাত্র। বাসন্তী গোলাপের হাসিটুকু, দীপ্ত-প্রভাতের উষার আভা, স্থির প্রশান্ত সাগর বক্ষ, আর গৃহকোণে ঘুঘুর ডাক শুনিয়া মানুষ অস্থির হইয়া উঠে ; কিন্তু হায় ! এই দুর্জ্জয়ী প্রকৃতিতে যে কত শোভা বিকসিত হইতেছে, তাহা দেখিবার জন্য কয়জন মানব নিশীথে জানালা খুলিয়া বসিয়া থাকে ! যাহা হউক, এলেম সেই পথ দিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু আরও চলিয়াছিল একজন। এলেম দেখিল তিনি অতি বৃদ্ধ, আনাভিলম্বিত শ্বেত শ্মশ্রু বিভূষিত, পলিত কেশ, আর শুভ্র বেশ। হঠাৎ সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত এলেমের মনে পড়িয়া গেল ; এলেম

দেখিল ইনি সেই মহাপুরুষ; অমনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। এলেমকে দেখিতে পাইয়া বৃদ্ধ স্নেহপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, তুমি কোথায় যাবে?"

এলেম দেখিল ভয়ের কোনই কারণ নাই, অতএব বলিল—"তাহা বলিতে পারি না; তবে চলিয়াছি এই মাত্র জানি।"

বৃদ্ধ কিছু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"সে কি মা, এই বয়সে আশ্রয়হীন অবস্থায় একা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছ, অথচ গন্তব্যপথ ঠিক্ নাই! জাননা ইহাতে কত অনিষ্টের সূত্রপাত হইতে পারে?"

এলেম সেই ভয়ই করিতেছিল, এখন উত্তর করিতে অক্ষম হইয়া অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন,—"তবে চল মা, আমার সহিত, আমার কন্যার ন্যায় আমার গৃহের আনন্দবর্দ্ধন করিবে।"

এলেম জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার বাড়ী কোথায়?"

বৃদ্ধ—"তাহা আমারও ঠিক্ নাই, তবে এই নগরেরই এক কোণে পর্ণ-কুটির গড়িয়া লইব। আমার আশ্রয়ে থাকিলে তোমাকে ভাবিতে হইবে না।"

এলেম বৃদ্ধের অনুগমন করিল।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এলেমের দীক্ষা।

"এখন তোমার বিবরণ কি বল, মা।"

বহরের এক নির্জ্জন পল্লীতে পর্ণ-কুটীরে উপবিষ্ট পক্ক-শ্মশ্রু বৃদ্ধ এলেমের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তোমার বিবরণ কি বল, মা, নিশীথে সেই দুর্যোগের মধ্যে অসহায় অবস্থায় একা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিলে! কেন?"

এলেম বিনীতভাবে উত্তর করিল "দেব, আমি গৃহ হইতে তাড়িত হইয়াছিলাম, জানিবিবি অতিশয় পরদ্বেষী, তাহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া আমার ঐরূপ দুর্গতি হইয়াছিল।"

বৃদ্ধ—"তুমি কি করিয়াছিলে?"

এলেম—"যাহারা নির্যাতন সমর্থন কর, তাহাদিগকে নির্য্যাতিত করিয়াছি,—এবং যাহারা নির্যাতিত তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছি।" শুনিয়া অতি গম্ভীর স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন—"কাজটা ভাল হয় নাই।"

এলেম স্তম্ভিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

পাপাত্মা এতক্ষণ বৃদ্ধের পদতলে বসিয়া উপদেশ শুনিতেছিল; এখন বলিল—"কেন? এইরূপ বাধা প্রদান না করিলে কি তাহাদের অন্তর হইতে বিদ্বেষভাব তিরোহিত হইয়া যাইবে?"

বৃদ্ধ—"তোমাদের উদ্দেশ্য শ্লাঘ্য বটে, কিন্তু তাহা সাধনোপায়ে তোমরা মস্ত ভুল করিয়া বসিয়াছ।"

পাপাত্মা—"কেন?"

বৃদ্ধ—"এই মনে কর, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ উত্তাপের দরুণ আগ্নেয়-গিরির সৃষ্টি হইয়া থাকে, আজ জোর করিয়া যদি তুমি ভিসুভিয়াস্ পর্ব্বতের গহ্বর বন্ধ করিয়া দেও, তবেই কি ভূগর্ভ শৈত্যভাব ধারণ করিবে?"

পাপাত্মা—"তা কেন"?

বৃদ্ধ—"সেইরূপ এই সকল অত্যাচারেব বীজ জানবিবির হৃদয়ে ও তাহার অনুচরবর্গের মনোমধ্যে। পার যদি সেই বীজ উন্মূলিত করিতে চেষ্টা কর, নতুবা এইরূপ বাহ্যিক বাধা প্রদানে কি প্রতিকারের সম্ভাবনা আছে, পাপাত্ম? আর থাকিলেও, এই সর্ব্বব্যাপী উত্তেজনার বিরুদ্ধে তুমি আমি এই মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া তাহার কি করিতে পারি! তাই বলি, ভিন্ন পন্থা অবলম্বন কর, যাহাতে মুসলমানগণের হৃদয় হইতে এই নিকৃষ্টতম বীজ দুরীভূত হয়, যাহাতে তাহাদের অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাস তিরোহিত হইতে পারে, তাহার উপায় কর। দেখিবে, তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই অত্যা-চারকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে।"

পাপাত্মা—"কিন্তু ইহাও নিতান্ত আশ্চর্য্যের কথা যে মানুষ মনুষ্যত্বকে পদদলিত করিয়া এইরূপে পশুত্বকে শ্লাঘ্য মনে করে।"

বৃদ্ধ—তাহাতে দুঃখিত হইওনা, পাপাত্মা, এই সম্রাজটির দিকে একবার চাহিয়া দেখ। দেখিবে ইহা জরাজীর্ণ অবস্থায় অন্ধ, খঞ্জ, অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। পৃথিবীতে প্রকৃত অন্ধ কে? যে জগতের দিকে চাহিয়া দেখিতে পারে না। বধির কে? জগতের আহবানে সাড়া দিবার যাহার ক্ষমতা নাই। খঞ্জ কে? যে নিজের পায়ে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারেনা। আতুর কে? যাহার ইন্দ্রিয়গণ মনের আদেশ প্রতি-

পালন করিয়া ঐক্যতানে কাজ করিতে পারে না। যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে সমাজের প্রতি অনু পরমানুতে এই সকল অক্ষমতার নিদর্শন পরিস্ফুট রহিয়াছে। এই সকল ব্যাধি নিবারণ কল্পে অভ্যান্তরীণ শক্তি সঞ্চয় না করিয়া যদি তুমি বাহ্যিক চাপ প্রদানে সমাজটাকে সংযত রাখিতে চাও, তাহাতে তোমার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে কি ?"

সকলেই নীরব। কিছুকাল পরে এলেম নম্রভাবে বলিল,—"আজ্ঞা করুন এই উদ্দেশ্যে আমি কি করিতে পারি।"

বৃদ্ধ—"তুমি! তুমিই সব করিবে এলেম, তুমি নির্ব্বাসিত হইয়াছ সত্য কিন্তু ভগবান ইহাতে সমগ্র জগতের মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। তুমি না হইলে এই অধঃপতিত জাতির আর নিস্তার নাই, তোমার উপর ইহার শিক্ষার ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। এতদিন তুমি অন্তঃপুরে আবদ্ধ ছিলে, তোমার নিকট অতি অল্প লোকই অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, কিন্তু মা, আজ তুমি দীনের কুটীরের অধিবাসী, তোমার দ্বার অবারিত। এলেম, এই তোমার কর্ম্মক্ষেত্র, আর বিলম্ব করিওনা, বহরের প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে তোমার প্রভাব বিস্তার কর; তাহাদিগকে উদ্ধার কর, জগতে আবার শান্তির উৎস প্রবাহিত হউক।"

এলেম অবনত মস্তকে,—"যাবৎ সূর্যদেব নিজ কর্ত্তব্য সাধনে বিরত না হইবে তাবৎ আমি এই ব্রত হইতে বিচ্যুত হইব না। আজ আপনার আশীর্ব্বাদের সহিত আমি ইহা গ্রহণ করিলাম।" এই বলিয়া বৃদ্ধের চরণ বন্দনা করিল।

বৃদ্ধ—"ভগবান তোমাকে সফলকাম করুণ।" তৎপর তিনি পাপাত্মার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তাইত পাপাত্মা, তোমারও ভ্রম প্রমাদ হইয়া থাকে! তা যাক্, যাহা হইয়াছে ভালই হইয়াছে। এখন তুমি হিন্দু-গ্রামে চলিয়া যাও, ঐ তোমার কর্ম্মক্ষেত্র। আজ যাহা শুনিলে তাহা সেখানে

ঘরে ঘরে প্রচার করিও, তাহাদেরও ভ্রান্তিদূর হইবে। তাহাদিগকে বলিও, খরপ্রবাহিত স্রোতস্বিনী বাধা পাইলে আরও স্ফীত হইয়া উঠে; যদি কুল পাইতে চাও, স্রোতের অনুকুলে চেষ্টা কর, দুদিন বিলম্ব হইতে পারে সত্য কিন্তু সফলতা অবশ্যম্ভাবী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

——):০:(——

অমৃতের ব্যাকুলতা।

কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া সন্ন্যাসী যখন আসিয়া হিন্দুগ্রামে উপস্থিত হইল, তখন অমৃত গঙ্গাস্নানের পুণ্য সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। জীবনের মাতার নিকটে সে অত্যাচারের বিবরণ শুনিয়াছিল, সন্ন্যাসীর অপহরণ বৃত্তান্তও তাহাকে অতিশয় ব্যথিত করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু জান্‌বিবির এই অমানুষিক কার্য্যে ভয়-চকিত চক্ষে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে অধিকতর বিচলিত হইয়া পড়িল। একটা দেশের রক্ষক সে, সেই দেশ আবার তাহার মাতৃভূমি! একটা জাতি তাহার সুখ দুঃখের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। একটা বিস্তীর্ণ জনপদের শান্তিরক্ষার ভার সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে! যাহারা প্রভুত্বকে সর্ব্বসুখের আস্পদ বলিয়া মনে করে, তাহাদের জ্ঞানগর্ভ ধারণার প্রতি সে আর আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না। অমৃত স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে শাবক-পূর্ণ নীড়-রক্ষাকারী পক্ষীজনকের সতর্কতার সহিত এখন হইতে তাহাকে হিন্দুগ্রাম রক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। যাহা হইয়াছে তাহা আর ফিরিবার নহে, কিন্তু যাহা হইবে তাহার জন্য সে প্রস্তুত হইতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

সন্ন্যাসী যখন ফিরিয়া আসিল তখন তাহার অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন। তাহার সর্ব্ব শরীরে আঘাতের চিহ্ন, মস্তকের ক্ষত হইতে তখনও রক্তস্রাব হইতেছিল। অমৃত বুঝিতে পারিল যে পুত্র ভবিষ্যতের এক বিভীষিকাপূর্ণ দৃশ্য অঙ্গে মাখিয়া বহর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। উপযুক্ত শুশ্রূষায় শীঘ্রই

সে নিরাময় হইয়া উঠিল। তখন এক দিন পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া অমৃত জিজ্ঞাসা করিল,—"সন্ন্যাসী, বহরের অবস্থা কিরূপ দেখিলে ?"

সন্ন্যাসী—"সেস্থান এমন এক প্রকার হিন্দু বিরহিত হইয়াছে। জান্-বিবির একাধিপত্য মস্তকে ধারণ করিয়া বহর হিন্দু-বিদ্বেষ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছে। হিন্দু-গ্রামের ধ্বংস সাধনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।"

শুনিয়া অমৃত আর কিছু বলিল না, কিছুকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি না বলিয়াছিলে হিন্দুগ্রামে কে একজন মল্লসঙ্ঘ স্থাপন করিয়া শক্তি সঞ্চয়ে যত্নবান হইয়াছেন। তাঁহার আবাস-স্থানের সন্ধান করিয়া যাইতে পারিবে কি ?"

সন্ন্যাসী—"পারিব।"

অমৃত—"তবে এখনই প্রস্তুত হইয়া এস, আমার আদেশ-লিপি বহন করিয়া তোমাকে তাঁহার নিকট যাইতে হইবে।"

সেই দিনই সন্ন্যাসী তেজোবন্তের বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—):০:(—

সন্ন্যাসীর দৌত্য।

দিবা অবসান প্রায়। প্রশান্তবক্ষা ভাগিরথীর পরপারবর্ত্তী কালমসী রেখাবৎ জনপদ-শ্রেণীর শিরোভাগে তেজ-বিরল স্বর্ণথাল সূর্য্য কাঁপিতে কাঁপিতে ডুবিয়া যাইতেছিল। শিথিল-কবরী ললনার বেণীবন্ধনমুক্ত আলুথালু অলকাবলীর ন্যায়, অদৃশ্যপ্রায় সূর্য্যের শেষ রশ্মিজালে তখনও জাহ্নবী-বক্ষ অর্দ্ধেক আলোকিত, অপরার্দ্ধে সন্ধ্যার কালিমা ঘনাইয়া আসিতেছিল। দৈনিক বিহার সমাপনান্তে বিহঙ্গমগণ বিশ্রামার্থ নদীর পরপারে ঝাকে ঝাকে যাতায়াত করিতেছিল। স্রোতবাহিত দু' একখানা যাত্রীর নৌকায় সান্ধ্যপ্রভাবোৎফুল্ল শ্রান্ত মাঝি ঝিঁঝিঁট রাগিণীতে গঙ্গাবক্ষ কম্পিত করিয়া তান ধরিয়াছিল। এমন সময় তেজোবন্তের দুর্গ-পার্শ্বস্থ অলিন্দে বসিয়া শান্তা ও শ্যামা গঙ্গার দিকে চাহিয়া চাহিয়া মৃদু মধুর গল্প করিতেছিল। আজ তিন দিন শ্যামার স্বামী আসিয়াছে,—তাই তাহার বেশভূষা বিশেষ পারিপাট্য সমন্বিত। সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কার পরিশোভিত, রঙ্গিন পোষাকে সর্ব্বশরীর আচ্ছাদিত, পায়ে তরল আল্‌তা, আর সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুর বিন্দু। শান্তা তাহাই দেখিতে দেখিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"তারপর ?"

"তারপর অভিমানের পালা ; আমি রাগ করিয়া কথা কহিলাম না।"

"তিনি কি বলিলেন ?

"কি আর বলিবেন ! কত মিনতি করিতে লাগিলেন, 'আমি এই কথা বলি নাই, আমি অন্যভাবে বলিয়াছিলাম', ইত্যাদি।"

"তারপর ?"

"তারপর আমি কেন কথা কহিতে যাব? আমি চুপ করিয়া যাইয়া শুইয়া পড়িলাম।"

"আর তিনি?"

"তিনি একেবারে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'আগে শুন না আমার অপরাধটা কি, তারপর রাগ করিতে হয় করিও। আমি ঘাটে বসিয়া সাবান মাখিতেছিলাম, এমন সময় ও বাড়ীর বউদিদি আসিয়া ব্যঙ্গস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জামাই বাবু, বিদেশী মানুষ মাজিলে ঘসিলেই কি আমরা ঘরে তুলিয়া নেব নাকি!" আমি বলিলাম,—"না বউদি, তোমরা যে কালো, একদিনেই গায় ময়লা পড়ে গেছে।" জানত তাহার রূপখানা কি! তাই জ্বলিয়া আসিয়া তোমাকে এই সব লাগাইয়াছে।" এই বলিয়া তিনি আদর করিয়া একটী..." এই বলিয়া শ্যামা ঈষৎ হাসিয়া গল্প বন্ধ করিয়া দিল।

"তুই কথা কহিলি না?"

"কেন, এতেই!"

"তুই ভারি নিষ্ঠুর!"

"আর তুই ভারি বোকা। দেখ, পুরুষ মানুষত আমাদের গোয়ালের গরু; শুধু সোহাগ-রজ্জুতে বাঁধিলেই তাহারা পোষ মানিবে না, অপিচ অভিমানের খুঁটি-সহযোগে তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে সংযত রাখিতে হইবে; তবেত সোণার চাঁদ ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘরের খাদ্য চিনিবে। আর দেখ, পুরুষের ভালবাসা গরুর দুধ,—পরিশ্রম করিয়া টানিলে একটু বাহির হয়, অল্প উত্তাপেই তরঙ্গায়িত হইয়া আধার ভাসাইয়া দেয়, আবার বাসী হইলেও তাহা অখাদ্য হইয়া পড়ে, পুনরায় পরিশ্রম করিয়া জ্বাল দেওত ঘন হইয়া আসিবে! তুই দেখিতেছি আমাদের মেয়ে মানুষের নাম হাসাবি!"

"তাইত তোর্ এত সোহাগ! কপালের টিপটী যে বড় ধক্ ধক্ করিতেছে!"

"তোর্ এত হিংসা হইয়া থাকেত নেনা, আমার ভাগের অর্দ্ধেকটা না হয় তোকে দিতেছি।" এই বলিয়া শ্যামা নিজের ললাটস্থিত সিন্দুরের কতকটা লইয়া শান্তার গালে একটী টিপ দিয়া দিল। সে কোপিত হইয়া বলিল—"যা, তুই ভারি দুষ্ট্!"

শ্যামা—"কেন! তোর্ সেই মনচোরা আসিয়া ধরা দেয় না বলিয়া? তা কে জানে ভাই, কোন্ দিন অলক্ষিতে পার্থ আসিয়া আমাদের রৈবতকের এই প্রাণ হরণ করিয়া লইয়া যাইবে!" এই বলিয়া সে আদরে শান্তার চিবুক ধরিয়া একটু নাড়িয়া দিল। পরে সচকিতে বলিল, "ওকি সই!"

উভয়ে উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ মনোযোগের সহিত শুনিয়া শ্যামা বলিল,—"এ যে বাবার গলা! তিনি এত উচ্চৈঃস্বরে কি বকিতেছেন! আবার বোধ হয় কোন সর্ব্বনাশ হইয়া থাকিবে!"

কিন্তু তাহাদিগকে অধিকক্ষণ উৎকণ্ঠিত থাকিতে হইল না; অচিরেই তেজোবন্ত আসিয়া ক্রোধ-কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"শ্যামা, সে দিন সেই বন্দী কি উপায়ে মুক্তি পাইয়াছিল, আজ তাহা কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। আমার পূর্ব্বেই সন্দেহ হইয়াছিল যে তোমরা এই ষড়যন্ত্রের ভিতর লিপ্ত ছিলে।"

শান্তা ও শ্যামা উভয়েই নিরুত্তর।

তেজোবন্ত—"উত্তর দেও। আমার বিশ্বাস, তোমাদের দ্বারা এই কার্য্য হইয়াছিল।"

শ্যামা একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল,—"আপনি কি প্রকারে জানিলেন!"

তেজোবন্ত—"সেই পলাতক বন্দী আজ ফিরিয়া আসিয়াছে। অতি সন্তর্পণে সে অন্দরমহলে প্রবেশ করিতেছিল, আমার সতর্ক প্রহরিগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে।"

শ্যামা—"তারপর ?"

তেজোবন্ত—"তারপর, আমার বাড়ীতে চুরি, বুঝিতেই পার তাহার কি অবস্থা হইয়াছে। অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে তোমাদের দুই জনের নামই উচ্চারণ করিয়াছে; আমার বিশ্বাস তোমরা তাহার নিকট পরিচিত।"

শান্তা অবনত মুখে উত্তর করিল—"হাঁ বাবা, আমি তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম।"

শ্যামা—"তা ঠিক্ নয়, আমরা দুজনেই তাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছি।—"

তেজোবন্ত ধিক্কার সহকারে বলিল,—"কিন্তু শ্যামা, তোমার এ কিরূপ ব্যবহার ?"

শ্যামা—"বাবা, আশৈশব আপনার স্নেহে, আপনার সাধনার সহায় হইয়া আমি পালিত হইয়াছি কিন্তু কোন দিন এক মুহূর্ত্তের তরেও কি আমাকে আপনার অহিতাচরণ করিতে দেখিয়াছেন ? যে দিন বহরের লালবক্সের নিকট পরাজিত হইয়া আপনি আত্মহত্যায় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন সে দিন আমি কি বলিয়াছিলাম—মনে করিয়া দেখুন; সেই উত্তেজনার মূলেই আজ আপনি এত শক্তিশালী, হিন্দুগ্রামে এই মল্লসঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে। আজ তাই বলি বন্দীকে মুক্ত করিয়া দিবার আমার অন্য উদ্দেশ্য ছিল।

তেজোবন্ত একটু শান্ত হইয়া বলিল—"কি উদ্দেশ্য তাহা আমি জানিতে চাই।"

শ্যামা—"আমার বিশ্বাস বন্দী কোন বিশেষ কারণে আমাদের এখানে আসিয়া থাকিবে। নতুবা একবার ব্যাঘ্র-কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বইচ্ছায় কে তথায় পুনঃ প্রবেশ করিতে চায়? যদি অনুমতি করেন ত আমরা যাইয়া বন্দীকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে পারি।"

তেজোবন্ত—'তা যাও। কিন্তু দেখিও তাহাকে যেন আবার মুক্ত করিয়া দিয়া আসিও না।"

শ্যামা হস্ত ধরিয়া শান্তাকে লইয়া চলিল। একটু অন্তরালে আসিয়াই শান্তা শ্যামার গায়ে পড়িয়া বলিল—"তুই যানা।"

শ্যামা বলিল—"সে কি!"

শান্তা—"আমার বড় লজ্জা করে।"

শ্যামা—"ছি সই, পুরুষের কাছে এত দুর্ব্বলতা!"

শান্তা—"তোর্ পায়ে পড়ি, আজ আমাকে ক্ষমা কর।"

শ্যামা—"ঐ ত বলিয়াছি, তুই আমাদের মেয়ে মানুষের অনুপযুক্ত।"

তুমি প্রণয় দেবতা, খেলিতে খেলিতে তোমার ঐ স্বর্ণফলক তীর দ্বারা দুইটী বাঞ্ছিত হৃদয় একত্র গাঁথিয়া যাও, আর সকল ভাবে তুমি নিষ্কাম, নিতান্ত পরহিতকারী। কিন্তু হায়! তোমার ঐ নধর ছোট ছোট গঠনটীর মধ্যে চতুরতা নিহিত রহিয়াছে! সকল জিনিষেরই প্রথম উচ্ছ্বাস অতীব মনোরম এবং পবিত্রতা মূলক,—বেদের প্রথম ওঁকার ধ্বনি, সৃষ্টির সত্যযুগ, জীবনের শৈশবকাল, এসব অতি সারবান ও পবিত্র বস্তু। কিন্তু হায়! তোমার শরে আহত যুগল, প্রণয়ের সেই প্রথমোচ্ছ্বাস উপভোগ করিতে পারে কই? প্রণয়ের প্রথম কানাকানিটা তোমার সহিতেই হইয়া থাকে,—তুমি কত স্বর্গ গড়িয়া হাতে তুলিয়া দেও, কত সুধার ভাণ্ড চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত কর, কত নমনীয়তা, কমনীয়তা, শীতলতা, কোমলতা, আদর সোহাগে অঙ্গ মাখিয়া আসিয়া

তুমি প্রণয়ী-হৃদয় স্পর্শ কর, আর মুগ্ধ প্রণয়ী ততই তোমাকে হৃদয়ে জড়াইয়া ধরে। এইরূপে প্রণয়ের যাহা কস্তুভমণি তাহা তোমার হৃদয়েই শোভা পাইয়া থাকে, সুখের যাহা তরলস্পর্শ তাহা তুমিই উপভোগ কর, তারপর যাহা থাকে আমরা তাহা লইয়া কেবল ধূলা খেলা খেলিয়া যাই!

নূতন প্রণয়ী শান্তাও এতদিন কত কান্নাই না কাঁদিয়াছিল! আশার পথ চাহিয়া সে এতদিন কাটাইয়া দিয়াছে, কল্পনার সেতু বাঁধিয়া সে অপেক্ষা করিতেছিল! কিন্তু ঠিক মুহূর্ত্তে তাহার সব গণ্ডগোল হইয়া গেল, লজ্জা আসিয়া মুখখানা রক্তিমাভ করিয়া দিল, অদমনীয় আবেগ পুনঃ পুনঃ হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল, এমন কি তাহার এমন সাহসও রহিল না যে সে একটীমাত্র চোরা-চাহনি চাহিয়াও সন্ন্যাসীকে দেখিয়া লইতে পারিবে! তাই যখন শ্যামা তাহাকে বাহু বেষ্টনীতে আবদ্ধ করিয়া লইয়া চলিল, সে অনেক প্রকারে মিনতি করিতে লাগিল। কিন্তু শ্যামাকে পারিয়া উঠা ভার, সে হাসিতে হাসিতে শান্তাকে লইয়া সন্ন্যাসীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল তাহার হস্তপদ বদ্ধ, শরীরে আঘাতের চিহ্ন, মুখকান্তি ম্লান। শান্তার দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার মূর্ত্তি গম্ভীর, সহানুভূতি বা বিষাদের চিহ্নমাত্রও আর তথায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যেন প্রশান্ত সাগরবক্ষ—অবিচলিত ও অকম্পিত! তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াই সন্ন্যাসী বিরক্তি সহকারে বলিয়া উঠিল, "আবার তোমরা! কিন্তু তোমরা এই বাড়ীর কে?"

শ্যামা শান্তার প্রতি একটী কটাক্ষ করিয়া মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল,—"আমরা যেই হই, কিন্তু আপনি তস্করের ন্যায় কেন এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা আগে জানিতে চাই।"

সন্ন্যাসী—"তস্কর! দেখিতেছি তোমরা একটুক্‌রা হৃদয়কে যেন ভাগাভাগি করিয়া সকলে তিল তিল করিয়া বাঁটিয়া লইয়াছ! তা যাক্‌, কিন্তু

জানিও, আমি হিন্দু-গ্রামের ভাবি উত্তরাধিকারী। পিতার আদেশ-লিপি বহন করিয়া এখানে আসিয়াছিলাম,—তিনি তেজোবন্তকে আহ্বান করিয়াছেন, বিশেষ প্রয়োজন আছে! আমার হস্ত মুক্ত করিয়া দেও, আমি লিপি প্রদান করি। আর তেজোবন্তকে বলিও, সাধ্য থাকে যদি এই নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে যেন, তাহার সহিত আবার ভিন্ন ভাবে সাক্ষাৎ করিব।"

শ্যামা সন্ন্যাসীর হস্ত মুক্ত করি দিল; সে একখানা অৰ্দ্ধছিন্ন লিপি বাহির করিয়া তাহা শ্যামার হস্তে প্রদান করিল। বিজয়ী বীরের মত সে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া তেজোবন্তের উদ্দেশে চলিয়া গেল।

সন্ন্যাসী শান্তার দিকে চাহিয়া বলিল—"তুমি রহিলে যে?"

শান্তা—"আমি যাব না" এই বলিয়া সে সেখানে বসিয়া পড়িল।

সন্ন্যাসী—"তা থাক, কিন্তু তেজোবন্তের বাড়ীর একটা কুকুর দেখিলেও আমার শরীর জ্বলিয়া উঠে! মা গঙ্গা, অচিরে এই গর্ব্বিত পুরী তোমার পবিত্র সলিলে নিক্ষেপ করিয়া এ অপমানের তর্পণ করিব।" এই বলিয়া সে গমনোদ্যত হইল।

শান্তা বাধা দিয়া বলিল,—"আপনি বন্দী, অনুমতি ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হইবেন না।" একি শান্তা! এত শক্তি তুমি কোথায় পাইলে!

সন্ন্যাসী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শান্তার প্রতি একটী তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া শান্তা জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার কি হইয়াছে?"

সন্ন্যাসী—"কি হইয়াছে! আমি নিতান্ত হেয় কুকুরের মত লাঞ্ছিত হইয়াছি, আমাকে আত্মরক্ষার অবসর দেওয়া হয় নাই, অথচ অতি নির্দ্দয়-রূপে আমার অস্থি চূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে! কেন? আমি কি এতই ঘৃণ্য! আমি কি এতই অপদার্থ! আমার এ বাহু কি অণুমাত্রও শক্তি ধারণ করে না? আমার হৃদয়ে কি তেজবীর্য্যের এতই অভাব!"

শান্তা—"বাঃ! কেবল কতকগুলি "আমি" ও "আমার" পূর্ণ আত্মম্ভরিতার উচ্ছ্বাস! শুনিয়াছি আপনি নাকি এক মহৎ উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন?"

সন্ন্যাসী—"হাঁ, তা'তে কি?"

শান্তা—"আত্মোৎসর্গ অর্থে আমি বুঝি স্বীয় সুখ, দুঃখ, মান, অভিমান, স্বার্থ ও সত্ত্বা সব বিসর্জ্জন করিয়া অভীষ্ট বিষয়ে নিজেকে উৎসর্গ করা। প্রাণ দানেও যেখানে যথেষ্ট নহে, সামান্য নির্য্যাতনেই কি তাহাতে আত্মহারা হইতে হইবে! যেখানে "আমি"র অস্তিত্ব নাই, সেখানে "আমার" বলিয়া কিছু আসিবে কেন! মহাশয়, আমরা রমণী—অবলা ও দুর্ব্বলা, কিন্তু যাহার উদ্দেশে আত্মদান করিয়া থাকি, আপনা ভুলিয়া দিবারাত্রি তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে পারি, দর্শন আশায় পাগলিনী প্রায় অধীরা হই, সন্ন্যাসিনী সাজিয়া তাহার চরণে আপনাকে বিলাইয়া দিই, অম্লান বদনে শত নির্য্যাতন সহ্য করিতে পারি; আর আপনি পুরুষ, প্রশস্ত হৃদয় ও কষ্টসহিষ্ণু, আপনি সামান্য আঘাতেই অগ্নি উৎপাদন করিয়া থাকেন! অতি তুচ্ছ কারণে প্রতিহিংসায় জর্জ্জরিত হন! আপনাকে সতত পুষ্পপরাগে আবৃত রাখিতে চেষ্টা করেন, কুসুমাচ্ছাদিত মার্গ দিয়া অগ্রসর হইতে প্রয়াস পান! ইহা কেমনতর আত্মোৎসর্গ তাহা বুঝিতে পারিলাম না।"

বল্গাসম্বদ্ধ অশ্ব রশ্মি আকর্ষণে যেমন ফিরিয়া দাঁড়ায়, শান্তার এই কথা শ্রবণে সন্ন্যাসী সেইরূপ সংযত হইয়া দাঁড়াইল। একবার শান্তার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, অনুভব করিল শান্তা বড়ই স্নেহশালিনী, পরদুঃখ-কাতরা ও লাবণ্যময়ী। মনে পড়িল এই সেই শান্তা, যে সস্নেহে তাহার চক্ষে জল সিঞ্চন করিয়াছিল, তাহার কাতরতায় আত্মহারা হইয়া কারাগারের দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, পর-নির্য্যাতনে ব্যথিত হইয়া কারাগৃহের

দ্বারে দ্বারে শিক্ষাপূর্ণ নীতিবাক্যগুলি লিখিয়া রাখিয়াছিল, দুর্গশিখরে দাঁড়াইয়া উদ্দীপনাপূর্ণ মিলন সঙ্গীতে তাহার হৃদয়ান্ধকার দুরীভূত করিয়াছিল! আজ আবার সেই তাহার দুঃখে বিচলিত হইয়া উপদেষ্টা রূপে তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট! সন্ন্যাসীর বোধ হইল, ভূতল যেন ইহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে, প্রকৃতিদেবী যেন তাহার অফুরন্ত ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া সুষমাপুর্ণ মাধুরীতে তাহাকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন! আর হৃদয়ের দিকে চাহিতেই তাহা ধিক্কার সহকারে বলিয়া উঠিল, "হাঁরে অকৃতজ্ঞ, ভ্রান্ত যুবক, যাহার নিকট নিজের জীবন, শিক্ষা, দীক্ষার জন্য চিরঋণে আবদ্ধ, সামান্য উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া মুহূর্ত্ত পুর্ব্বেই অযথা তাহার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছ!" অতএব হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল,শাস্তার সম্মুখে নতজানু হইয়া অনুশোচনাব্যঞ্জক স্বরে সন্ন্যাসী বলিল,—"আমার শত সহস্র অপরাধ হইয়াছে, আপনি দেবী, আমাকে জীবন দান করিয়াছিলেন, আপনার উপদেশে আমার ভ্রান্তিদূর হইয়াছিল, আর আজ আবার আমি নূতন জীবন অনুভব করিতেছি। আত্মোৎসর্গের পথ এত মহান্!"

শাস্তা—"আরও মহান্ হয়, যদি আপনাকে জগতের কার্য্যে বিলাইয়া দেওয়া যায়। যেখানে আশ্রয়হীন, দীন বুভুক্ষু ব্যক্তি "হাঁ অন্ন, হা অন্ন" করিয়া জগতের দ্বারে করুণা ভিক্ষা করিতেছে, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়া নিজের মুখের গ্রাস সস্নেহে তাহার মুখে তুলিয়া দিতে হইবে। যেখানে শোকতাপ-পরিতপ্ত অবহেলিত বৃদ্ধ জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, সমাজ যাহাকে চায়না, তৃষ্ণার সময় এক বিন্দু জল মুখে তুলিয়া দিতে যাহার কেহ নাই, নিজের কথা ভুলিয়া গিয়া, সমাজের ভয় তুচ্ছ করিয়া আকুল হৃদয়ে যাইয়া তাহাকে কোলে করিয়া বসিতে হইবে। যে প্রাণ-হন্তারক রক্ত-পিপাসু শত্রু ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া আমার চিরপ্রিয় হৃদপিণ্ড

উৎপাটন করতঃ শৃগাল কুকুরের ভোগ্য করিয়া দিয়াছে, অম্লানচিত্তে যাইয়া তাহার হিত সাধন করিতে হইবে; যাহা ঘৃণ্য তাহা সহানুভূতির সহিত আলিঙ্গন করিতে হইবে, যাহা শ্লাঘ্য তাহার জন্য প্রাণপণ করিতে হইবে। আত্মোৎসর্গের পথ অতি সঙ্কীর্ণ, ইহাতে "আমি" থাকিলে "তুমি" আসিতে পারে না, আর "তুমি" থাকিলে "আমার" অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যায়।"

সন্ন্যাসী মুগ্ধ চিত্তে এই কথাগুলি শুনিতেছিল, যখন শাস্তা নীরব হইল তখন সে হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিল, "বাঃ! জগৎ কি মহান্! কি আনন্দপূর্ণ! কি সুন্দর এক প্রাণতার উপর স্থাপিত, কি উচ্চ আদর্শে গঠিত, কি প্রাণময় সহানুভূতি মূলক, ভেদাভেদ হীন ও সমসূত্রে আবদ্ধ!" যখন সে ফিরিয়া চাহিল, দেখিল শাস্তা সেখানে নাই, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তেজোবন্ত তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান! সে বলিল,—"যুবক, তোমার পত্রার্থ আমি অবগত হইয়াছি, আজ এখানে বিশ্রাম কর, কল্য প্রাতে আমার মনোভাব জানিতে পারিবে।"

রাত্রে তেজোবন্ত শ্যামাকে ডাকিয়া বলিল,—"শ্যামা এখন কর্ত্তব্য কি? অমৃত হিন্দুগ্রামের নিশ্চেষ্ট অধিপতি, আর তাহার ভাই বহরের উদ্যোগী অধিনায়ক! অমৃতের বাহুতে বল থাকিলে হিন্দুগ্রামের এই অবস্থা হইবে কেন? সেদিন লালবক্সের নিকট অপদস্থ হইয়া আমি তাহার দ্বারে আশ্রয় ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম, দেখিলাম অমৃত পণ্ডিতজন বেষ্টিত হইয়া শাস্ত্রালোচনায় ব্যস্ত, আমার প্রার্থনা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। আজ সেই কাপুরের সাহায্যে যাইয়া ফল কি?"

শ্যামা—"বাবা, ইহাতে আমাদের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।"

তেজোবন্ত—"কিসে?"

শ্যামা—"জানবিবি আপনার চির শত্রু, তাহাকে দমন করিতে যদি

অমৃতরায়ের ন্যায় একজন সাহায্যকারী জুটিয়া যায়, সেত আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যের কথা।”

তেজোবন্ত—“কিন্তু অমৃতের সঙ্গেও আমার তত প্রীতি নাই।”

শ্যামা—“তাহা অতি তুচ্ছ আত্মাভিমান লইয়া, এই সময়ে তাহা মনে রাখা উচিত নহে। অমৃত রায়ের সাহায্য পাইলে আপনি কি না করিতে পারেন? আর তিনি যখন আপনাকে ডাকিয়াছেন তখন তাহার মনেও পূর্ব্বভাব তিরোহিত হইয়াছে।

তেজোবন্ত—“তা তোমরা যেরূপ বল, একবার যাইয়া দেখিয়া আসা যাউক।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জানবিবি হরণ।

যথাবিহিত সজ্জীভূত হইয়া তেজোবন্ত আসিয়া অমৃতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। সঙ্গে আসিল সুদৃঢ় বর্ম্ম পরিহিত তাহার দশজন অনুচর। হস্তে শাণিত বর্শা, মস্তকে ঝক্‌ঝকে উষ্ণীষ, এবং কটিবন্ধে লম্বমান অসি ধারণ করিয়া যখন তেজোবন্ত আসিয়া অমৃতকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল, তখন হৃদয়ের অদমনীয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া অমৃত সিংহাসন হইতে উঠিয়া সাদরে তাহার সম্বর্দ্ধনা করিল। তেজোবন্ত কিন্তু আসন গ্রহণ করিল না। সভামণ্ডপের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"যে গৃহ এক দিন আমাকে দীন ভিক্ষুকের আসন হইতেও বঞ্চিত করিয়াছিল, আজ সেই গৃহে আমি কোন্ আসনে উপবেশন করিব?

অমৃত লজ্জিত হইয়া বলিল—"বীরের আসনে।"

তেজোবন্ত—"আজ এই সম্মান কেন, মহারাজ?"

অমৃত—"যেহেতু আপনি সাধক। আপনার প্রতি-অঙ্গে সিদ্ধির যে পুষ্টরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝাইয়া দেয় যে আপনার সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। যোগীর যাহা শ্রেষ্ট আসন, আজি এই তরবারির সহিত তাহা আমি আপনাকে প্রদান করিতেছি। যাহারা ঋষী, ঋদ্ধিই তাঁহাদের শ্রেষ্ট পুরস্কার, পার্থিব মান অপমানে তাঁহারা বিচলিত হয় না ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

তেজোবন্ত অবনতমস্তকে অমৃত-প্রদত্ত অসি গ্রহণ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিল।

তখন বহরের কথা উত্থাপিত হইল। মুসলমান দমনে তেজোবন্তের আগ্রহ দেখিয়া অমৃত বিস্মিত হইল। তেজোবন্ত স্বেচ্ছায় হিন্দুগ্রামের সেনাপতির পদ গ্রহণ করিল এবং প্রতিজ্ঞা করিল যে তাহার অসি মুসলমান রক্ত পান না করিয়া আর কোষবদ্ধ হইবে না। অদমনীয় উৎসাহে তাহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, ধমনীর ক্ষিপ্রগামী শোণিত-প্রবাহের বেগ ধারণ করিতে না পারিয়া সে আসন হইতে লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তৎপর বীরপদক্ষেপে সভামণ্ডপ পরিভ্রমণ করিতে করিতে হস্তপদ আস্ফালন করিয়া সে আশ্বাস ও নির্ভিকতার যে সকল বাণী উচ্চারণ করিল, তাহা শুনিয়া সভাস্থ সকলেই একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। অত্যধিক উত্তেজনা বশে সে আর সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে পারিল না। "আজ হইতে অষ্টাহ মধ্যে গত অত্যাচারের প্রতিশোধ না লইয়া আমি আর লোকালয়ে মুখ দেখাইব না।" এই বলিয়া সে তীরবেগে সভা হইতে বাহির হইয়া গেল। অনুচরগণ যাহারা আসিয়াছিল, উল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে করিতে তাহার অনুগমন করিল।

বহরের কেন্দ্রস্থানে জান্‌বিবির প্রাসাদ। তখনও পুরীমধ্যে বিজয়োৎ-সবের পূর্ণানন্দ প্রশমিত হয় নাই। দীপগুলি তেমনই উজ্জলভাবে জ্বলিতে-ছিল, গৃহগুলি তেমনই সজ্জীভূতভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্নিত পতাকাগুলি তেমনই পত্ পত্ শব্দে উড়িতেছিল, জনপ্রবাহ হর্ষধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তেমন ভাবেই আনন্দ কুড়াইতে ব্যস্ত ছিল। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর, চন্দ্র তখনও ডুবিয়া যায় নাই, কুঞ্জ তখনও শূন্য নহে, বিপণি তখনও মুক্তদ্বার, গায়ক তখনও মুক্তকণ্ঠ, নূপুর তখনও বাজিতেছিল, মদিরার ধারা বহিতেছিল,—এমন সময়ে জান্‌বিবি কয়েক জন বিশ্বস্ত রক্ষী সমভিব্যাহারে নৈশভ্রমণে বহির্গত হইল। রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে তাঁবু খাটাইয়া একদল বাজীকর ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করিতে-

ছিল, কৌতূহলবশে জান্‌বিবি সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। অভিনয় পূর্ব্ববৎ চলিতেছিল, অকস্মাৎ এক অচিন্তনীয় কারণে দীপগুলি নিভিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে এক তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। জান্‌বিবি বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে তাহার রক্ষিগণ কোন গুপ্তহস্ত-নিক্ষিপ্ত বর্শাঘাতে একে একে ধরাশায়ী হইতেছে। দেখিয়া সকলেই আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং যে যেদিকে পারিল, পলাইয়া প্রাণ-রক্ষা করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই স্থান জনবিরহিত হইল।

সেই গভীর অন্ধকারে দৃঢ় মুষ্টিতে জান্‌বিবির হস্ত ধরিয়া কে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমিই কি জান্‌বিবি ?"

জান্‌বিবি ক্রুদ্ধস্বরে উত্তর করিতেছিল,—"কেরে দুরাত্মা" কিন্তু সে আর বলিতে পারিল না, অলক্ষিতে কে আসিয়া তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। জান্‌বিবি দেখিল তাহার হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কে তাহাকে পৃষ্ঠে লইয়া দৌড়িতেছে।

তেজোবন্তের অভিসন্ধি এই পর্য্যন্ত সুন্দররূপে ফলদায়ক হইল। সে ছদ্মবেশে আসিয়া বাজিকরের অভিনয় দেখিতেছিল, জান্‌বিবিকে হস্তগত করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া সে তাঁবুতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল, এবং যে সম্মুখে পড়িল তাহাকেই হত বা আহত করিয়া হিন্দুগ্রামের উদ্দেশে ধাবিত হইল। অগ্নি শুধু তাঁবু দগ্ধ করিয়াই নিরস্ত হইল না, কিন্তু একে একে বহুগৃহ ভস্মসাৎ করিয়া বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

কেরামত কৌতূহলী হইয়া সেই দিকে আসিতেছিল, পথে লোকমুখে জান্‌বিবির হরণ-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সে তখনই শতাধিক অশ্বারোহী সেনাসংগ্রহ করিয়া তেজোবন্তের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। সংবাদ পাইয়া একে একে দু'য়ে দু'য়ে শতে শতে মুসলমান সেনা আসিয়া তাহার সহিত

মিলিত হইতে লাগিল। এইরূপে এক পুষ্ট দলবল লইয়া সে ক্ষিপ্রগতিতে তেজোবন্তের পশ্চাদানুসরণে প্রবৃত্ত হইল।

তেজোবন্ত অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। বহরের প্রান্তসীমায় উপস্থিত হইতে না হইতেই সে পশ্চাতে সৈন্যকোলাহল শুনিতে পাইল। তখন আর অন্য উপায় ছিল না, তাহার সঙ্গে অশ্ব ছিল না, লোকবলও তাহার প্রচুর নহে, অতএব একটা অপ্রশস্ত নদীর তীরে অর্দ্ধেক সৈন্য সংস্থাপন করিয়া সে নিকটবর্ত্তী একটী নগরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। যাহারা নদীতীরে রহিল তাহারা কেরামতকে যথাসাধ্য বাধাপ্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু তখন তেজোবন্ত হিন্দুগ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল—নগরটী হিন্দুগ্রামের অন্তর্ভুক্ত।

মুষ্টিমেয় হিন্দুসেনা অধিকক্ষণ কেরামতের বেগ সহ্য করিতে পারিল না, ক্রমেই তাহারা পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। অবশেষে যখন আসিয়া তাহারা পুনরায় তেজোবন্তের সঙ্গে মিলিত হইল, তখন কেরামত সসৈন্যে নগরটী বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। কাহারও আর পলাইবার উপায় রহিল না।

তেজোবন্তের আশ্রয়স্থল নগরটী অতিশয় সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু কেরামতের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তেজোবন্ত তাহাকে আরও সুরক্ষিত করিয়া তুলিল। তাহার আহ্বানে নগরের বালক, বৃদ্ধ, যুবক সকলেই সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে যত্নবান হইল। দুইপক্ষে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল; এই যুদ্ধের দৃশ্য বর্ণনাতীত। মৃত্যুর সঙ্গে জীবিতের সংগ্রাম, কেহই আহত হইল না, অথবা যাহারা হইল, তাহারাও শত্রুপীড়নে প্রাণত্যাগ করিল। দুইদিন যুদ্ধের পরে তেজোবন্ত বুঝিতে পারিল আর আশা নাই, অসম্ভবের সহিত যুদ্ধ করিয়া আর কি হইবে! কিন্তু তথাপি সে বিচলিত হইল না, অনেক ভাবিয়া সে নির্ম্মম কর্ত্তব্যের শেষ পন্থাটী অবলম্বন করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইল। দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া সে যুদ্ধের অবস্থা

এমন সুনিপুণভাবে প্রচার করিল যে ভবিষ্যতের অত্যাচারের দৃশ্য অতি সুন্দর ভাবেই সকলের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গেল। বিধবা অশ্রু মুছিলেন, পুত্রহারা মাতা সিংহীর ন্যায় বল-দৃপ্ত হইয়া উঠিলেন, ভ্রাতৃশোকাতুরা ভগিনীর চক্ষে জ্যোঃতি ফুটিয়া উঠিল। রমণীর যাহা শ্রেষ্ঠরত্ন তাহা রক্ষাকল্পে সকলেই আত্মোৎসর্গে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল।

একটা বিস্তীর্ণ উদ্যানে হতাবশিষ্ট পুরুষগণ যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইল। মধ্যে প্রজ্বলিত হুতাশন লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া যেন আহুতি আহ্বান করিতেছিল। একে একে রমণীগণ আসিয়া তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল। একে একে সেই স্থানে সৌন্দর্য্য, সরলতা, ভক্তি, স্নেহ, প্রেম ও প্রীতি ভস্মীভূত হইয়া গেল।

তেজোবন্ত চক্ষু মুছিল। প্রতিশোধ বাসনা তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সহচরগণকে আহ্বান করিয়া সে তখনই শত্রুসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সে বেগ অদমনীয়, সংখ্যাধিক্য তাহা রোধ করিতে পারিল না। যখন সে সেই মুসলমানব্যুহ ভেদ করিয়া বাহির হইল, তখন সে একা। কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সে একদিকে ছুটিয়া চলিতেছিল। তাহার অঙ্গে আঘাত লাগিয়াছিল কিনা তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু হৃদয়ের আঘাত যে তাহার বহুদিন পর্য্যন্ত মুছিয়া যায় নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শুচিরামের উপদেশ।

প্রশস্ত বৈঠকখানা গৃহ, শ্বেত বস্ত্রাবৃত ফরাসের উপর আলবোলার কারুকার্য্য-খচিত নলহস্তে, তাকিয়ার উপর দেহরক্ষা করিয়া অমৃত উপবিষ্ট; পার্শ্বে বিষণ্নমূর্ত্তি তেজোবন্ত বসিয়া সামরিক ব্যয়ের একটা তালিকা প্রস্তুত করিতেছিল। অদূরে হিন্দু-গ্রামের অতি বৃদ্ধ কুলপুরোহিত শুচিরামশর্ম্মা অন্য দুইটী তাকিয়া ভর করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, বয়স তিনকুড়ি দশবৎসর, দেহের চর্ম্মগুলি মধুপূর্ণ মৌচাকের মত স্থানে স্থানে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, কেশ-বিরহিত মস্তকটী একটা পক্ক দাড়িম্বের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। পার্শ্বে একটী পুরাতন যষ্ঠি, হস্তে একটী নস্যের কৌটা; দুই তিনবার তাহা হইতে বিচিত্র নাসিকাধ্বনির সহিত নস্য গ্রহণ করিয়া, তিনি বলিতে লাগিলেন—"সে বহুদিনের কথা, অমৃত, পূর্ব্বে শুনিয়াছি দেবতারা নাকি মর্ত্তভূমে আসিয়া মানবের জন্য যুদ্ধ করিতেন। এখন কি আর সে দিন আছে?"

অমৃত—"তাইত এ যে ঘোর কলিকাল!"

শুচি—"তবেই দেখ, যে গৃহের কর্ত্তা ঘুমাইয়া থাকে, চোরের তথায় পোয়াবার। দেবতাই যদি ঘুমাইয়া রহিলেন, তবে আর আমাদের আশা কি! লোকে ধর্ম্মকর্ম্ম ছেড়েছে। বড়লোকের দান ধ্যান উঠে গেছে! গুরু-ব্রাহ্মণে আর সেইরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা নেই! এ সব দেখেও দেবতারা মুখ তুলে চান না! সব ঘুমে, সকলেই যেন একেবারে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।"

অমৃত—"তবে এদেশের হবে কি ?"

শুচি—"হবে আবার কি ? যা হ'বার তাই হ'বে! তবে বাবা, এই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম তিনযুগ তের বৎসর যাবৎ চলিয়া আসিতেছে, ইহা সহজে লোপ পাইবার নহে। কার্য্য কর, কার্য্য কর, এ কর্ম্মক্ষেত্রে বসিয়া থাকিবার বিধি নেই।

অমৃত ভক্তিভাবে বলিলেন—"কিরূপ কার্য্য করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।"

শুচি—"স্থানে স্থানে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা কর; ষোড়শোপচারে প্রত্যহ দুইবেলা পূজার বন্দোবস্ত কর, বলি দেও, দান কর, ধ্যান কর, পূজা জপ তপাদি কর, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি রাখ, পিতামাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হও, পত্নীকে পতিভক্তি শিক্ষা দেও, নিজের পুত্র বলি দিয়া প্রতিজ্ঞা পালন কর, নিজের মাংস কাটিয়া দিয়া আশ্রিতকে রক্ষা কর, অবশেষে বনে যাইয়া প্রাণত্যাগ কর। এই সকলই ত কাজ।'

অমৃত—"আর ?"

শুচি—'আর কি! আর, নিষ্ঠা ও শুচির প্রতি দৃষ্টি রাখ, অপবিত্র জিনিষের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কর, বুঝ্লে কিনা, ইহা সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম, অপবিত্র জিনিস ইহার সংস্পর্শে আসিতে পারে না।

অমৃত—"যে আজ্ঞা।"

শুচি—"এই ত গেল ধর্ম্মের কথা। এখন কাজের কথা কিছু বলিতে হইতেছে; বুড়া হইয়াছি কি না, সবটা সকল সময় মনে আসিয়া জোটে না। এই যে বলিতেছিলাম—আমাদের বাড়ীতে নারায়ণ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে—তোমাকে এইজন্য দুই হাজার টাকা সাহায্য করিতে হইবে।"

অমৃত—"আপনার যাহা আজ্ঞা আমি তাহাই দিব।"

শুচি—"তা কি আর আমি জানিনে! এই জন্যই ত বলি হিন্দু-ধর্ম্ম

সহজে লোপ পাইবার নহে। বাবা, যাহা করিলে এই কাজ, আর সব মিথ্যা। ভগবান্‌ ত্রাণ কর।” এই বলিয়া তিনি পুনরায় নস্য গ্রহণ করিলেন।

অমৃত—“আপনি যখন আদেশ করিবেন আমি তখনই টাকা পাঠাইয়া দিব।”

শুচি—“দিবে তা আমি জানি। কিন্তু আরও একটা কথা আছে, শুনিলাম সে দিন রাত্রে আসিয়া নাকি জান্‌বিবি তাহার মাতার বাড়ী লুণ্ঠন করিয়া গিয়াছে?”

অমৃত—“হাঁ, সে কথা সত্য।”

শুচি—“এই স্পষ্ট প্রমাণ দেখ, যাহা বলিতেছিলাম তাহা অকাট্য, অস্বীকার করে কা’র সাধ্য। নতুবা অতবড় শালগ্রামটা চূর্ণ হইয়া গেল, আর দেবতাই যদি জাগ্রত থাকিবে, তবে জান্‌বিবির মাথায় তখন বাজ পড়িল না কেন?—সব গেছে, অমৃত, সব গেছে, হিন্দুর দেবতা আর হিন্দুর ত্রাণকর্ত্তা নহে।

অমৃত—“সে একটা ভয়ানক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন কি করিব তাহাই ভাবিতেছি।”

শুচি—“হাঁ, আমিও সে কথা [illegible]তেছিলাম। জীবনের মাতার জাত গেছে, আর তাহার সংস্পর্শে যাইও না।”

অমৃত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—“সে কি!”

শুচি—“হাঁ, যাহা বলি তাহা কর। জীবনের মাকে আর সমাজে লইয়া চলিতে পারিবে না। যা’র বাড়ীতে মুসলমান আসিয়া দেবতা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শ-জনিত দোষ ঘটিয়াছে। আমার আদেশ, তুমি তাহা হইতে দূরে থাকিবে।”

অমৃত চিন্তা করিতে লাগিল। এমন সময় অতি ব্যস্তভাবে

পাপাত্মা আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। আসিয়াই শুচিরাম শর্ম্মাকে দেখিয়া বলিল—"এই যে, আপনি এখানে!"

শুচিরাম ততোধিক ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"কেন, কি হইয়াছে?"

পাপাত্মা—"আর হইয়াছে! একেবারে আপনার সর্ব্বনাশ! আমি আসিতেছিলাম, দেখিলাম আপনার বাড়ীতে আসন্ন-প্রসবা একটা গাভী জলে পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে।"

শুনিয়া, "আঃ! আঃ! তবে আমার কি হবে গো! আমি চলিলাম, অমৃত, যেরূপ বলিলাম মনে রাখিয়া কার্য্য করিও। ভগবান, ত্রাণ কর! ভগবান, ত্রাণ কর!" এই বলিতে বলিতে, বৃদ্ধ ব্যস্ততা সহকারে উঠিয়া দ্রুতপদে চলিতে চেষ্টা করিলেন। শক্তি নাই—দুই তিনবার আছাড় পড়িতে পড়িতে গৃহের বাহির হইয়া গেলেন।

তখন পাপাত্মা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"যা'ক্ বাঁচা গেল!" তৎপর সে গম্ভীরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিল,—"তোমারই নাম অমৃত?"

অমৃত—"হাঁ, আপনি কে?"

পাপাত্মা—"আমি পাপাত্মা।"

অমৃত—"পাপাত্মা! আপনি কি সেদিন সন্ন্যাসীকে রক্ষা করিয়াছিলেন?" এই বলিয়া সে শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

পাপাত্মা—"আমি রক্ষা করিতে পারি নাই, চেষ্টা করিয়াছিলাম মাত্র।"

অমৃত—"তাহাই যথেষ্ট। আপনি উপবেশন করুন।"

পাপাত্মা—"আমার সে অবসরও নাই। অমৃত, শুনিয়াছি এ দেশের রক্ষক তুমি! কিন্তু তোমার তদনুরূপ চেষ্টা কোথায়?"

অমৃত—"কেন, কি অসম্পূর্ণ দেখিলেন?"

পাপাত্মা—"অসম্পূর্ণ সব। এক বৃদ্ধার বাড়ী সেদিন লুঠ হইয়া গেল, তুমি তাহাতে কি করিয়াছিলে ?"

অমৃত—"আমি সে দিন তীর্থযাত্রা করিয়াছিলাম।"

পাপাত্মা—"তবেই সব হলো! না? তীর্থযাত্রা করিয়াছিলে, কিন্তু সেই সঙ্গে আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পার নাই কেন ?"

অমৃত—"আমি এমন হইবে জানিতে পারি নাই।"

পাপাত্মা—"জানিতে হয় না, বিপদ হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়। বিবাহের বরযাত্রীর ন্যায় তাহার আগে পাছে জয়ঢাক বাজিয়া লোককে জাগাইয়া দেয়না। প্রস্তুত থাকিতে হয়, সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হয়।"

অমৃত অধোবদনে বসিয়া রহিল।

পাপাত্মা একটু মৃদু হাসিয়া তেজোবন্তের দিকে চাহিয়া বলিল,—"আর এই যে তেজোবন্ত! জান্‌বিবিকে বন্দী করিতে গিয়াছিলে না। কিন্তু দোষ দিব কাহাকে ? তোমরা দুই দলই সমান! এক দল অত্যাচারের উপর প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে, আর তোমরাও আসুরিক বলকেই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন রূপে ধরিয়া বসিয়া আছ! প্রশংসার কথা তাহাদের পক্ষে না থাকিলেও, তোমাদেরও যে বেশী আছে জগতের ইতিহাস তাহা বিশ্বাস করিবে না।"

অমৃত জিজ্ঞাসা করিল—"কিন্তু এখনত আর আমাদিগকে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিলে চলিবে না, আত্মরক্ষার কোন উপায় করিতেই হইবে! আপনার মতে কোন্ পন্থা শ্রেষ্ঠতর ?"

পাপাত্মা—"তাহা আমি কি করিয়া বলিতে পারি! ইহা তোমাদের এক একটা জাতি লইয়া কথা,—বড়ই গুরুতর বিষয়! কোন্ ব্যক্তির প্রতিভা এমন সর্ব্বতোমুখী যে এই সঙ্কট সময়ে সে সাহস করিয়া নিজকে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর ভবিষ্যতের হিতাহিতের জন্য দায়ী করিতে পারে? তুমি

দেশের দশজনকে আহ্বান কর, তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ কর, ইহাতে তোমারও দায়িত্বের লাঘব হইবে, আর কোন উৎকৃষ্টতর পন্থা আবিষ্কৃত হওয়াও বিচিত্র নহে।”

অমৃত সন্তুষ্ট হইল, আশান্বিত হইল। তেজোবন্তের প্রত্যাগমনের পর পর্ব্বত-প্রমাণ ভাবনার বোঝা মাথায় লইয়া সে বড়ই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। এখন পাপাত্মা ও তেজোবন্তের উপর উদ্যোগের ভার অর্পণ করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

পাপাত্মার দৌত্যে অমৃতের বাড়ীতে হিন্দুগ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের এক সভা সম্মিলিত হইয়াছে। স্থান বাড়ীর অন্দর মহল, কেননা বিষয়টী অতি গোপনীয়, পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে। সভার আলোচ্য বিষয়, জান্‌বিবির প্রতাপ খর্ব্ব করিবার জন্য হিন্দুগ্রাম কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে। পন্থা মাত্র দুইটী, একটী প্রতিকুলাচরণ—স্রোতের বেগ রোধ করিয়া দাঁড়ান; অন্যটী তাহারই বেগ সহিতে সহিতে অনুকুলে চেষ্টা করিয়া, বস্তুর তাপবিকীরণের ন্যায়, তাহা হইতে পরপীড়নের ভাবটী বাহির করিয়া দেওয়া। ইহা স্থির করিতে বিশেষ বিজ্ঞতার আবশ্যক, তাই এই নিভৃত মন্ত্রণার আবশ্যক হইয়াছে।

যথাবিহিত পূর্ব্বকৃত্য সমাধা হইলে পর মন্ত্রণা আরম্ভ হইল। হৃদয়রাম জান্‌বিবির শ্বশুর, জীবনের চতুর্থ সোপানে পদার্পণ করিয়াও, তিনি এখন যম হইতে জান্‌বিবিকে বেশী ভয় করিয়া থাকেন। বৃদ্ধ মালার ঝুলিটী রাখিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আর্য্যসন্তানগণ, আজ আমরা এক ভীষণ রাক্ষসী মূর্ত্তির সম্মুখীন হইয়াছি! তাহার পাপবাসনা তাহাকে স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিয়াছে, তাহার দুরদৃষ্ট তাহার হৃদয়ে জিঘাংসার সৃষ্টি করিয়াছে, এবং তাহার অমিততেজে আজ এক বিধর্ম্মীজাতি উত্তেজিত! সে চাহে ধ্বংস, অপরের সর্ব্বনাশ! তাহার এই বিশ্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষার মূলে সর্ব্বসংহারপ্রিয়তা নিহিত রহিয়াছে। তাহার হিংসাপ্রণোদিত বক্রদৃষ্টি মাধ্যাহ্নের সূর্য্য বিমলিন করিতে চাহে, পূর্ণিমার চাঁদে কলঙ্ক মাখাইতে প্রয়াস পায়, তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ ধূলিকণায় পরিণত করিতে

ব্যগ্র হয়, যেহেতু সে তাহাদের সমান্তরালবর্ত্তী হইতে পারে না! তাহার পাপ-বাসনা আমাদের সত্বা, ধর্ম্ম, ধনসম্পত্তি, স্ত্রী পুত্র, সকলই গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে; আমরা কুলমান রক্ষার জন্য শঙ্কিত ও ভীত। সে দিন খরপ্রবাহিতা, উত্তাল তরঙ্গ মুখরিতা স্রোতস্বিনীবৎ সে এক কুল ধ্বংস করিয়া গিয়াছে, আমি অন্যকুলে দণ্ডায়মান! আমি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছি, আমি আপনাদের শরণাগত, আমাকে আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া দিন।"

অমনি তেজোবন্ত উঠিয়া বলিল—"উপায় আর কি? একমাত্র পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অগ্নির সহযোগে অগ্নি উৎপাদন করা। জান্‌বিবি মেয়ে মানুষ, মেয়ে মানুষের ভয়েই আমরা এতদূর কাতর হইয়াছি! হিন্দুর পুরুষ কি মুসলমানের স্ত্রীলোকেরও সমকক্ষ হইতে পারে না? তবে আর কেন, কোমর আটিয়া, হৃদয়ে সাহস ও বাহুতে বল সঞ্চার করিয়া অগ্রসর হও, আমরা আঘাতের প্রতিঘাত করিব। জান্‌বিবি একটী দেবমন্দির চূর্ণ করিলে আমরা তদুত্তরে দশটী মসজিদ ভাঙ্গিয়া দিব, একজন হিন্দুকে বলপূর্ব্বক জাতিচ্যুত করিলে, আমরা দশজন মুসলমানের সর্ব্বনাশ করিব। তাহা হইলেই পৃথিবী বুঝিতে পারিবে, হিন্দুর বাহুতে বলের অভাব নাই, তাহারা মনুষ্য নামের উপযুক্ত। নতুবা বেতস-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কি স্রোতের প্রতিকূলে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারা যাইবে? বরঞ্চ তাহা হইলে আমাদের নির্লিপ্ততাকে লোকে দুর্ব্বলতার অভিধানে ভূষিত করিবে,আর বাধা না পাইয়া জান্‌বিবির তেজ অদমনীয় হইবারই সম্ভাবনা। অতএব একমাত্র উপায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিকূলাচরণ; আমি তাহারই সমর্থন করি।"

অমৃতের বৃদ্ধা মাতা গোপনে এই পরামর্শ শুনিতেছিলেন, পুত্রবাৎসল্যে তাঁহার হৃদয় ভরপুর, অমর চলিয়া যাইবার পর বৃদ্ধা এ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া

একদিন আহারও করে নাই, সর্ব্বদা ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিতেন, দেহ জরাজীর্ণ। তিনি ভয় করিতেছিলেন, পাছে সকলে মিলিয়া আমিরের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দণ্ডায়মান হয়। যখন দেখিলেন যে তেজোবন্তের অভিমতই সকলে সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; হঠাৎ সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমৃত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"মা, তুমি এখানে কেন?"

মাতা—"বাবা, তোমরা পথ ভুলিয়া চলিয়াছ, তাই আজ আমাকে অস্থির হইতে হইয়াছে। তুমিও আমার যেমন ছেলে, অমরও তেমনই, সে তোমার ভাই ব্যতীত আর কিছুই নহে। তবে সে অজ্ঞ, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, কিন্তু তা বলিয়া কি এই সুযোগে তাহাকে আমার কোল হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত? তুমি শিক্ষিত হইয়াছ, তোমার উচিত যে তাহাকে হাত ধরিয়া তোমার সমতলে তুলিয়া লও, তাহার প্রতি কি প্রতিশোধের কল্পনাও করিতে আছে! আমার বড় সাধ যে তোমরা মিলিয়া মিশিয়া পরস্পর ভ্রাতৃভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়া যাও। তোমাদের উভয়কেই আমি বুকে ধরিয়া এই স্নেহপূর্ণ স্তন্য পান করাইয়া প্রতিপালন করিয়াছি, তোমাদিগকে ঈর্ষাপরায়ণ দেখিলে আমার হৃদয়ে বিষম বাজিয়া থাকে, একে অন্যকে আঘাত করিলে সে আঘাতে আমার হৃদয়তন্ত্রী একটী একটী করিয়া ছিঁড়িয়া যায়। অতএব একবার কলহ দ্বন্দ্ব ভুলিয়া ভ্রাতৃভাবে আমার কোলে বসিয়া মা বলিয়া ডাক, আমি জীবনের শেষ কালটা শান্তিতে কাটাইয়া যাই।"

অমনি পাপাত্মা উঠিয়া বলিল—"আমারও মা ঐ কথা। ঝগড়া বিবাদ ত এতকাল করা গেছে, কিন্তু কই তাহাতে ত শান্তি স্থাপিত হয় নাই! এ পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমানকে, এবং মুসলমান হিন্দুকে, সুযোগ পাইলেই নির্য্যাতন করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহাতে উভয়ের পার্থক্য

দিন দিন বাড়ে বই কমে নাই। তবে আর কেন, এখন এস, আমরা একবার ভিন্ন পথে চলিয়া দেখি। মুসলমান আমাদের ছোট ভাই, তাহাকে আমরা শিক্ষিত করিব, স্নেহ করিব, হাত ধরিয়া সৎপথে চালিত করিব, সে আঘাত করিলেও আমরা প্রত্যাঘাত করিব না। আমাদের ইতিহাস আছে, তাহার ছত্রে ছত্রে যেখানে হিন্দু মুসলমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কীর্ত্তিত রহিয়াছে, আমরা তাহা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া উপদেশ গ্রহণ করিব। অবশ্যই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইবে।”

তখন সকলেই এক বাক্যে এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। কিন্তু তেজোবন্ত ইহার সারবত্তা অনুভব করিতে পারিল না। তখনও তাহার হৃদয়ের ক্ষত শুকাইয়া যায় নাই। প্রতিশোধ-বাসনা চরিতার্থ করিতে যাইয়া সে অবমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল—সে অবমান ত সামান্য নহে! যাহাকে ধ্বংস করিবার মানসে উগ্র তেজে ধাবমান হইয়াছি, যদি হুছট্ খাইয়া আবার তাহাব পদতলেই আসিয়া পড়িতে হয়, তাহা হইলে ধৈর্য্যের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় না কি? প্রজ্বলিত হুতাশনে আঘাত করিলে যেমন তাহার লোল জিহ্বা উগ্রতর তেজে গগন স্পর্শ করিতে ধাবমান হয়, সেইরূপ তেজোবন্তের ক্রোধ-বহ্নিও অধিকতর প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সহিষ্ণুতার যে সীমার অভ্যন্তরে নীতি ও উপদেশের বাক্য লোককে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে, তেজোবন্ত সেই সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। কাজেই সভার সিদ্ধান্ত সে নীতি-বিগর্হিত ও হীনজনোচিত বলিয়া অনুভব করিল। অমনি তাকিয়ার উপর দণ্ডায়মান হইয়া সে সগর্ব্বে বলিতে আরম্ভ করিল,—“যাঁহারা দুর্ব্বলতাকে উদারতার আবরণে প্রচার করিতে চায়, লাঞ্ছনা ও পদাঘাতকে যাহারা পক্ক অন্নের ন্যায় অনায়াসে তৃপ্তির সহিত উদরস্থ করিতে পারে, মর্য্যাদাজ্ঞানবিবর্জ্জিত তাহাদের সাহচর্য্য তেজোবন্ত প্রার্থনা করে না।

এই অসির ন্যায় আমি আজ হইতে সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিতেছি।” এই বলিয়া অমৃত-প্রদত্ত অসি দ্বিখণ্ডিত করিয়া সে দ্রুতপদে তথা হইতে নির্গত হইয়া গেল।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সমাজের অবস্থা।

দ্বিপ্রহর বেলা; গ্রীষ্মের সূর্য্য মধ্যাহ্ন-গগন হইতে লম্বমান কিরণসমূহে পৃথিবী তাপিত করিতেছিল। হুতাশনবৎ তপ্ত হাওয়া ধূলিকণায় গগন-মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া যেন প্রকৃতির সঙ্গে ধূলি খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছিল; চারিদিক কেবল ধু-ধু করিতেছে, এমন সময় বহরের সদর রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া একটী বিংশবর্ষীয়া স্ত্রীলোক রোদন করিতেছিল। স্বেদজলে তাহার সর্ব্বশরীর আদ্র, সঙ্গে একটী ছোটরকমের ঠেলা-গাড়ী, তাহাতে অনাহার-ক্লিষ্ট, জীর্ণ, শীর্ণ এক বিকলাঙ্গ পুরুষ বসিয়া অতি কদর্য্য ভাষায় স্ত্রীলোককে গালি দিতেছিল। নিঃসহায়া তাহাই শুনিতে শুনিতে অধোবদনে রোদন করিতেছিল।

নির্ম্মল শিশির সম্পাতে পৃথিবীর সকল জিনিষই সিক্ত হয় না, রমণী কাঁদিতেছিল, একে একে অনেকেই সেই পথ দিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু কেহ তাহার প্রতি সহানুভূতিসূচক দৃষ্টিপাতও করিল না। প্রথমে গেল একজন হিন্দু, তাহার অনেক কাজ, নিজের ভাবনা ভাবিয়াই সে অস্থির, একবার শুধু উদাসপূর্ণ-দৃষ্টিতে সেই দৃশ্যের প্রতি চাহিয়া সে পথ বাহিয়া চলিয়া গেল। তারপর আসিল একজন মুসলমান, সে নিকটে আসিয়া প্রশ্ন করিয়া স্ত্রীলোকটীর দুঃখের কথা শুনিল, অবশেষে, "এই বয়সে গতর খাটাইয়া খাইতে পার না, আতুর লইয়া এইরূপে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া

লাভ কি ? যেমন বোকা, তার উপযুক্ত শাস্তি।" এই বলিয়া সে হৃষ্টচিত্তে নিজের গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। অবশেষে আসিলেন একজন বৃদ্ধ, তিনি নিকটে আসিয়া স্নেহব্যঞ্জকস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, এখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছ কেন ?"

অমনি গাড়ীতে উপবিষ্ট পুরুষ রুক্ষস্বরে বলিল—"মাগী আবার কেমন নেকী সাজিয়াছে দেখ!"

বৃদ্ধ—"বাবা, কি হইয়াছে ?"

আতুর—"দেখ না, মাগী আমার গাড়ীর চাকাটা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।"

দুর্ব্বলতা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে, পারের বাঁধ পাকা হইলেও অদমনীয় বেগের নিকট তাহা অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে না। অবলার আর দোষ কি ? তাঁহার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে আরম্ভ করিল—"দেখুন, ইনি আমার স্বামী। আমার নিতান্ত দুরদৃষ্ট, তাই তিনি এই কষ্ট ভুগিতেছেন, নতুবা ইঁহার ভাই, ভগ্নী, বাপ, মা, সকলেই আছে, কিন্তু কেহই ইঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না। আমি এই গাড়ী লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি, ভিক্ষা করি, যাহা পাই তাহাতে কোন মতে আমাদের চলিয়া যাইতেছে ; তথাপি আমার অপরাধের সীমা নাই, মুহুর্ত্তে মুহুর্ত্তে আমাকে গালি শুনিতে হয়, প্রহার খাইতে হয়। আজ গাড়ী টানিবার সময় হঠাৎ চাকাটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আচ্ছা, বলুন ত, তাহাতে আমার অপরাধ কি ?"

শুনিয়া আতুর আরও কর্কশস্বরে বলিল—"মাগী, তুই ইচ্ছা করিয়াই চাকাটা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিস্, আমাকে কোনমতে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই এখন তোর্ উদ্দেশ্য, তাহা হইলেই তোর আবার নিকা করিবার সুবিধা হয়! যা হারামজাদী, তোর্ যেখানে ইচ্ছা! আমার সম্মুখ হইতে দূর হ!" এই বলিয়া সে হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা রমণীকে আঘাত করিল।

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"আঃ! কর কি? ছিঃ! মেয়ে মানুষের গায়ে কি হাত তুলিতে আছে?"

আতুর—"তবে মাগী আমার চাকাটা সারিয়া দেউক এখন।"

বৃদ্ধ—"বাবা, আমি তোমার গাড়ী মেরামত করাইয়া দিতেছি।" তৎপর তিনি রমণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"মা, তোমার আচরণে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমি তোমার স্বামীর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিলাম।"

শুনিয়া রমণী কান্না ভুলিয়া গেল; অত্যধিক আহ্লাদের সহিত সে বৃদ্ধের নিকট নতজানু হইয়া বসিয়া বলিল—"তবে ত আপনি আমার পিতৃতুল্য কাজ করিলেন; এ অনুগ্রহের জন্য আমি জীবন পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতেও প্রস্তুত আছি!"

বৃদ্ধ—"তবে চল মা, আমার সহিত। আমার আশ্রয়ে থাকিলে তোমার সর্ব্বদুঃখ দূরীভূত হইবে।"

বলা বাহুল্য যে ইনিই এলেমের আশ্রয়দাতা বৃদ্ধ। বৃদ্ধ কুটীরে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে এলেমকে ডাকিয়া বলিলেন—"মা, এই গ্রহণ কর! আজ হইতে ইহারা দুইজন আমাদের পরিবারভুক্ত হইল। তোমার উপর ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমি অর্পণ করিলাম, দেখিও ইহারা যেন কোন প্রকারে কষ্ট না পায়।" এই বলিয়া তিনি খঞ্জ ও তাহার পত্নীকে এলেমের নিকট পরিচিত করাইয়া দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সুখার দীক্ষাগ্রহণ।

আহার-সমাপনান্তে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি স্বামীর হাতের কাছে গুছাইয়া রাখিয়া রমণী নির্জ্জনে আসিয়া এলেমের নিকট উপবেশন করিল। এলেম জিজ্ঞাসা করিল—"বাছা, তোমার নাম কি?"

রমণী—"সুখা।"

এলেম—"আচ্ছা সুখা, তোমার আর কে আছে?"

সুখা—"আছে সবই, কিন্তু আমার পক্ষে কেহই নাই।"

এলেম—"কেন?"

সুখা—"যেহেতু আমার স্বামী অন্ধ, আতুর ও খঞ্জ, সে অন্যকে পোষণ করিতে পারে না, কাজেই তাহাকে পোষণ করিবার লোক জুটিবে কেন?"

এলেম—"তুমি জুটিলে যে?"

সুখা—"আমার স্বামী যে,—সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু আমি পরিলাম না।"

এলেম—"ও বুঝিয়াছি, তোমার স্বামী বোধ হয় তোমাকে খুব ভাল বাসে, তাই সেই বাঁধন কাটিয়া যাইতে পার নাই!"

সুখা—"ভালবাসা কাহাকে বলে তাহা আমাদের গরীবের মেয়ের বুঝিবার অতটা ক্ষমতা নাই। তবে অশ্রাব্য গালি, নিষ্ঠুর প্রহার, কঠোরতা, নির্ম্মমতা, প্রভৃতি যদি ভালবাসার নিদর্শন হয়, তবে আমি তাহার বেশ আদরিণী সোহাগিনী!"

এলেম—"তোমার স্বামী তোমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করে?"

সুখা—"এইরূপ ত করেই, আরও করে।"

এলেম—"তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওনা কেন?"

সুখা—"তাহাও ত ইচ্ছা হয় না?"

এলেম দেখিল সুখা নিজের অজ্ঞাতে বেশ পতি-পরায়ণা হইয়া উঠিয়াছে! তবে বাহ্যিক কতকগুলি আবর্জ্জনা আছে, তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। প্রকাশ্যে বলিল—"ছি! তুমি পতি নিন্দা কর! তোমার স্বামী অন্যের নিকট অন্ধ, খঞ্জ যাহাই হউক, তোমার নিকট সে অপার্থিব জিনিষ। সে অন্ধ হইলেও তুমি স্বর্গের জ্যোতিঃ তাহার মধ্য দিয়া দেখিতে পাইবে। সে তোমার—তোমার হৃদয়ের বল, প্রাণের ভক্তি,—জীবনের অবলম্বন, দুঃখের সান্ত্বনা, চরিত্রের মেরুদণ্ড। প্রকৃতির যাহা জীবনী শক্তি, পরমেশ্বরের যাহা দেবত্ব, জীবগণের যাহা চেতনা শক্তি, সে তোমার নিকট সেই সকল স্থান অধিকার করিয়া আছে। তুমি তাহার নিকট মূক অথচ কষ্টসহিষ্ণু, প্রেমময়ী অথচ শিষ্যা, জ্ঞানবতী অথচ অবনত, নতুবা তাহার শাসনে তোমার চক্ষে জল আসিলে তোমার এই কঠোর সাধনা পবিত্র হইল কই?" সুখা অনেকক্ষণ এলেমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে গদগদকণ্ঠে বলিল—"আজ হইতে আমি আপনার দাসী হইলাম। আমাকে এখন কি করিতে হইবে?"

এলেম—"তোমার স্বামীকে মানুষ করিতে চেষ্টা কর, আমি সাহায্য করিব।"

সুখা—"সম্ভব কি?"

এলেম—"নিশ্চয়ই সম্ভব।" এস, আজ হইতে তোমাকে আমার নিকট শিখিতে হইবে।" এই বলিয়া সে সুখাকে আবশ্যকীয় উপদেশ দিয়া বিদায় করিল।

এ দিকে স্বামী মহাশয় ঘরে বসিয়া মনে মনে সুখার মুণ্ডপাত করিতেছিল। সুখার অপরাধ যে এক ডাকে আসিয়া সে তাহার নিকট হাজির হয় নাই। স্বামী মহাশয়ের যে বিশেষ কোন দরকার ছিল এমন নহে, কারণ পূর্ব্বেই সুখা আবশ্যকীয় জিনিসগুলি তাহার হাতের কাছে গুছাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু স্বামী মহাশয়ের হঠাৎ এক খেয়াল চাপিল, সে দুইবার উঠিয়া "সুখা" "সুখা" করিয়া চীৎকার করিল, উত্তর না পাইয়া, "এই দেখ্ মাগী আমাকে একেলা ফেলিয়া আবার কোথায় হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছে! আজ আসিলে একবার দেখাইব।" এই বলিয়া অগ্নি-অবতার হইয়া সে সুখার অপেক্ষায় বসিয়াছিল। এমন সময় এলেমের নিকট হইতে বিদায় হইয়া সুখা সেই গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল। পদশব্দ শুনিয়াই স্বামী মহাশয় উগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে?"

সুখা—"আমি।"

স্বামী—"হারামজাদী, তুই মন বাঁধিয়া এক দণ্ড ঘরে থাকিতে পারিলি না! আমি ডাকিতে ডাকিতে হয়রান হইয়া গিয়াছি, আর তুই স্ফূর্ত্তি করিয়া পাড়া বেড়াইয়া এলি! যা, তোকে আর আমার আবশ্যক নেই! তোর যা'র সঙ্গে খুসী বাহির হইয়া যা।" এই বলিয়া সে সুখার উদ্দেশে হস্তস্থিত যষ্টি ছুড়িয়া মারিল।

অন্যদিন হইলে ইহাতে সুখা বিচলিত হইত, কিন্তু আজ তাহার দৃষ্টি সুদূরন্যস্ত, এক স্বর্গীয় সুরে তাহার হৃদয় বাঁধা। সে একটু পাশ কাটিয়া ধীরস্বরে বলিল—"আমি ত আর অকাজে যাই নাই, বিকাল বেলা খাবে কি? ঘরে কি কিছু আছে? ঐ যে মেয়েটী আমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছে তাহার নিকট হইতে কিছু চাহিয়া লইয়া আসিলাম। আর জান, ঐ মেয়েটী নাকি বড় রোজা, অনেক দাওয়াই জানে! সে বলিল সে তোমাকে চিকিৎসা করিয়া ভাল করিয়া দিবে।"

চিররোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ইহা কম সান্ত্বনার কথা নহে, সুখার স্বামী আগ্রহের সহিত বলিল—"তবে তাহাকে তুই সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলি না কেন ?"

সুখা—"বা ! সে ত আমার সঙ্গেই আসিয়াছিল, কিন্তু তুমি যে লাঠি ছুড়িয়া মারিলে, তাহা দেখিয়া সে আর তোমার নিকট আসিতে সাহস করিল না।"

স্বামী—"তবু, তুই তাহাকে কেন যাইতে দিলি, আমার সর্ব্বনাশ করাই তোর ইচ্ছা।"

সুখা—"আমি কি করিব ? আমি কত মিনতি করিলাম, কিন্তু কিছুতেই সে ফিরিল না। তোমার যেরূপ রাগ, তাহা দেখিয়া সে আরও কত কি বলিয়া গেল।"

স্বামী—"কি ?"

সুখা—"কাল হইতে সে আর আমাদিগের খরচ চালাইতে পারিবে না, সে ভারি রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখন হইতে আবার আমাদিগকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইবে।"

স্বামী—"যা, এখনই যাইয়া তাহাকে ফিরাইয়া আন্।"

সুখা—"আমি পারিব না।" এই বলিয়া সে গৃহান্তরে যাইবার ভাণ করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

স্বামী—"সুখা, সুখা, ও সুখা, বলি এ সময়ে তুই রাগ করিলি নাকি ! হায় ! হায় রে ! আমার সর্ব্বনাশ হইল ! যা, তুই এখনই যাইয়া তাহাকে ফিরাইয়া আন্, তোর্ অন্য কাজে যাইয়া কাজ নাই। বলি এলি ! দেখত, মাগী আমাকে কেমন জ্বালাইতেছে ! আমি মরি, তবেই যেন ওর সব সাধ মিটে ! ও সুখা, তোর্ পায়ে পড়ি, এইবার আমাকে রক্ষা কর।"

সুখা—"এমন চেঁচাও কেন? এই যে আমি তাহার নিকট হইতে আসিলাম।"

স্বামী—"গিয়াছিলি? আহা! তবে ত তুই বেশ ভাল মানুষের বেটী। তারপর, তারপর সে কি বলিল?"

সুখা—"সে বলিল, যদি তুমি আর কখনও রাগ না কর তবে তোমাকে সে চিকিৎসা করিতে পারিবে!"

স্বামী—"তা আমি খুব পারিব। আজ হইতে যদি আমি কখনও রাগ করি, তবে তোর্ মাথা খাই। তুই তাহাকে আসিতে বলিস্।"

অবশেষে সুখা গৃহকার্য্যে রত হইল; কিন্তু মনে মনে সে নিতান্ত অসুখী হইল। ভাবিল—"স্বামীর সঙ্গে প্রতিদিন আমি এইরূপে প্রতারণা করিতে পারিব না, তা আমার অদৃষ্টে যাহাই থাক।"

পরদিন স্বামী সম্বন্ধে সুখা এলেমকে যাহা বলিল তাহা সকলই তাহার কল্পনা প্রসূত। এলেম সুখাকে চিনিয়াছিল, তাই তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কেবল বলিল—"তা, বেশ।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

লাঞ্ছিতা—মাতা ও স্ত্রী।

রাজার ছেলে ফকির দীন ভিখারীর ন্যায় পিতা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিল। বাহিরে আসিয়া সে দেখিল কে যেন হঠাৎ তাহাকে চক্ষু বাঁধিয়া পৃথিবীর মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু যাহার শক্তি আছে সে উজান বাহিয়াও চলিতে পারে; বিশেষতঃ এই বিপদের সময়ে লাঞ্ছিতার মত মাতা তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। জগতে যাহার মাথা রাখিবার স্থান নাই, তাহারই থাকিবার স্থান অনেক। ফকির দেখিয়া শুনিয়া বহরের প্রান্তভাগে এক ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় মাতাকে লইয়া বাস করিতে লাগিল। সমভূমি হইতে ঈষৎ উন্নত একটী মৃত্তিকা স্তূপ, তাহার এক পার্শ্ব দিয়া একটী তন্বী-সরিৎ নিঝুম বহিয়া যাইতেছে, অপর দুই পার্শ্বে সবুজ মাঠ, তাহারই এক অংশ অধিকৃত করিয়া স্তূপের চতুর্থ দিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিবিধ ফলবান বৃক্ষের উদ্যান। এই উদ্যানের সন্নিকটে মৃত্তিকা-স্তূপের উপর লাঞ্ছিতার বাস-গৃহ স্থাপিত হইল। চৌচির বংশদণ্ড-গঠিত বেষ্টনী দ্বারা সমতল ভূমির কতকটা ঘিরিয়া তাহা নিজস্ব করিয়া লইতে লইতে ফকির সাহায্যকারী মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, আমাদের এখন চলিবে কি ক'রে?

লাঞ্ছিতা—"কেন বাবা, জগতের এই অনন্ত-কোটী প্রাণী যদি একমাত্র প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়াই জীবনধারণ করিতে পারে, তবে আমাদেরও মাতাপুত্রে অনায়াসে চলিয়া যাইবে। ঐ দেখ, মাঠ অপর্য্যাপ্ত শাক্-সবজি-সমন্বিত, লতা-বল্লরী শ্যামল পত্রাচ্ছাদিত, স্রোতস্বিনী জলপূর্ণা, বৃক্ষে বৃক্ষে

ফল সুশোভিত! আমাদের পক্ষে ইহাই ঢের। কিন্তু যদি ইহাতেও আমাদের অভাব রহিয়া যায়, তুমি দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া যাহা পার সংগ্রহ করিয়া আনিও, দিনান্তে তাহাই মাতাপুত্রে অমৃতবৎ আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইব।”

ফকির আর কিছু বলিল না, নিবিষ্টমনে নিজের কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

এক দিন বেলা প্রায় দেড়প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, ফকির তখনও ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই; লাঞ্ছিতা গৃহকার্য্য সমাপনান্তে আসিয়া সেই নির্জ্জন গৃহমধ্যে দাঁড়াইল। মানব স্বভাবতঃ দুঃখী, কিন্তু আরও দুঃখিত হয়, যখন সে গত সুখের সঙ্গে বর্ত্তমান দুরবস্থার তুলনা করিয়া থাকে। লাঞ্ছিতা একবারমাত্র স্থিরদৃষ্টিতে গৃহের চতুর্দ্দিক দেখিয়া লইল, অমনি চিন্তাশক্তি মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাকে রাজপ্রাসাদের সেই চিরপরিচিত কক্ষে লইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল,—“ঐ গৃহ, ঐ বিচিত্র সাজ-সজ্জা একদিন আমার ছিল, এতদিন আমি তথায় রাজত্ব করিয়া আসিয়াছি! আমার ঐশ্বর্য্য ছিল, দাসদাসী, আজ্ঞাবহ ভৃত্য সকলই ছিল, কিন্তু এখন সব গেছে! যাক্! সাজসজ্জা ও দাসদাসী সুখসাগরের পদ্মযোনী নহে, ও সব না থাকাই ভাল। যাঁহার জন্য ঐশ্বর্য্য, যাঁহার সন্তোষার্থে আমার ধনে স্পৃহা, বিলাসিতায় সুখ, সৌন্দর্য্যে আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার আদেশে ভোগবিরত হওয়াত দূরের কথা, জীবনে শতবার মরিয়াও বাসনা অতৃপ্ত রহিয়া যায়। কিন্তু সব ত ভোলা যায় না। ঐ আসনখানা—যেখানে তিনি আসিয়া দাসীর তুষ্টিসাধনের জন্য মধ্যে মধ্যে উপবেশন করিতেন,—এ জগতে এখন কে আছে যে আমার সর্ব্বস্ব বিনিময়েও তাহা আমাকে আনিয়া দিতে পারে! একখানা ক্ষুদ্র আসন বই ত নয়? আমার আনিতে বাসনা হইয়াছিল, কিন্তু জীবন দিলে না। না দিক,

তাহা নাই বা হইল। এত গিয়াছে আর ইহাত সামান্য। কিন্তু প্রভু, কৃপাপূর্ব্বক আসিয়া তুমি ঐ সামান্য আসনে উপবেশন করতঃ মধ্যে মধ্যে দাসীর অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে, আর আজ হইতে তুমি এই হৃদয়াসনে চির অধিষ্ঠিত। দাসী ঐ স্থানেই অনুক্ষণ তোমার চরণে উপহার প্রদান করিয়া ধন্য হইবে। তুমি যাহাই হও, যদি আমি সতী হই, তবে তোমাকে এই আসনে একদিন বসিতে হইবেই।"

এমন সময় ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর ফকির আসিয়া ভিক্ষালব্ধ বস্তু লাঞ্ছিতার পদপ্রান্তে রাখিয়া দিয়া অবসন্ন দেহে মেজের উপর বসিয়া পড়িল। লাঞ্ছিতা সস্নেহে তাহার শরীরে হস্ত সঞ্চারণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বাবা, বড় অবসন্ন হইয়াছ নয়?"

ফকির—"মা, আর আমি ভিক্ষা করিতে বাহির হইব না।"

লাঞ্ছিতা—"কেন বাবা?"

ফকির—"লোকের দ্বারে দ্বারে যাচ্ঞা করিয়া বেড়ান যেমন অপমান-জনক, তেমনই হেয়। তুমি বলিয়াছিলে স্বচ্ছন্দ-বন-জাত শাকেও আমাদের বেশ চলিবে।"

লাঞ্ছিতা—"তা বাবা, আমরা ত আর ভিখারীদের মত শুধু উদরপূর্ত্তি মানসেই এই বৃত্তি অবলম্বন করি নাই, আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য আছে। সন্ন্যাসী ফকিরের ভিক্ষা করিতে অপমান কি?"

ফকির—"না, মা, আমার বড় লজ্জা করে।"

লাঞ্ছিতা—"ইহা তোমার অভিমানের নেশামাত্র, কখনও প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ফকিরের পরীক্ষা।

"ভিক্ষা দেও গো, পুরবাসি, গৃহে উপবাসী মাতার জন্য স্নেহে দ্বার খুলিয়া বা প্রাণ খুলিয়া যাহা দিবে তাহাই আমার স্পর্শমানিক" বহরের সদর রাস্তা দিয়া ফকির ডাকিয়া ডাকিয়া যাইতেছিল। তখন লাবণ্যময়ী উষারাণী স্নিগ্ধ স্পর্শে আরষ্ট ধরণীর দেহে কাঞ্চন আভা বিকসিত করিয়া ত্রস্তপদে সরিয়া পরিতেছিল। উদীয়মান সূর্য্যের প্রথম কিরণের সহিত জগতের প্রাণ ফিরিয়া আসিলেও বহরে তখনও প্রাণের স্পন্দন লক্ষিত হইতেছিল না। বাহিরের আঁধার ঘুচিয়া গেলেও, বহরের প্রতি ঘরে রুদ্ধ দ্বারের অভ্যন্তরে নিবিড় আঁধাররাশি তখনও রজনীর অবসানবার্ত্তা ঘোষিত করে নাই। যাহারা জাগিয়াছিল তাহারাও মুদিত চক্ষু, যাহারা তখনও সুপ্ত, তাহারা স্বপ্নে দেখিতেছিল যে এক অতি সঙ্কীর্ণ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া তাহারা স্বর্গের দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছে। অতএব ফকিরের আহ্বানে কেহই সাড়া দিল না; শৌর্য্যবীর্য্যের শ্রেষ্ঠভূমি বহর কমনীয়তার আবরণে নিজকে বিকাশ করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু তথাপি ফকির চলিয়াছিল, তাহার ক্লেশেও অবসাদ নাই, অকৃতকার্য্যতায়ও নিরুৎসাহ আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে পারিতেছিল না। যাঁহারা দীর্ঘ-পথের যাত্রী, তাঁহাদের উদ্যমশীলতা এইরূপই অপরাজেয়।

যেই স্থানে পথটীও প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, পল্লীটীও বড় নির্জ্জন, সেইস্থানে বহরের শ্রেষ্ঠ নায়িকা রূপরাশির ব্যবসায় করিবার জন্য ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছিল। তখন বয়স তাহার ষোড়শ বৎসর,

সৌন্দর্য্যেও সে অতুলনীয়া! বহরে সেই সৌন্দর্য্য একটা প্রবাদ বাক্যের ন্যায় চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পরিয়াছিল, এবং অমৃতভ্রমে সেই রূপগরল উপভোগ করিবার জন্য তখন উন্মত্তপ্রায় বহর রজতকাঞ্চনের মোট বহিয়া আনিয়া তাহার পদতলে বিলাসিতার মূল্য ঢালিয়া দিতেছিল। তথাপি এই রমণী কেন যে দীনভিখারী ফকিরের প্রতি তাহার লালসাজড়িত দৃষ্টি সংযত করিতে পারে নাই, তাহা বর্ত্তমান যুগে এই দেশে আমি কি প্রকারে বুঝাইব! যে দেশের পুরুষগণ নাকিসুরে কথা বলিয়া রমণীর মন ভুলাইতে প্রয়াস পায়, যাহাদের রমণীজনসুলভ হাবভাবই পুরুষত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক, তাহারা এই অসম্ভব ব্যাপারের সারতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে কি? তেজোবীর্য্যের আভায় উদ্ভাষিত ফকিরের সেই দিব্য গৌরকান্তি, ভিখারীর বেশের অভ্যন্তরে থাকিয়াও যে এই শ্রেষ্ঠ বিলাসিনীর হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ইহা বর্ত্তমানযুগের এক জটীলতাপূর্ণ সমস্যা, আমি পুরুষ বলিয়া তাহার সমাধান করিতে পারিলাম না। ফকির প্রতিদিন এমনি সময়ে এই পথ দিয়া চলিয়া যায়, তাহার আহ্বান অভ্যস্ত শ্রোতার নিকট বিশেষত্ববিহীন হইয়া পরিয়াছিল, কিন্তু যে কারণে কোকিলের পঞ্চমরাগ চিরনূতন, সতত প্রাণস্পর্শী সেইরূপ কোন অজ্ঞাত কারণে ফকিরের এই আহ্বানও এই বিলাসিনীর কর্ণে এক অপূর্ব্ব প্রীতির মাদকতা ঢালিয়া দিয়া তাহাকে উন্মত্ত করিয়া যাইত। রমণী সারাদিন ইহারই আলোচনা করিত, নিশীথে ইহারই প্রতিক্ষায় থাকিত, এবং প্রভাতেও শ্রবণমাত্র বিলাসিতার ক্রোড় হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া জানালার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইত। ফকিরকে প্রলোভিত করিতেও সে বিরত হয় নাই। নিপুণ ব্যাধ সে, তাহার কলাকৌশলে মুগ্ধ হইয়া অনেক উন্নত-মস্তক তাহার নিকট অবনত হইয়াছিল, কিন্তু এই বিদ্যা ফকিরের প্রতি কার্য্যকরী হয় নাই।

যেখানে পথটী ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার দুই দিকে বিবিধ পুষ্পিত ও ফলবান বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়াছিল। প্রভাত সৌন্দর্য্যে সেই স্থানের রমণীয়তা উর্ব্বর কল্পনাকেও পরাজিত করিয়াছিল। যামিনীর শিশির—স্নেহে প্রস্ফুটিত ফুলগুলি সারাটা রজনী অবিশ্রান্ত সৌরভ বিতরণ করিয়া ঝির ঝির বাতাসে ভূতল ছাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের অত্যধিক বর্ষণে সমস্ত পথটী কুসুমাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ফলবান বৃক্ষের শাখায় শাখায় শত শত মধুরকণ্ঠ পক্ষী পত্রের আচ্ছাদনে রজনী অতিবাহিত করিয়া সবেমাত্র প্রথম কলরবে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের অবিরাম আহ্বান শব্দ প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যে আঘাত করিয়া তাহাকে গভীরতর করিয়া তুলিয়াছিল। দূরে কাল মসীরেখাবৎ একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বত, পার্শ্বে একটী খরপ্রবাহিনী গিরি-নির্ঝরিণী, তাহারই অনতিদূরে সবুজ পত্রাবৃত উদ্যানের অভ্যন্তরে নগরের বিলাসগৃহ। যে উদ্দেশ্যে মানব-সমাজে বিলাসিতা আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছে, তাহার উপযোগী করিয়াই এই গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার বাহিরের প্রাকৃতিক দৃশ্য, ভিতরের কৃত্রিমতাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। আজ এই সকল চিত্তহারী দৃশ্যের মধ্যে, অতি প্রভাতকালে, ফকির সর্ব্বসৌন্দর্য্যের জীবন্তমূর্ত্তি সেই শ্রেষ্ঠ বিলাসিনীর দর্শন লাভ করিল।

তখন এই নায়িকা ব্যর্থ অভিসারে রজনী অতিবাহিত করিয়া নিজ আবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিল। তাহার ব্যবসায়ের একমাত্র সম্বল তাহার ক্ষণস্থায়ী যৌবনটুকু, তাহার একটা রজনী বিফলে অতিবাহিত করিয়া শূন্য প্রাণে পথ বাহিয়া চলিয়াছিল, এমন সময় ফকির তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইল। ফকির ডাকিতেছিল—"ভিক্ষা দেও গো—" শ্রবণমাত্র নায়িকা অগ্রবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ভিখারি, তুমি কি চাও?"

ফকির—"যে যাহা দেয় তাহাই।"

নায়িকা—"তবে আমার গৃহে এস, ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি, তোমার সেবায় তাহা মুক্ত করিয়া দিব।"

তখন সবেমাত্র প্রথম সূর্য্যরশ্মি, তরুশির অতিক্রম করিয়া তরুমূলে আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই কাঞ্চন-আভা অঙ্গে মাখিয়া এককালে শত শত শিশির বিন্দু পত্রে পত্রে ঝল্‌সিয়া উঠিল, পল্লবান্তরালে লুক্কায়িত একটা পিক পঞ্চম স্বরে ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, প্রভাত সমীরণ পুষ্পভারাবনত শাখাগুলি দোলাইয়া শত শত কুসুম বৃষ্টি করিয়া সরিয়া পড়িল, তটিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় ভূষিত হইয়া সহস্রকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। এইরূপ দৃশ্যময়ী প্রকৃতির ক্রোড়ে দাঁড়াইয়া নায়িকা তাহার সবগুলি রূপ সর্ব্বতো-ভাবে উন্মুক্ত করিয়াও দেখিতে পাইল ফকিরের হৃদয়ে তাহাতে একটীও তরঙ্গ উত্থিত হয় নাই, তাহার প্রখর দৃষ্টি এক অতি কঠোর আবরণে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার সম্মোহন হাস্য সেই উদাসীনের গাম্ভীর্য্য ভেদ করিয়া তাহাতে প্রতিফলিত হইল না! কিন্তু এই অনভ্যস্ত অপমানে রমণী একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার স্খলিত বসনাঞ্চল ধুলায় বিলুণ্ঠিত করিতে করিতে, লীলায়িত হস্ত দুটী প্রসারিত করিয়া সে ফকিরকে গ্রাস করিতে ধাবমান হইল। সে তীরবেগে আসিতেছিল, ফকির পাশ কাটিয়া কোনমতে তাহার কবল হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া দাঁড়াইল। রমণী যখন পুনরায় ফকিরকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইবে, অমনি সেইখানে এক পক্ককেশ বৃদ্ধ আসিয়া তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। রমণী জিভ্ কাটিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে নিজকে সংযত করিয়া লইল; লজ্জার আগুনে তাহার কামনার কণাটীও পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া গেল। সে আর সেই স্থানে দাঁড়াইতে পারিল না, ক্ষিপ্রতরবেগে নিজ আবাসের দিকে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

ফকির কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়—স্বেদজলে তাহার সর্ব্বশরীর সিক্ত হইয়া

গিয়াছিল। বৃদ্ধ অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিল—"সন্তুষ্ট হইয়াছি, ভাই, তোমার এই চিত্তসংযম আমার স্থায় বৃদ্ধেরও অনুকরণীয়। এই নদীর বাঁকে বাঁকে চলিয়া যাও, যেখানে কাননাভ্যন্তরে প্রথম ঘরটী দেখিতে পাইবে, তাহার রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিও, তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পুরস্কার।

বহরের সেই নির্জ্জন প্রান্তভাগে কাননের অভ্যন্তরে এক ভগ্নসৌধ আশ্রয় করিয়া ফকিরের বন্ধুগণ পরামর্শ করিতেছিল—তাহারা ফকির ও এলেমকে খুজিয়া বাহির করিবে। ফকিরের সঙ্গে ত তাহারা আশৈশব বন্ধুত্বসূত্রেই আবদ্ধ ছিল, আর আজ এলেমের জন্যও তাহাদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। উভয়ের অচিন্তনীয় নির্ব্বাসনে তাহাদের প্রাণে যে আঘাত আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের পূর্ব্বপ্রীতি আরও দৃঢ়রূপে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহারা অধিকতর ব্যাকুল হইয়াছিল এলেমের জন্য, কারণ তাহারা এলেমকে ভালবাসিত ইহাই ছিল অহাদের দৃঢ়বিশ্বাস। মানবজীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন হৃদয়বৃত্তির আধিপত্য সূচিত হইয়া থাকে,—শিশু পৃথিবীতে স্নেহ ভিন্ন আর কিছুই বুঝিতে পারে না, যুবক সর্ব্বোপরি প্রেমের প্রাধান্য প্রদান করিয়া থাকে, আর বৃদ্ধ একমাত্র ভক্তিকেই অবলম্বন করিয়া শেষের হিসাব নিকাসটা চুকাইতে যত্নপর হয়। ফকিরের বন্ধুগণও তাই এলেমের জন্য অত্যধিক ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, এই ব্যাকুলতা তাহাদের যৌবন-সুলভ হৃদয় চাঞ্চল্যমাত্র। অবশ্যই এলেম স্বয়ং উপযাচিকা হইয়া আসিয়া তাহাদিগকে প্রলোভিত করে নাই—তাহার সেরূপ স্বভাবও ছিল না। কিন্তু সৌন্দর্য্যের মোহিনীশক্তি এমনই চমৎকার যে, যে দেখে সে ত মুগ্ধ হয়ই, আর যে না দেখে, সেও শুধু শুনিয়াই উন্মত্ত হইয়া যায়। উপাখ্যানের রাজকন্যার রূপের কথা শুনিয়া যেমন শক্ত অশক্ত সকলেই একবারমাত্র অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে ধাবমান হয়,

ইহারাও প্রায় সেইরূপ সঙ্কল্প লইয়া এই নিভৃত মন্ত্রণায় আসিয়া সমবেত হইয়াছিল। "এলেমকে খুজিয়া বাহির করিতে হইবে" এই কথা মনে উদয় হওয়ামাত্রই একে অন্যের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া তাহারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীতাসহকারে এলেমের কাল্পনিক রূপ-বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইল :—

"এলেম সুন্দরী ও সুগঠিতা, জগতে এমনটী আমি আর দেখিতে পাইব না।" যে এই কথা বলিয়া এলেমের প্রতি নিজের আসক্তি ব্যক্ত করিল, এলেম সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা এইখানেই সীমাবদ্ধ। অন্যান্য সকলে একে একে বলিতেছিল :—

"এলেমের চক্ষু জগতের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়া থাকিলেও, সারাটা জগতই যেন তাহাতে স্বেচ্ছায় প্রতিফলিত হইবার জন্য সমুৎসুক হইয়া রহিয়াছে!"

"আমার কিন্তু মনে হয় এলেমের কুঞ্চিত অলকাবলীতে যেন জন্ম-জন্মান্তরের বাসনাগুলি একত্র জড়ীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছে।"

"আর তাহার যুগ্ম ভ্রূ গঠন-ভঙ্গিমায় ইন্দ্রধনুকেও পরাজিত করে নাই কি?"

"হায়! যদি তাহাকে আর একটীবার মাত্র দেখিতে পাই......"

এমন সময়ে ফকির আসিয়া সেই গৃহের রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিল। ভয়ে সকলের মুখ শুকাইয়া গেলেও একজন একটু অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিয়া দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া ফকিরকে দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহার আগমনে সকলেই নিতান্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন এককালে বহুবিধ প্রশ্ন করিয়া সকলে তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। যাহারা বিশেষ বন্ধুত্বের জন্য ফকিরকে অত্যন্ত আপনার লোক বলিয়া ভাবিত, তাহাদেরই একজন সমবেদনার স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"ভাই, তুমি ভিখারী হইতে গেলে কেন?"

ফকির—"কি করিতে বল, তুমি ?"

বন্ধু—"নিজ বাহুবলে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিয়া লও, আমরা তোমাকে সাহায্য করিব।"

ফকির নিতান্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—"ছিঃ!"

বন্ধু—"কেন ? আমরা ত তোমাকে পিতৃহত্যা করিতে বলিতেছি না :"

ফকির—"তাহাতে পিতৃহত্যাই হইবে। পিতাকে বন্দী করিয়া তাঁহার আধিপত্য কাড়িয়া লওয়া, পিতৃহত্যারই রূপান্তর মাত্র। তোমরা আজ কি এই পরামর্শই করিতেছিলে ?"

হঠাৎ কাননের অভ্যন্তর হইতে একটা আর্ত্তনাদের শব্দ আসিয়া তাহাদিগকে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ করিয়া দিল।

ফকির অতিশয় ব্যস্ত হইয়া বলিল—"ও কি ?"

অন্যান্য সকলে বলিল—"মরুক গে', ওসব দেখিবার এখন আমাদের অবসর নাই।"

ফকির বলিল,—"না ভাই, নিশ্চয়ই কোন পথিক বিপদগ্রস্ত হইয়া এইরূপে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে! তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি দেখিয়া আসিতেছি!" এই বলিয়া সে দ্রুতবেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই ফকির দেখিল এক রমণী কোন এক দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া এইরূপ আর্ত্তনাদ করিতেছে। তাহাকে দেখিতে পাইয়া দস্যু ভীত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া গেল। রমণী কাঁপিতে কাঁপিতে হতচেতন হইয়া ফকিরের পদমূলে পড়িয়া গেল।

এখন আমাদিগকে একবার এলেমের কথা বলিতে হইতেছে। নির্ব্বাসিত হইয়া সে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। কর্ম্মী লোক সে, তাহার করণীয় কার্য্যেরও অভাব নাই, অথচ লোক অভাবে তাহাকে

নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে হইতেছে! ইহা তাহার নিকট অসহ্য যন্ত্রণা-দায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে সুখাকে উপদেশ দিয়া ফকিরের বন্ধুগণের উদ্দেশে তাহাকে প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু সুখা কাহাকেও বাড়ীতে দেখা পায় নাই, কারণ তাহারা সকলেই আসিয়া এই নিভৃত মন্ত্রণায় সমবেত হইয়াছিল। বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সে এক দুর্ব্বৃত্তের হাতে আসিয়া পড়ে। তারপর ফকিরের সহিত তাহার সাক্ষাতের বিবরণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

যথাকালে চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া সুখা কাতরস্বরে ফকিরকে বলিল—"আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না; এই বিপদ-সঙ্কুল স্থানে আর একপদও অগ্রসর হইতে আমার সাহস হইতেছে না।"

ফকির তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিল—"আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আমি আপনাকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিতেছি।" সুখা পথ প্রদর্শন করিয়া তাহাকে লইয়া চলিল।

এইরূপে যখন তাহারা গন্তব্যস্থানে আসিয়া পৌছিল, ফকিরকে দেখিতে পাইয়া আনন্দোৎফুল্ল এলেম বিস্ময়সহকারে বলিয়া উঠিল,—"একি! ফকির, তুমি আসিয়াছ!"

সুখা—"হাঁ, মা, আজ ইনিই আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।"

এই বলিয়া সে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। শুনিয়া এলেম হৃষ্টচিত্তে বলিল—"ভাই, এই কার্য্যের জন্য তোমাকে আর কি বলিব! যদি পুরস্কার তোমার পাওয়াই উচিত হয় তাহা হইলে পুরস্কার তুমি নিশ্চয়ই পাইবে। আজ এই উপকার আমরা ঋণ স্বরূপেই গ্রহণ করিলাম।" এই বলিয়া সে ফকিরকে সস্নেহে হাত ধরিয়া নিকটে উপবেশন করাইল।

ফকির জিজ্ঞাসা করিল—"এলেম, এখানে তুমি কাহার আশ্রয়ে বাস করিতেছ?"

এলেম—"তিনি এক শক্তিমান মহাপুরুষ, কন্যারূপে আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন।"

ফকির—"কেন, চলনা আমার সহিত; তোমাকে পাইলে মা বড়ই সন্তুষ্ট হইবেন।"

এলেম—"তোমরা কোথায় থাক?"

ফকির তাহার আবাস-স্থান ও ভিক্ষাবৃত্তির কথা বর্ণনা করিতে যাইয়া জান্‌বিবি ও কেরামতের উদ্দেশে তাহার হৃদয়-সঞ্চিত বিদ্বেষ-বিষ যেরূপ ভাবে ঢালিয়া দিল, তাহাতে এলেম বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। তখন কেরামতের নির্য্যাতনরূপ তাহাদের অনুষ্টিত কার্য্য সম্বন্ধে বৃদ্ধের নিকট সে যেরূপ উপদেশ পাইয়াছিল, তাহা অতিশয় বিশদরূপে ফকিরকে বুঝাইয়া দিল। পরে বলিল,—"এখন আমাদিগকে এই পন্থা অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে হইবে।"

ফকির শুনিয়া বলিল—"তা বেশ।"

এলেম—"কিন্তু আমাকে ত লোক শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এখন আমি করি কি?"

ফকির—"কার্য্য আরম্ভ কর, শিক্ষা দেও।"

এলেম—"কা'কে শিক্ষা দিব ভাই, তোমাকে?"

ফকির—"পারনা কি?"

এলেম—"আমি সে কথা বলিতেছি না, আমি স্ত্রীলোক, যাহারা আমার নিকট আসিতে চায়, আমি কেবল তাহাদের উপরেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারি। কিন্তু যাহারা আমাকে চায় না?"

ফকির—"তাহাদের নিকট তুমিও যা, আমিও তাই। কিন্তু আমি এজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, আর আমার বন্ধুগণও তোমার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।"

এলেম—"তবে যাও ভাই, তাহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবে; এই কর্ম্মক্ষেত্রে আর বসিয়া থাকিবার অবসর নাই।"

ফকির—"কিন্তু তোমাকে ত ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছি না, এলেম!"

এলেম—"কেন, আমাকে ভালবাস বলিয়া? তা শুধু কথায় প্রকাশ না করিয়া কার্য্যে প্রদর্শন কর, আমার যাহাতে আনন্দ হয় তাহা সম্পাদন কর। জানিও ভাই, যে আমার জন্য বেশী ত্যাগ স্বীকার করিবে, আমি তাহারই। তোমার বন্ধুগণের নিকটেও আমার এই অভিলাষ জ্ঞাপন করিও!"

ফকির দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল—"তোমরা সকলেই ঐ এক রকমের, যেমন মা, তেমন তুমি! আমি কোন বিষয়েই প্রশ্রয় পাইলাম না।" এই বলিয়া সে গাত্রোত্থান করিল।

এলেম তাড়াতাড়ি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া এক মুদ্রাপূর্ণ থলিয়া আনিয়া ফকিরের হস্তে প্রদান করিয়া বলিল,—"তোমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ইহা গ্রহণ করিতেই হইবে।" এই বলিয়া সে সেদিনের মত ফকিরকে বিদায় দিল।

ফকির আসিয়া দেখিল তাহার বন্ধুগণ তখনও তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। সে তাহাদের নিকট এলেমের সহিত সাক্ষাতের বিবরণ এবং এলেমের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য সবিস্তারে বর্ণনা করিল। পরে, কাহাকেও শিক্ষা, কাহাকেও প্রচার, কাহাকেও সেবা ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সে স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। আজ তাহারও অপেক্ষা করিবার অবসর ছিল না। সে চক্ষুর অন্তরাল হইলেই এক যুবক অপরকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"এ কি রকম ভাই? আমরা সকলে খাটিয়া মরিব, আর এলেমের ভালবাসার অধিকারী হইবে ফকির?"

বন্ধু—"তা ইহা ত আর সত্ব সাব্যস্তের কথা নয় যে মোকদ্দমা করিয়া দাবী নিষ্পত্তি করিবে! নিজের সামর্থ্য থাকে, কাজ করিয়া এলেমের চিত্ত আকর্ষণ কর; আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ফকিরকে নিশ্চয়ই পরাজিত করিব।"

তখন সেই জনতার মধ্য হইতে একযোগে শব্দ উত্থিত হইল "আমিও" "আমিও"। এইরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া যে যাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল।

এদিকে বাড়ী আসিয়া ফকির মাতার নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল এবং মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী লাঞ্ছিতার হস্তে প্রদান করিয়া বলিল,—"মা, আজ হইতে আমাদের ভিক্ষা ঘুচিল।"

লাঞ্ছিতা কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল—"কেন! বাবা, ভিক্ষা করা কি এতই কষ্টকর! কষ্টের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে থাকিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে কোথায় মানবের শিক্ষাপূর্ণ হইয়া থাকে? ভিক্ষা করিতে তুমি অনিচ্ছুক, কিন্তু যাহা আনিয়াছ তাহাও ত এক প্রকার ভিক্ষা! সোপার্জ্জিত বস্তু ভিন্ন যাহা গ্রহণ করা যায় তাহাই ভিক্ষাস্বরূপ এবং নীতিবিরুদ্ধ, অতএব ইহাও গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বাবা, পরের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিতে চাহিও না, তাহাতে হৃদয় কখনও সুস্থ বা দৃঢ়রূপে গঠিত হইতে পারে না। চিরদিন যাহা একটা কিছু অবলম্বন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, হঠাৎ সেই আশ্রয় অপসারিত করিলে, তাহা অবিলম্বে ভূমিসাৎ হইয়া যায়। বৃক্ষ সম্বন্ধে ইহা যেমন খাটে, মানব সম্বন্ধেও তেমনই। জল-নিমজ্জিত মৎস্য, যত দিন জলের বাঁকে বাঁকে চলিতে থাকে, ততদিন বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়ায়; কিন্তু তুলিয়া তীরের উপর রাখিয়া দেও, বাহিরের বায়ুর চাপে অচিরাৎ তাহার দম বন্ধ হইয়া যাইবে। ইতর প্রাণীর মধ্যে যাহা দৃষ্ট হয়, আমাদের সম্বন্ধেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে

পারে না। অতএব আমাদের ভিক্ষাই ভাল, যাহা নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিক্ষা দেয় এবং জীবনের অতি কষ্টকর অবস্থাতেও লোককে অভ্যস্ত করিয়া তোলে। এই অর্থ গরিবের দুঃখমোচনে ব্যয়িত হইবে।"

ফকির ভাবিল,—"ঐত বলিয়াছি, পৃথিবীতে আমার ইচ্ছায় কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কেরামতের পূর্ব্ব-পরিচয়।

এই স্থানে কেরামতের পূর্ব্ব-পরিচয় দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কেরামত কোন আরবদেশীয় বণিককর্ত্তৃক দাসরূপে বহরে আনীত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বহরে আসিয়াই সেই বণিক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কেরামতের তখন অতিশয় শৈশবাবস্থা, এই আকস্মিক বিপদে সে একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছিল। উপায়ান্তর রহিত হইয়া সে নছিবমিঞার আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। নছিব তখন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ, ব্যবসায়-বাণিজ্যেও তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল, কেরামতের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া সে তাহাকে মহম্মদখাঁর অধীনে সৈন্য শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। এই সময় হইতেই কেরামতের ভাগ্য-গগণ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কেরামত অবিলম্বে নিজ দক্ষতার পরিচয় দিয়া ক্রমে ক্রমে মহম্মদখাঁর সর্ব্বপ্রধান সর্দ্দারের পদলাভে সমর্থ হইয়াছিল।

কেরামতের পারিবারিক জীবন আরও বিচিত্রময়। কেরামত যখন দীন ও দরিদ্র ছিল, উদরান্ন সংস্থানের জন্য যখন তাহাকে মাঠে মাঠে গরু চড়াইয়া বেড়াইতে হইত, তখন সে বিবাহের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বিস্তৃত মুসলমান সমাজের কেহই তখন তাহাকে কন্যাদানে স্বীকৃত হয় নাই। তারপর মহম্মদখাঁর অনুগ্রহে যখন তাহার পদবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল, তখন কেরামত একে একে চারিটী সুন্দরী রমণীর প্রাণিগ্রহণ করিয়া তাহার বিবাহের বাসনা চরিতার্থ করিল। কিন্তু এতগুলি বিবাহের সবগুলিই সে নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন করিতে পারে নাই। বাল্যকালে যখন

সে নছিবমিঞার আশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, নছিব তখন তাহাকে গোরক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ইহা ব্যতীত তাহার উপর আরও একটী অতিরিক্ত কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। নছিবের বেতুনা নামে একটী শিশু মেয়ে ছিল, কেরামতকে সময়ে সময়ে তাহার পরিচর্য্যা করিতে হইত! বেতুনা তখন ছোট্ট মেয়েটী, সদাই হাসি-প্রফুল্ল, অফুটন্ত চাঁপা-কলিকার ন্যায় সৌন্দর্য্যময়ী, বড়ই চঞ্চল। কেরামতকে সে খেলার সাথী মনে করিয়া শত প্রকার আব্দারে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। কেরামতও তাহাকে আন্তরিক স্নেহ করিত। তারপর অদৃষ্টদেবী যখন স্নেহবিজড়িত হস্তে ধরিয়া কেরামতকে উন্নতির সোপানে ক্রমে ক্রমে উত্তোলন করিতেছিল, তখন কার্য্যব্যপদেশে একদিন সে নছিবের বাড়ীতে আসিয়া অতিথি হয়। তখন বেতুনা পূর্ণ যুবতী। সুনিপুণ শিল্পীর সযত্ন-গঠিত মানসি-প্রতিমার স্বচ্ছ আচ্ছাদনের অভ্যন্তর-স্থিত দীপাধারের আলোক রশ্মিতে উদ্ভাসিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় বেতুনা পিতৃগৃহ উজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছিল। নিসঙ্কোচে সে আসিয়া কেরামতের পরিচর্য্যা করিল। কেরামতের জীবনে তাহা এক যুগান্তরকারী ঘটনা। বাড়ী আসিয়াই কেরামত বেতুনাকে প্রার্থনা করিয়া নছিবের নিকট লোক প্রেরণ করিল। নছিব ইহা কখনও প্রত্যাশা করে নাই। আপনাকে যথোচিত অপমানিত মনে করিয়া সে তৎক্ষণাৎ পত্রখানাকে শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া দুতকে বিদায় করিয়া দিল। কেরামত কিন্তু তথাপি আশা পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

ইহার পর এক সময়ে বহরে মহরম উৎসব অতি জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হইতেছিল। কেরামত নিজে উদ্যোগী হইয়া একটী প্রদর্শনী খুলিয়াছিল, তাহাতে যোগদান করিবার জন্য স্ত্রীপুরুষের পৃথক পৃথক বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। বেতুনা দাসদাসী পরিবৃত হইয়া সেই উৎসব

দেখিতে আসিয়া সেখানে সে কেরামতের পূর্ব্বস্ত্রীগণের সঙ্গে পরিচিত হইল। তাহারা সকলেই জানিত, একদিন এই বেহুনা আসিয়া তাহাদের সপত্নীর আসন অধিকার করিয়া বসিবে। অবশ্যই ইহাতে যে তাহাদের কাহারও কিছু কষ্টের কারণ ছিল তাহা নহে; কিন্তু কেরামতের প্রথম স্ত্রী ভাবী সতিনের এত রূপরাশি সহ্য করিতে পারিল না। এই রমণী স্বভাবতঃ নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ও অতিশয় দুর্নীতিপরায়ণ ছিল। বেহুনার নিকটস্থ হইয়া সে কর্কশ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁগা, তুমি কি রূপ দেখাইতে এখানে আসিয়াছ?"

বেহুনা চমকিত হইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল প্রশ্নকারিণী ক্রোড়স্থিত শিশুপুত্রকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল,—"নছিব মিঞার কন্যা, তাহার পিতার উপযুক্ত আসনে উপবেশন করিবে, এই আসন কেবল বেগমদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট।" শুনিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিয়া বেহুনা সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

মঞ্চদ্বারে আসিয়া বেহুনা দেখিল তাহার দাস-দাসী সকলেই প্রস্তুত হইয়া দোলার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিতে পাইয়া এক অপরিচিত দাসী অভিবাদন করিয়া জানাইল,—"আপনার দোলা ঐ দিকে অপেক্ষা করিতেছে, চলুন, আমি পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছি।"

বেহুনার তখন হিতাহিত বিবেচনা করিবার ক্ষমতা ছিল না! সমভিব্যাহারী লোকদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়া সে অপরিচিত দাসীর সঙ্গে প্রস্থান করিল।

মঞ্চপ্রান্তস্থিত এক নির্জ্জন কক্ষে কেরামত অপেক্ষা করিতেছিল, দাসী বেহুনাকে সেই স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িল। কিন্তু এই নূতন

বিপদে পড়িয়াও বেহুনা বিচলিত হইল না। কেরামতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমাকে আজ এইভাবে অপমানিত করিবার জন্যই কি এই কৌশল করা হইয়াছে?"

কেরামত—"আল্লা জানেন, বেহুনা, আমি তোমাকে কত ভালবাসি।"

বেহুনা—"জানেন কি আপনি কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন?"

কেরামত—"জানি; নছিবমিঞার কন্যার সঙ্গে।"

বেহুনা—"আর ইহাও বোধ হয় ভুলিতে পারেন নাই যে এই নছিব-মিঞাই একদিন আপনাকে অন্নজলে প্রতিপালন করিয়াছিল। প্রভুকন্যা কখনও উচ্ছিষ্টভোজী নফরের গলে বরমাল্য প্রদান করে না।" এই বলিয়াই সে দ্রুতবেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

কেরামতকে এই অপমান নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছিল, কারণ তখনও সে বহরের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিতে পারে নাই। মহম্মদখাঁ সূক্ষ্মদর্শী ও ন্যায়পরায়ণ মহাপুরুষ ছিলেন, কেরামতের সঙ্গে তাঁহার প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ ছিল মাত্র। কিন্তু তারপরে বহরের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এখন জানবিবি বহরের অধীশ্বরী, আর কেরামতও আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের শ্রেণী হইতে অনেক উন্নত হইয়াছে। আজ এতদিন পরে বেহুনা-কৃত অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার সুযোগ তাহার উপস্থিত হইল।

জানবিবি সমগ্র মুসলমান জাতির অধীশ্বরী হইয়া রাজত্ব করিতেছিল। তাহার অমিত প্রতাপ, বজ্র-গম্ভীর আদেশবাণী, যমরাজের মত শাসন, উল্কাপাতের ন্যায় বক্রদৃষ্টি, ও শিলাবৃষ্টির ন্যায় শৈত্যভাব যে কত শত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া, নূতন পুরাতন ভাঙ্গিয়া গড়িয়া আবার এক নূতনতর রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা এক অভূত-পূর্ব্ব ঘটনা! জগতে এমন কেহ আছে, যে অণুমাত্রও তাহার গাত্রস্পর্শ করিতে সাহসী হইতে পারে, এমন ধারণা জানবিবি কখনও মনে স্থান দিতে

পারে নাই। তাই তেজোবন্ত কর্তৃক বন্দিনী হইয়া সে মর্দ্দিতপুচ্ছ সর্পিণীর ন্যায় প্রতিহিংসা-বিষ উদ্গীরণ-মানসে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তেজোবন্তের দুঃসাহসিক ধৃষ্টতা, কদলী বৃক্ষের আহরিত বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা আকাশস্থ বজ্রকে আহ্বান করার ন্যায় তাহার নিকট প্রতীয়মান হইল। সমগ্র মুসলমানজাতির অধীশ্বরী বলিয়া তাহার যে গর্ব্ব ছিল, জান্‌বিবি অনুভব করিল, গত অত্যাচার যেন তাহাতে কালিমা মাখাইয়া দিয়াছে। সেই কালিমা আবার সে ঘুচাইতে পারিবে কি? জান্‌বিবি প্রতিজ্ঞা করিল হিন্দুগণকে রক্তদানে ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কেরামত যাহার সহায় তাহার আর ভাবনা কি!

তেজোবন্তের কবল হইতে মুক্ত হইয়া বহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই জান্‌বিবি তাহার মুক্তির সাহায্যকারী বীরগণকে পুরস্কৃত করা তাহার সর্ব্ব-প্রধান কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিল। অন্য সকলের কথা স্বতন্ত্র—এমন অসংখ্য তারারাজি চন্দ্রমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে শোভা পাইয়া থাকে—কিন্তু কেরামত ত তাহার কর্ম্মাকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র! তাহার পুরস্কার তাহার পরিশ্রমের উপযুক্ত হওয়াই উচিত। জান্‌বিবি কেরামতকে সাদরে আহ্বান করিয়া আনিল—সেখানে আমিরও উপস্থিত ছিল। তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া জান্‌বিবি বলিতে আরম্ভ করিল,—"তুমি যাহা করিতে পারিতে না, আমার জন্য কেরামত তাহা করিয়াছে। যে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া বন্দিনীকে মুক্ত করিতে পারে, যাহার কার্য্য একমাত্র আমাকেই অনুসরণ করিয়া জগতে এই অভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রথিত করিয়াছে, আমি আজ হইতে তাহার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ রহিলাম।"

তৎপর সে কেরামতের দিকে চাহিয়া বলিল,—"জগতে এমন কি প্রার্থনীয় বস্তু আছে তোমার, যাহা এই উপকারের বিনিময়ে তোমাকে দান করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারি? আজ হইতে সাত দিন তুমি এই

সিংহাসনে বসিয়া বহরের উপর আধিপত্য করিতে পার। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত তোমাকে এই আধিপত্য প্রদান করিতেছি।”

অতএব কেরামত বহরের অধীশ্বর হইল। একটা প্রবাদ আছে যে হনুমানের হস্তে অগ্নি থাকিলে, তাহা লঙ্কাও দগ্ধ করে, মুখও পোড়ায়। স্বার্থপর লোকের হস্তে ন্যস্ত ক্ষমতাও সেইরূপ মহা অনিষ্টের সূত্রপাত করিয়া থাকে। প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া কেরামত প্রথমেই তাহা নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যয় করিতে অগ্রসর হইল। নছিবের ভূসম্পত্তি ছিল, কেরামত কোন অভিযোগের অভাবেও তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া পরোয়ানা বাহির করিল। কিন্তু নছিবকে উচ্ছেদ করা কাজটী বড় সহজসাধ্য বলিয়া বোধ হইল না, কারণ সে প্রতিষ্ঠাপন্ন গৃহস্থ, ক্ষমতাশালী ও লোকপ্রিয় ছিল। কেরামত ভয়ে ভয়ে এক বিপুলবাহিনী সজ্জিত করিয়া নছিবের সর্ব্বনাশসাধনে যাত্রা করিল।

সেদিন নছিবের বাড়ীতে বিবাহোৎসব অতি জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হইতেছিল। বেদ্‌না এক রূপবান সচ্চরিত্র যুবকের সঙ্গে পরিণীত হইতে চলিয়াছে। উদ্বাহবাসর উৎসবে-রত জনগণের হাসি-কোলাহলে মুখরিত। এমন সময়ে কেরামত আসিয়া নছিবের বাড়ী আক্রমণ করিল। অচিন্তনীয় এই আক্রমণে নছিব ব্যাঘ্র-কবলিত শিকারের ন্যায় কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার চিন্তা করিবার অবসর হইল না। কেরামত যখন বজ্রকণ্ঠে তাহার অনুচরগণকে বাড়ী লুণ্ঠন করিতে আদেশ প্রদান করিতেছিল, নছিব তখন পরিজনের সম্মান রক্ষাকল্পে একদিকে সরিয়া পড়িল। কিন্তু উপায় নাই, এক হস্তে স্ত্রী ও অন্য হস্তে কন্যাকে বেষ্টন করিয়া সে পূর্ব্বপ্রান্তে আসিয়া দেখিল তাহা অবরুদ্ধ হইয়াছে। অবশেষে দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর প্রান্তে ঘুরিয়া দেখিল সর্ব্বত্রই কালান্তক যমের ন্যায় কেরামতের অনুচরগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বেদ্‌না

বলিতেছিল—"বাবা—" কিন্তু নছিব তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"চুপ কর, এখনও আমরা বিপদের কেন্দ্রস্থানে দাঁড়াইয়া আছি!" এই বলিয়া সে একটু নিভৃত স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল।

তখন আক্রমণকারিগণ উৎসাহের সহিত নছিবের বাড়ী লুণ্ঠন করিতেছিল। নছিবের অনুচরগণ, বরযাত্রী ও দর্শক যাহারা তথায় উপস্থিত ছিল, ইতিপূর্ব্বেই তাহারা প্রহৃত ও বিতাড়িত হইয়াছিল। লুণ্ঠন কার্য্য সমাপনান্তে কেরামত সেই বিস্তীর্ণ পুরীতে অগ্নি-সংযোগ করিতে আদেশ প্রদান করিল। অবিলম্বে পর্ব্বত প্রমাণ অগ্নিরাশি রূপের আভায় চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া বুভূক্ষু রাক্ষসের ন্যায় সেই সুদৃশ্য পুরীখানাকে গ্রাস করিতে ধাবমান হইল।

নছিব আত্মগোপন করিয়াছিল সত্য, কিন্তু দিবাকরোজ্জ্বল আলোকরশ্মির মর্ম্মান্তিক আক্রমণে শিথিল-গ্রন্থি অন্ধকার যখন ক্রমে ক্রমে তাহার অস্বচ্ছ আবরণ অপসারিত করিয়া লইল, তখন দেখা গেল বক্ষে কন্যা ও পার্শ্বে অবগুণ্ঠনবতী পত্নী লইয়া নছিব একদিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কেরামত আসিয়া বলপূর্ব্বক বেছুনাকে পিতৃক্রোড়চ্যুত করিয়া লইল, আর তাহার অনুচরগণ আসিয়া নছিব-পত্নীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তারপর সেই ভস্মস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া নছিব নিজ স্ত্রী-কন্যার উপর যে অমানুষিক অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিল, তাহা মানব-লেখনী বর্ণনা করিতে অক্ষম। নছিবের সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়াছিল; যখন সে পুনরায় চৈতন্য লাভ করিল, দেখিল সম্মুখে প্রেমময়ী পত্নীর প্রাণহীন দেহ পড়িয়া রহিয়াছে; আর বেছুনা অপহৃত হইয়াছে। সে একবার চাহিয়া দেখিল, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। কেবল জ্বলন্ত অঙ্গারগুলির সুপ্ত আভা তখনও অন্ধকারকে ঘেঁসিতে দেয় নাই। দেখিয়া নছিব একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, তারপর প্রাণহীন পত্নীর দেহ সস্নেহে তুলিয়া লইয়া সেই অগ্নিস্তূপে নিক্ষেপ করিয়া সে উন্মত্তবৎ একদিকে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

আর বেহুনা? কেরামতের গৃহে হতভাগিনী বন্দিনী যখন ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতেছিল, কেরামতের প্রথমা-বেগম আসিয়া তাহাকে কেশাকর্ষণে তুলিয়া বলিল,—"সেদিন রূপগর্ব্বে আমাকে চিনিতে পার নাই, কালামুখি, আজ পদাঘাতে তোমাকে সেই পরিচয় দিতেছি।" এই বলিয়া সে বেহুনাকে নিষ্ঠুর পদাঘাত করিয়া প্রস্থান করিল।

তারপর সকলে ঘুমাইলে, কেরামত ধীরে ধীরে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"বেহুনা, আজ আমার বাসনা পূর্ণ করিবে কি?"

বেহুনা তাহার পদলগ্ন হইয়া বলিল,—"আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু আমাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিতে হইবে।"

কেরামত—"বিবাহ তোমাকে করিবই, কিন্তু বেগম করিবার জন্য নয়, বাড়ীর কেনা বাঁদী হইয়া তোমাকে গত-অবহেলার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধ।

বীরত্বের যে উচ্চ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তেজোবন্ত অমৃতের সাহচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, বাড়ী আসিয়াই সে দেখিল তৎসাধনোপযোগী এক মহা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। দুঃসহ দুঃখের বোঝা বহন করিয়া নছিব দ্বারে দ্বারে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিল, যাঁহারা ন্যায়পরায়ণ, তাঁহারা তাহার করুণ-কাহিনী শুনিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিল, যাহারা দয়াবান্ তাঁহারা সহানুভূতির সহিত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল মাত্র,আর যাহারা কেরামতকে পছন্দ করিত তাহারা যাইয়া জানবিবির নিকট নছিবের এই কার্য্য বিবরণ ব্যক্ত করিযা দিল। জান্‌বিবি তখন বিদ্যুত-ভরা-মেঘ, কাহার মাথায় বজ্র নিক্ষেপ করিয়া তাহার ক্ষমতার সার্থকতা সম্পাদন করিবে তাহারই সুযোগ-প্রয়াসী। সে ঘোষণা দ্বারা প্রচার করিয়া দিল যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নছিব বহর পরিত্যাগ না করিলে তাহার শূলদণ্ড হইবে। অতএব নছিব লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু চিত্ত যাহার সুখশূন্য, স্মৃতি যাহার দাবানল সম, স্বর্গসুখের মাদকতাও সে উপভোগ করিতে পারে না। তাই আজ নছিব তেজোবন্তের দ্বারে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তেজোবন্ত তাহাকে সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি হিন্দু হইতে চাহিতেছ কেন ?"

নছিব তাহার দুঃখের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া শুনাইল। তাহার স্বর শব্দভেদী বানের ন্যায় মর্ম্মস্পর্শী, ভাষা আচারপূত বাল-বিধবার

মর্ম্মোত্থিত কাতর প্রার্থনার ন্যায় ভাবপ্রবণ, শুনিয়া উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

তেজোবন্ত গম্ভীরস্বরে বলিল,—"আগন্তুক, আমি তোমাকে হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করিতে পারিলাম না সত্য, কিন্তু তোমার সাহায্যে আমি প্রাণপাত করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।"

অবিলম্বে তেজোবন্ত নিজের সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া প্রভূত লোক সংগ্রহ করিল, এবং এক শুভদিনে বহর আক্রমণ করিতে যাত্রা করিল। নছিব তাহার পথপ্রদর্শক, গ্রাম, নগর অতিক্রম করিয়া ক্রমেই তাহারা বহরের সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল। কেরামতও ঘুমে কাল কাটাইতেছিল না, যখন সে শুনিল, তেজোবন্ত বহরের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তখন সে শত্রুকে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ দান করাই সঙ্গত মনে করিল। তাহারও সৈন্য প্রস্তুত ছিল, তাহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। কেরামত সেই সজ্জীভূত বাহিনী লইয়া তেজোবন্তের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

উভয়েই বীর এবং যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, বীর্য্যে কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারে না। কিন্তু তেজোবন্ত নষ্ট গৌরব উদ্ধারকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আর কেরামত লব্ধ গৌরব রক্ষাকল্পে উদ্বিগ্নমন। যুদ্ধ উভয়েই দক্ষতার সহিত করিতে লাগিল, কিন্তু আঘাত, প্রতিঘাত, আক্রমণ ও আত্মরক্ষার সুকৌশলে হিন্দুগণ অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইতে লাগিল। তেজোবন্তের বিরাম নাই, তাহার সর্ব্বশরীর রুধিরসিক্ত হইয়া গিয়াছিল, চক্ষু মধ্যাহ্ন ভাস্কর-তেজে জ্বলিতেছিল, মাংসপেশী দৃঢ়তায় কঠিনতম প্রস্তরকেও পরাজিত করিয়াছিল। উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে বেগবান অশ্বে আরোহণ করিয়া সে সমরক্ষেত্রের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। যেখানে বিজয়-লক্ষ্মী জয়-পরাজয়ের পতাকাহস্তে সন্দিগ্ধচিত্তে দুলিতেছিল, তেজোবন্ত সেই স্থানে; যেখানে হিন্দুসেনা বিপক্ষের আক্রমণে বিপদগ্রস্ত, তেজোবন্ত

সেই স্থানে সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া ঘটনা-স্রোত ফিরাইয়া দিতে লাগিল। এইরূপে সারাদিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর, মুসলমানসেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতে লাগিল। সানুচর কেরামত তেজোবন্তের হস্তে বন্দী হইল।

তখন বিজয়হুঙ্কারে মেদিনী কম্পিত করিয়া হিন্দুসেনা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। আজ কেরামতকে বন্দী করিয়া তাহাদের যে আনন্দ, তাহা একমাত্র তাহারাই বুঝিতে পারে যাহারা আজন্ম কষ্টসাধ্য সাধনার মধ্য দিয়া চিরবাঞ্ছিত ইষ্টলাভে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু তেজোবন্ত গুরুতর-রূপে আহত হইয়াছিল, অবিশ্রান্ত রক্তপাতে ক্রমেই তাহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল; ক্রমে ক্রমে তাহার চৈতন্য লুপ্ত হইতে লাগিল, অবশেষে অসার হস্তপদ প্রসারিত করিয়া সে এক পার্শ্ববর্ত্তী সেনানীর বাহুবন্ধনে ঢলিয়া পড়িল।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। উচ্ছৃঙ্খল সন্তানগণের উন্মত্ত-তায় ব্যথিত-চিত্ত ধরিত্রী রজনীর অন্ধকারে বদন আবৃত করিয়া ঝিল্লীরবে রোদন করিতেছিল। পথও অতিশয় বন্ধুর, এমতাবস্থায় তেজোবন্তকে লইয়া অগ্রসর হওয়া কেহই সঙ্গত বিবেচনা করিল না। উন্মুক্ত আকাশের তলে অনাবৃত অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করিলে, তেজোবন্তের অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন হইবে বিবেচনা করিয়া সকলেইআশ্রয়স্থানের অনুসন্ধানে যত্নপর হইল।

অদূরে একটী ক্ষীণ আলোক পুঞ্জীভূত জোনাকীর ন্যায় অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া জ্বলিতেছিল। তেজোবন্তের এক সেনানী ঘুরিতে ঘুরিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল একটী পর্ণকুটীর, তাহার অভ্যন্তরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী উপবিষ্ট রহি-য়াছে। সেনানী তাহাকে অবনতমস্তকে প্রণিপাত করিয়া দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি প্রয়োজন?"

সেনানী—"আমি একজন ক্ষুদ্র হিন্দু সৈনিক, আমার প্রভুর জন্য আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।"

সন্ন্যাসী—"তোমার প্রভু কে?"

সেনানী—"তিনি বীরশ্রেষ্ঠ তেজোবন্ত সিংহ। সম্মুখ যুদ্ধে আজ আমরা মুসলমান-গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া বহর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলাম, পথে তিনি আহত অবস্থায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। আমি তাঁহারই জন্য আপনার কুটীরের এক কোণে একটু স্থান প্রার্থনা করি।" শুনিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,—"তোমরাই যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলে! আচ্ছা, বলিতে পার এই যুদ্ধে কত লোক হতাহত হইয়াছে?"

সেনানী—"তা উভয় পক্ষে এক লক্ষেরও উপর হইতে পারে।" শুনিয়া সন্ন্যাসী মৌনভাবে কিছুকাল চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন,—"সৈনিক, তোমার প্রভুকে আশ্রয় দিতে আমার কোনই আপত্তি নাই, কিন্তু তাহাকে এই আশ্রমের নিয়মাধীনে থাকিতে হইবে।"

সেনানী—"আজ্ঞা করুন।"

সন্ন্যাসী—"প্রথমতঃ, যে কেহ শুশ্রূষার জন্য এই আশ্রমে প্রবেশ করে, সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পর্য্যন্ত সে এই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না।"

সেনানী—"আর?"

সন্ন্যাসী—"তোমার প্রভুকে এই আশ্রমে একা আসিতে হইবে, কিন্তু ইচ্ছা করিলে তোমরা দুই একজন অনুচর মাত্র সঙ্গে থাকিতে পারিবে।"

সেনানী—"আর?"

সন্ন্যাসী—"একমাত্র আর্ত্ত ও পীড়িতের সেবার জন্যই এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজ তোমরা বিপদগ্রস্ত হইয়া যে আশ্রয়-ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ, কাল যদি কোন মুসলমান সেইরূপ আশ্রয়প্রার্থী

হইয়া উপস্থিত হয়, তাহাকে গ্রহণ করা সম্বন্ধে তোমরা কোনই আপত্তি করিতে পারিবে না। তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমি নিজ হস্তে গ্রহণ করিলাম।" সেনানী পুনরায় প্রণিপাত করিয়া বলিল—"আমার সহচরগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া যথাকর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে।" এই বলিয়া সে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

যেখানে বিপুল হিন্দুসেনা উৎকণ্ঠিতচিত্তে সংক্ষুব্ধ জলধির ন্যায় অবস্থান করিতেছিল, সেনানী আসিয়া সন্ন্যাসীর কথা সবিস্তারে তাহাদের নিকট বর্ণনা করিল। তখন উপায়ান্তর ছিল না, বিশেষতঃ সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া সকলেই আশান্বিত হইল। সৈন্যগণকে হিন্দুগ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়া, দুইজন বিশ্বস্ত সেনানী তেজোবন্তকে বহন করিয়া সন্ন্যাসীর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাঠক, ঘটনাস্রোতে এতদূর আসিয়া এখন আমরা এই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছি না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নূতন আলোক।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। যখন নবোদিত সূর্য্য ঊষারাণীর রঞ্জিত অলকাবলী অপসারিত করিয়া পৃথিবীতে প্রকাশ হইয়া পড়িল, তেজোবন্ত তখন সম্পূর্ণরূপে চেতনালাভ করিয়াছে। একটী নাতিপ্রশস্ত পালঙ্কের উপর তেজোবন্ত শায়িত, অনুচরদ্বয় নিকটে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছিল। সন্ন্যাসী রাত্রিশেষে কখন বাহির হইয়া গিয়াছে তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। তেজোবন্ত দেখিল তাহার ক্ষতস্থানগুলি কে অতি যত্নের সহিত সুন্দররূপে বাঁধিয়া দিয়াছে। তাহার শরীরে বেদনা ছিল না, কিন্তু দুর্ব্বলতা তাহার ক্লান্ত দেহের সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সম্বন্ধ শিথিল করিয়া দিয়াছিল। তেজোবন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আমরা কোথায় আসিয়াছি?"

একজন সেনানী উত্তর করিল,—"ইহা বহরের অন্তর্গত কোন জনপদ বিশেষ; আমরা এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে অবস্থান করিতেছি।"

তেজোবন্ত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, গৃহখানি কুটীর হইলেও সুদৃঢ়ভাবে গঠিত, তাহাতে আলোক ও বায়ু প্রবেশের সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু কই, সন্ন্যাসীর চিরসহচর ত্রিশূল ও অজিনেরত কোন চিহ্নও তথায় বিদ্যমান নাই! তেজোবন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"সন্ন্যাসী! কোথায় তিনি?"

একজন অনুচর উত্তর করিল,—"বোধ হয় আমাদেরই কোন প্রয়োজনে তিনি বাহির হইয়া গিয়াছেন, শীঘ্রই প্রত্যাবৃত হইবেন।"

এমন সময়ে একটা দম্‌কা বাতাস আসিয়া তাহাদের সম্মুখস্থ দরজাটী খুলিয়া বাহির হইয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে বহির্ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহারা সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রহিল। মধ্যস্থলে একটী প্রশস্ত আঙ্গিনা, তাহার দুই দিকে গৃহশ্রেণী, রাজবর্ত্মের পার্শ্বে সমব্যবধানে রোপিত বৃক্ষশ্রেণীর ন্যায় বিরাজ করিতেছিল। গৃহগুলি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, লোক ব্যবহারের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে, অথচ জনহীন। তেজোবন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিয়া বসিতেছিল, এমন সময়ে সন্ন্যাসী একটী মৃতপ্রায় মনুষ্যকে স্কন্ধে বহন করিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তেজোবন্তের বোধ হইল লোকটী আহত এবং মুসলমান। সন্ন্যাসী একটী গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে সযত্নে শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন এবং স্বয়ং নিকটে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তেজোবন্তের বিস্ময়ের সীমা নাই, সন্ন্যাসীর কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য সে একজন সেনানীকে সন্ন্যাসীর নিকটে পাঠাইয়া দিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার প্রভু বোধ হয় এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন?"

সেনানী—"শরীরে বেদনা নাই সত্য, কিন্তু বড়ই দুর্ব্বল।"

সন্ন্যাসী—"ও কিছু নহে, শীঘ্রই সারিয়া যাইবে। তোমাদের আর কোন অভাব নাইত?"

সেনানী—"অভাব কিছুই নাই, কিন্তু আমার প্রভু একবার আপনার চরণ-দর্শন প্রার্থনা করেন।"

সন্ন্যাসী—"তাহা এখন কিছুতেই হইতে পারে না, দেখিতেছ না আজ আমাকে বড়ই ব্যস্ত থাকিতে হইবে।"

এমন সময় কোলাহল করিতে করিতে বহু আহত সেনা লইয়া একদল লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী তাহাদের জন্য পৃথক পৃথক গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ক্রমে চিকিৎসক, ভৃত্য ও সেবকগণ আসিয়া

উপস্থিত হইল, কিন্তু তথাপি সন্ন্যাসীর বিরাম নাই, সেবকগণকে উৎসাহ, আহতদিগকে সান্ত্বনা এবং ভৃত্যগণকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া তিনি সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন।

তেজোবন্ত সকলই দেখিতেছিল, সন্ন্যাসীর ব্যবহারে তাহার হৃদয়ে একটা সঙ্কোচের ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। পার্শ্বস্থ সেনানীর প্রতি চাহিয়া সে বলিল,—"তোমরা আর এখানে বসিয়া কি করিতেছ! আমি এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছি। বিপদের সময় আশ্রয়দানে যিনি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, আজ তাঁহার এই অভাবের সময়েও আমাদিগকে নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। তোমরা সন্ন্যাসীর সাহায্যার্থে গমন কর।"

সেনানীদ্বয় যখন আসিয়া সন্ন্যাসীর নিকটে তাহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল, সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং উভয়ের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সারাদিন পরিশ্রমের পর যখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিল, তখন সন্ন্যাসী সেনানীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া তেজোবন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহাকে অভিনিবেশসহকারে দেখিয়া তেজোবন্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"একি পাপাত্মা! তোমার এই কাজ?"

পাপাত্মা—"অন্যায় কি করিয়াছি, ভাই, তোমারই অনুষ্ঠিত রঙ্গনাট্যের শেষ অংশ আজ আমাদ্বারা এইরূপে অভিনীত হইতেছে।"

তেজোবন্ত—"আমি সেভাবে বলি নাই, পাপাত্মা, আঘাত করিয়াই আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি, তুমি যদি সেই ক্ষতে প্রলেপ লেপন করিয়া শান্তি লাভ কর, আমি তাহাতে দোষারোপ করিব কেন? তোমার আশ্রমে আজ কত রোগী উপস্থিত হইয়াছে?"

পাপাত্মা—"অনেক, আরও আসিতে পারে।"

তেজোবন্ত—"তাহারা কেহ আমার অবস্থিতির কথা অবগত আছে কি?"

পাপাত্মা—"সকলেই জানে তুমি এই আশ্রমে বাস করিতেছ।"

তেজোবন্ত—"তাহা হইলে এখনই আমাকে এই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইতেছে।"

পাপাত্মা—"কেন, তাহারা তোমার অনিষ্ট করিবে বলিয়া? ভয় নাই, তেজোবন্ত, ইহা রণাঙ্গন নহে, প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সময়ও ইহা নয়। এই দয়ার নিকেতনে কেহ বা দান, কেহ বা গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। আজ তাহাদের নিকট হিন্দু-মুসলমান অভেদাত্মা।"

তেজোবন্ত—"সম্ভব কি?"

পাপাত্মা—"অসম্ভবের কি কারণ থাকিতে পারে? শুন নাই, ঋষীর আশ্রমে ইতর প্রাণিগণও খাদ্য-খাদক সম্পর্ক ভুলিয়া প্রীতির বন্ধনে বিচরণ করিয়া থাকে? আজন্ম-অর্জ্জিত বিদ্বেষ ভুলিয়া যদি তোমার সেনানীগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মুসলমানের সেবায় ব্রতী হইতে পারে, তবে মুসলমানগণই বা কেন তোমার সেবায় কুণ্ঠিত হইবে! যদি বিশ্বাস না হয় আমি প্রত্যক্ষ দেখাইতেছি।" এই বলিয়া সে গৃহের বাহির হইয়া গেল এবং অবিলম্বে ফকিরের বন্ধু কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক মুসলমান লইয়া সেই গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিল। তেজোবন্তের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেমন, চিনিতে পারিতেছ কি?"

"হাঁ, তেজোবন্ত সিংহ।"

"ইনিও আজ এই আশ্রমের অতিথি, কিন্তু বড় দুর্ব্বল, ইহাকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে; এস, আমাকে সাহায্য কর।" তৎপর তাহারা অতি সন্তর্পণে উঠাইয়া তেজোবন্তের শয্যা গৃহের অন্যত্র স্থানান্তরিত করিল! তেজোবন্ত পুনরায় শয্যা গ্রহণ করিলে, পাপাত্মা তাহাদিগকে বলিল,—

"আজ হইতে তোমরা ইহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলে, এখন তোমরা প্রস্থান করিতে পার।" তাহারা যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

তৎপর সাতদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তেজোবন্ত অনেক দেখিয়াছে এবং অনেক শিখিয়াছে। সে এখন সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহার চলিবার শক্তিও ফিরিয়া আসিয়াছিল। সক্ষম হইয়া সে এখন নিজকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রমের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত করিল। প্রত্যেক রোগীর শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, তাহার মুখে পানীয় ও ঔষধ, বেদনাযুক্ত স্থানে সস্নেহ হস্ত সঞ্চালন এবং আবশ্যক মত স্ত্রীজন-সুলভ পরিচর্য্যা দ্বারা সে আপনাকে সতত ব্যাপৃত রাখিতে লাগিল। দুষ্ট প্রবৃত্তি হিংসা সেই আশ্রম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল, অথবা যেখানে দয়ার মন্দির প্রতিষ্ঠিত, হিংসা তাহার গণ্ডির ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না।

একদিন দৈনিক কার্য্য-সমাপনান্তে নিজ আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পথে তেজোবন্ত পাপাত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"ভাই, তোমার কাজে গৌরব আছে কিনা তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু নির্ম্মল আনন্দ আছে তাহা স্বীকার করিতেছি। তথাপি একটা সন্দেহের মীমাংসা আমি কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারিতেছি না!"

পাপাত্মা—"কি?"

তেজোবন্ত—"হিন্দু মুসলমানের পরস্পর সম্প্রীতি, তাহা সম্ভবপর কি?"

পাপাত্মা—"কেন, তুমি কি মনে কর তাহারা ভগবানের ইচ্ছায় কেবল পরস্পর দ্বন্দ্ব করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে?"

তেজোবন্ত—"আমার ত তাহাই বিশ্বাস।"

পাপাত্মা—"তুমি ভুল বুঝিয়াছ। দেখ, সাধারণতঃ এক মাতৃজ, এক

পিতৃজ, বা এক পরিবার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর আমাদের স্নেহের বন্ধন পড়িয়া থাকে। এই স্নেহের পরিধি নিতান্তই সঙ্কীর্ণ, কেবল আত্মীয়তাকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার বিস্তৃতি। কিন্তু ইহা ছাড়াও অতি প্রশস্ত আরও আমাদের অনেক স্নেহের বন্ধন আছে, যাহা এক একটী জাতিকে আলিঙ্গন করিয়া বর্ত্তমান থাকে। এই সহৃদয়তার ক্রম বিকাশেই আমরা যথাক্রমে প্রতিবেশী, গ্রামবাসী, একদেশবাসী, একভাষী বা একজাতিভুক্ত ব্যক্তিগণের জন্য মমতা অনুভব করি। তোমার প্রতিবেশী বিপদে পড়িলে তুমি তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাক, গ্রামবাসীর মঙ্গলের জন্য গ্রামে গ্রামে দাতব্যচিকিৎসালয় এবং বিদ্যালয় স্থাপন কর, দুর্ভিক্ষের সময় সুদূর রাজপুতনার অধিবাসিগণকেও অর্থ সাহায্য করিতে তুমি কুণ্ঠিত হও না। এই সমপ্রাণতার প্রবৃত্তি মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, জাতিধর্ম্মের বিভিন্নতা ইহার নিকট প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তারপর, ভাষা মনোভাব ব্যক্ত করিবার উপায়, যাহাদের সঙ্গে তুমি আজন্ম তোমার সুখ দুঃখের ভাব অদল বদল করিয়া আসিয়াছ, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি হইবারই কথা। প্রকৃতিও তাহার কঠোর শাসনে আমাদিগকে এক করিয়া দেয় না কি? দুর্ভিক্ষের আক্রমণে হিন্দু-মুসলমান সমফল-ভোগী, মহামারী হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই সমভাবে গ্রাস করিতেছে। তবে আমাদের পার্থক্য কোথায়? মুসলমান আমাদের প্রতিবেশী, গ্রামবাসী, একদেশবাসী, একভাষী এবং এক জাতিভুক্ত, ভারতবাসী বলিলে হিন্দু-মুসলমান দুই বুঝায়। তবে আমাদের মিলন না হইবে কেন?"

তেজোবন্ত—"কথায় এই সম্বন্ধটা অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয় সত্য কিন্তু কার্য্যে বড়ই বিষম হইবে।"

পাপাত্মা—"সেই জন্যই আমাদের এই আয়োজন। এতদিন হিন্দুকে মুসলমান বুঝিতে চায় নাই, হিন্দুও মুসলমানের প্রীতি উপেক্ষা করিয়া

আসিয়াছে। নতুবা আজ তোমার আমার এত কষ্টের প্রয়োজন হইত না।"

সহসা তেজোবন্ত পাপাত্মার হস্ত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"আজ আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ তুমি ?"

পাপাত্মা—"কেন ভাই ?"

তেজোবন্ত—"যে দৃঢ়ভিত্তি অবলম্বন করিয়া আমি গর্ব্বোন্নতমস্তকে কালের স্রোত প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, আজ বোধ হইতেছে তাহার কঠোরতা শিথিল হইয়া যেন আমার পদতলেই এক অতলগর্ভে ডুবিয়া যাইতেছে, তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

পাপাত্মা—"কোথায় ?"

তেজোবন্ত—"আমার গৃহে। ইচ্ছা হয় সেখানে বাস করিও, নতুবা আমি জায়গা দিব, তাহাতে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিবে।"

পাপাত্মা—"আজ এ'কথা কেন, ভাই ? আমি জানি তুমি আমাকে আন্তরিক ঘৃণা কর।"

তেজোবন্ত—"সে কথা ভুলিয়া যাও, পাপাত্মা, তাহা আজ আমাকে স্বপ্নদৃষ্ট কুস্বপ্নের মত পীড়ন করিতেছে। তোমাকে ছাড়িয়া আমি যাইব না।"

পাপাত্মা—"তা আমিও যাইব বৈ কি ? আমার নিকট মান অভিমান বড় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।"

তেজোবন্ত—"তবে আজই যাত্রা করা যা'ক।"

পাপাত্মা—"তোমার যেরূপ অভিরুচি।"

নবম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসিনী।

আমাদের একটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আকাশস্থ গ্রহ-নক্ষত্রাদি মানবের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ইউরোপেও পূর্ব্বকালে এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইদানীং তাহা কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছে। কিসে কি হয় তাহা কে বলিতে পারে, তবে ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে নদীসকল জলপূর্ণ হয়, শরীর রসস্থ হয়, এবং মনুষ্য-শরীরে ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আরও শুনিয়াছি যে গ্রহ-নক্ষত্রাদির আকর্ষণ নাকি পৃথিবীর গতির উপরেও কার্য্য করিয়া থাকে। চন্দ্রসূর্য্যাদির অবস্থানের বিশেষত্বের কারণেই যদি আমরা এই প্রকার বিবিধ পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তবে এই বিশাল সৌর জগতের অন্তর্গত কোটী কোটী গ্রহ-নক্ষত্রাদির মধ্যে কোন্‌টী আমাদের উপর কত আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে!

তবে কথনও কথনও প্রকৃতির উৎকণ্ঠা-রক্ষিত অতি ক্ষুদ্র জড় পদার্থটীও যে মানবের গর্ব্বিত হৃদয়কে বশীভূত করিয়া আমাদের উপর তাহার ক্ষুদ্র শক্তির প্রাধান্য প্রমাণিত করে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কমনীয়-কান্তি কুসুম কলিকা যথন তাহার ক্ষণস্থায়ী যৌবনের হাসিটুকু লইয়া স্পৃহনীয় সুষমা-মাধুরীতে ফুটিয়া উঠে, আর খেলিতে খেলিতে তাহার লুকান হৃদয়ের মধুটুকু দিয়া আকুল মলয়-গাত্র সুরভিত করিয়া দেয়, তথন কে তাহার উদ্দেশে প্রীতির উপহার প্রদান না করিয়া থাকিতে পারে! বর্ষাবসানে নবোদিত চন্দ্র যথন নক্ষত্র-বিরল সুনীল আকাশ হইতে উৎসবে-রত শারদী বঁধুর হরিদ্রাভ দেহটী ঘিরিয়া শুভ্র

কৌমুদী—বসন পরাইয়া দেয়, তখন কাহার চিত্ত আনন্দের লহর তুলিয়া সেই মোহকর সম্মিলনে নৃত্য না করিয়া থাকিতে পারে? যে পারে পারুক, কিন্তু শান্তা আমাদের বড়ই হৃদয়ময়ী এবং কোমলা। জ্যোৎস্না-বিকসিত তাহার সেই ক্ষুদ্র উদ্যানের মধ্যে দাঁড়াইয়া একটী প্রস্ফুটিত গোলাপের প্রতি স্থির দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া শান্তা তন্ময়চিত্তে ধ্যানপরায়ণা! যেন বিধাতাপুরুষ মর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত একটী অপ্সরা-মূর্ত্তি স্বহস্তে গঠন করিয়া বনদেবীরূপে এই উদ্যান মধ্যে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন! কাহার ভাবনা কোথায় তাহা কে বলিতে পারে! ফুল দেখিয়া শান্তার মনে কি হইতেছিল, তাহাও কি আমরা বলিতে সক্ষম! তবে পশ্চাৎ দিক হইতে চুপি চুপি আসিয়া শ্যামা বলিল,—"এ কি সই, ফুলের মধ্যে ভ্রমরের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছ!"

শান্তা—"তোমার যেমন মনগড়া কথা! নির্জ্জনে বসিয়া একটু চিন্তা করিবারও কি আমার অবসর নাই?"

শ্যামা—"বালাই, তাহা না থাকিবে কেন? তবে চিন্তা ও আশা একই পথের সহযাত্রী, চিন্তা করিতে হয় কর, কিন্তু আশা পরিত্যাগ করিও না?"

শান্তা—"কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলা হইতেছে?"

শ্যামা—"কাহাকেও নহে, তোমার মত ফুলের দিকে চাহিয়াই আমার মন কোন দূরদেশে অভিলষিত বস্তুর উদ্দেশে উদাসভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় না।"

শান্তা—"আমি হার মানিলাম।"

শ্যামা—"তাহাতে আমার দিগ্বিজয়ী সম্রাটরূপে ঘোষিত হইবার কোনই কারণ নাই। কিন্তু সই, এমন নিষ্ঠুরভাবে নিজকে নির্য্যাতন করিয়া লাভ কি?"

শান্তা—"লাভালাভের হিসাবটাও করিতে হইবে নাকি? ইহাত

দোকানদারী নয় যে প্রতিমুহূর্ত্তেই দেনা পাওনার হিসাব চুকাইয়া কাজ করিতে হইবে।”

শ্যামা—“মূর্খ পুরুষগুলা এতটা বুঝিতে পারে না!”

শান্তা—“পারিলে কি হইত?”

শ্যামা—“আবার তাহারা মানুষ হইতে পারিত।”

শান্তা—“ছিঃ সই, যে নদী প্রবাহিত হইয়া যায়, তাহা তীরস্থ সৌরভ-রাশি উপভোগ করিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়ায় না। তাঁহার কাজে তিনি চলিয়াছেন, আমি পথমধ্যস্থ কণ্টক বৈত নই, আমার আঘাতে ব্যথিত হইয়া তিনি দু' একবার ফিরিয়া চাহিতে পারেন, কিন্তু এমন কি আকর্ষণী আছে আমার যাহার প্রভাবে তাঁহার গতি একমাত্র আমাকেই কেন্দ্র করিয়া প্রধাবিত হইবে! আর হইলেও তাহাতে আমার তৃপ্তি হইবে কি? পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ দেখিবার জিনিষ বটে, কিন্তু মুক্ত কেশরী শোভার আধার।”

শ্যামা—“তা' তোমার সিংহ-ম'শায় তাঁহার সৌন্দর্য্য লইয়া বনে বনে চড়িয়া বেড়া'ক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে তোমার সৌন্দর্য্যটুকুও লোপ পাইতে বসিয়াছে!”

শান্তা—“আমার সৌন্দর্য্য যদি কিছু থাকে, এরূপভাবে লোপ পাইয়াই তাহার শ্রেষ্ঠ সফলতা।”

শ্যামা—“এ'কথাটাত সন্ন্যাসিনীর মত হইল।”

শান্তা—“আমি তবে কি?”

দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত এই কথা বলিতে গিয়া শান্তার চক্ষে একটু জল আসিয়া পড়িয়াছিল, শ্যামা তাহা দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিল,—“একথা কেন সই?”

শান্তা—“যা'র যাহা মানায় সে তাহাই বলিয়া থাকে। একবার ভাবিয়া

দেখিয়াছ কি আমরা এখন কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি! মনে করিয়া দেখ কারাগারের সেই প্রথম সাক্ষাৎ, দ্বিতীয় সাক্ষাতের ঘটনা আরও ভয়ঙ্কর, তারপর বাবা হিন্দুগ্রামাধীপের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। এই সকল অনিষ্টের মূলেই এই মল্লসঙ্ঘ, যতদিন ইহার ধ্বংস সাধিত না হইবে, ততদিন এই নির্য্যাতন প্রবৃত্তির বিরাম হইবে না, আমরাও আর কতদূরে চলিয়া যাইব তাহা কে বলিতে পারে!"

আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া শ্যামা বলিল,—"আমার উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল, আত্মরক্ষার পরিবর্ত্তে আমি নির্য্যাতনের উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করি নাই। কিন্তু এখন ইহার একটা বিহিত কর না কেন?"

শান্তা—"সে তুমি, না, আমি? এতদিন তুমিই সব করিয়া আসিয়াছ, —আজও ইচ্ছা করিলে তুমিই সব করিতে পার।"

এইবার শ্যামা পরাজিত হইল। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা সহজ, কিন্তু তাহা নির্ব্বাণ করা কষ্টসাধ্য। তাহার উৎসাহে মল্লসঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহার উচ্ছেদ-সাধন এখন সম্ভবপর কি? শ্যামাও ইহা বুঝিতে পারিল, তাই কোন উত্তর করিতে পারিল না।

শ্যামার মুখ ফুটিল না সত্য, কিন্তু প্রাণের ভিতর তাহার তুফান বহিয়া যাইতে লাগিল। শান্তার বেদনাভরা অভিযোগে তাহার জ্ঞানের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, শ্যামা বুঝিতে পারিল এই সকল অনিষ্টের জন্য সেই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা আর ফিরিবে না, কিন্তু একটা দুষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সে যে তাহার প্রাণের সখীকে অতল জলে ডুবাইতে বসিয়াছে! তখনও শান্তা তাহার সম্মুখে বিষাদ-মাখা মূর্ত্তি লইয়া দাঁড়াইয়াছিল, দেখিয়া তাহার অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশ মহাবেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। শ্যামা সাগ্রহে শান্তার হস্ত ধরিয়া বলিল,—"সই, কি করিলে আবার তোর মুখে হাসি দেখিতে পাইব?" শান্তা তাহার প্রতি

দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"আমার জন্য ভাবিও না, আমি হাসিতেও জানি, সহিতেও পারি। কিন্তু আজ তোমাকে আমার একটা কথা রাখিতেই হইবে।"

শ্যামা—"কি ?"

শান্তা—"বাবা কেরামতকে বন্দী করিয়া আনিয়াছেন, তাহা জান ?"

শ্যামা—"হাঁ"

শান্তা—"তাহার প্রতি কি ব্যবস্থা হইয়াছে ?"

শ্যামা—"মল্লসঙ্ঘের বাৎসরিক উৎসব আগত প্রায় ; শুনিয়াছি ঐ দিন কেরামতের প্রতি শূলদণ্ডের ব্যবস্থা হইবে।"

শান্তা—"কেন ?"

শ্যামা—"ইহাই ত চিরন্তন প্রথা।"

শান্তা—"সই, আজ আমি তোমার নিকট তাহার প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করি। আজ যদি অতীতের মোহ ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পার, চিরন্তনকে নূতনের পথে চালিত করিতে পার, তবে আমাকে যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব, দুঃখ ভুলিব, ভালবাসা ভুলিব, হাসিব, খেলিব, তোমাদিগকে সুখী করিব, সংসার-পথের অনুবর্ত্তী হইব।"

শ্যামা—"আমি ভগবানের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আজ হইতে আমি নির্ব্বিকার, আর কিছুতেই যাইব না।"

"আর আমিও তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেছি, অবিলম্বে তোমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে।" এই বলিয়া পাপাত্মা পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।

শ্যামা হাসিয়া বলিল,—"আপনার অসাধ্য কাজ কিছুই নাই।"

দশম পরিচ্ছেদ।

হিন্দুসমাজের নিষ্ঠা।

বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অমৃতের অন্দর মহলে পরিচারিকাগণ রন্ধন-কার্য্যে নিযুক্ত। কেহবা বাট্‌না বাটিতেছে, কেহবা কুট্‌না কুটিতেছে, কেহবা অন্যান্য বিবিধ প্রকারে পাচক ঠাকুরদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু হাতের কাজ তাহাদের যদিও চলিয়াছিল, মুখ ক্ষণমাত্রও বিশ্রাম লাভ করিতে পারে নাই। শ্যামা একটা কৈমৎস্যের উদর বিদীর্ণ করিতে করিতে বামার দিকে চাহিয়া বলিল,—"এখনও হয় নাই! তোর সকল কাজেই যেন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের পালা! খাইতে বসিলেও যেন বেঙ্গাচি ঝিনুক দিয়া সমুদ্রমন্থন করিতে বসিয়া গেলেন!"

বামাও ছাড়িবার পাত্রী নয়; অত্যধিক ক্রোধান্বিত হইয়া সে বলিল,—"বটে! আর তুমি যে অগস্ত্যের মত এক নিশ্বাসে সাত সমুদ্র উজাড় করিয়া দেও! খেতে বসিলে ত চার থালার কমে হয় না, আবার কথার রকম দেখ!" এমন সময় বামী এক কলসী জল কাঁকালে করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। বলিল,—"আর পারিনে, আমার কাঁকাল ধ'রে গেছে! জল জল করে যেন লোকের বুকে মরুভূমি জেগে আছে, আর সারাদিন আমার কাঁকাল হইতে কলসী নামিবার উপায় নাই!" অমনি হাবী বলিল,—"তবু ও তোর্ অনেক ভাল, কিন্তু রোজ দু'বেলা আমাকে তিনশত বিশখানা শকরি টানিতে হয়; রক্তমাংসের হাতে আর কত সহিবে; দেশে একটা মহামারী আসিলে আমি কালীবাড়ীতে একটা পাঁঠা দিই।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ সকলে থামিয়া গেল। পাঁচী চক্ষু ঠারিয়া কাদীকে কি বলিল, কাদীও ইসারাতে তাহার প্রত্যুত্তর করিল! মণি একটা অর্দ্ধছিন্ন কুষ্মাণ্ড বটির উপরে রাখিয়াই পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া চাহিল, ভবী একটা কাষ্ঠকান্তি হলদি চূর্ণ করিবার জন্য উত্থিত নোড়া হস্তেই হা করিয়া চাহিয়া রহিল। ক্ষেন্তি আসিয়া তাহারই মত দেহবিশিষ্ট একটা প্রকাণ্ড থাম অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইল, ফেলী আসিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিতে লাগিল। এইরূপে বিশৃঙ্খল কলরবের স্থানে সেখানে মুহূর্ত্তমধ্যে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

এতকাণ্ড শুধু এক বৃদ্ধাকে লইয়া; বৃদ্ধা জীবনের মাতা, কলসী কক্ষে সেই রাস্তা দিয়া জল আনিতে যাইতেছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে কোন সংস্কৃত জলাশয় ছিল না, তাই তিনি পানীয় জলের জন্য অমৃতের বাড়ীতে প্রত্যহ যাতায়াত করিতেন। আজও সেই উদ্দেশ্যে চলিয়াছিলেন, কিন্তু অন্দরের নিকটবর্ত্তী হইলেই প্রধানা পরিচারিকা অলকাসুন্দরী ডাকিয়া বলিল,—"ওগো, আর এদিকে নয়। তোমার জল নেওয়া মানা হইয়া গিয়াছে।"

বৃদ্ধা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন?"

অলকাসুন্দরী—"তা আমরা কি করিব, বল? তোমার মেয়েই তোমার কাল হইয়াছে! সেদিন যে কাণ্ডখানা হইয়া গেল, তোমাকে ছুঁইয়া আর জল খাইতে নাই।"—শুনিয়া বেদনা-কাতর বৃদ্ধার কাঁকাল হইতে কলসীটী পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল, বৃদ্ধা মাথায় হাত দিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। কিছুকাল পরে উঠিয়া তিনি ধীরে ধীরে বাড়ী চলিয়া গেলেন। তিনি অদৃশ্য হওয়া মাত্রই পরিচারিকা-প্রধানা বলিয়া উঠিল;—"ওলো মতি, এক ফসলা গোবর ছিট্‌কা দিয়া এই স্থানটা পরিষ্কার করিয়া নে ত,

আর ত মরিবার জায়গা নাই, সব আমাদেরই ঘাড়ে আসিয়া পড়েন।” এই বলিয়া সে পানপত্র ধ্বংসের মানসে ভাণ্ডারগৃহের দিকে চলিয়া গেল।

অমৃতের কুলপুরোহিত শুচিরাম শর্ম্মা বড়ই সতর্ক। অমৃতের প্রতি তাঁহার উপদেশের কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। অমৃত তদনুযায়ী কাজ করিতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য প্রত্যহই তিনি রাজবাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। তাঁহার ভয়ে, এবং ব্রাহ্মণের আদেশ প্রতিপালন না করিলে পাছে তাঁহার মহাপাতক সঞ্চয় হয়, এই ভয়ে অমৃত গুরুদেবের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে আর কাল-বিলম্ব করা সঙ্গত মনে করিল না। ধোবা নাপিত ডাকিয়া সে তাহাদিগকে জীবনের মাতার কোন কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া দিল। ব্যবসায়ীরা সুযোগ বুঝিয়া বৃদ্ধার নিকট কোন জিনিষ বিক্রী করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিল। দেশের মজুরেরা এক যোগে তাঁহার কার্য্য বন্ধ করিয়া দিল। এমন কি একটা মুচিও তাঁহাকে ছুঁইয়া এক ঘটী জল খাইতে দ্বিধা বোধ করিতে লাগিল। এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবনের মাতা অসহায় অবস্থায় নিজের বাড়ীর গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া একা কাল কাটাইতে লাগিলেন। পাটের আঁশের মত পক্ক কেশগুলি তাঁহার কাঁধে আসিয়া পড়িয়াছিল, দীর্ঘ দীর্ঘ নখ এবং মলিন বস্ত্র তাঁহাকে এক অদ্ভুত জীব করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার উপর আবার ভিটায় ঘরখানা নাই, জীবনের অত্যাচারে তাহা ধূলিসাৎ হইয়াছিল, এবং এপর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে সামান্যরূপ সাহায্য করিতেও অগ্রসর হয় নাই। তিনি নিজে যতটা পারিলেন পুরাণ ভগ্ন উপকরণগুলি কুড়াইয়া তদ্দ্বারা এক ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন, এবং বনের শাক-সবজি কুড়াইয়া পঙ্কিল জলে স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া তিনি অতি কষ্টে দীর্ঘ দীর্ঘ দিনগুলি কাটাইয়া দিতে লাগিলেন।

একদিন মধ্যাহ্নসময়ে ঘাটে বসিয়া বৃদ্ধা সিক্তবসনে মহাদেবের

পূজা করিতেছিলেন, এমন সময়ে সন্ন্যাসী সেই রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। দেখিয়া বৃদ্ধা অঙ্গুলী সঙ্কেতে তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন, পরে পূজা সমাপনান্তে বলিলেন,—"বাবা, আমার উপায় কি হইবে, আমি যে কাহারও নিকট বাহির হইতে পারি না। লোকে আমাকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না! এরূপ অবস্থায় লোক ক'দিন বাঁচিতে পারে?" বলিতে বলিতে বৃদ্ধার চক্ষু দিয়া জলধারা প্রবাহিত হইল।

সন্ন্যাসী বলিল,—"গুরুদেব যে আপনাকে পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছেন।"

বৃদ্ধা—"বাবা, তোমারও ঐ কথা! কেন, আমার অপরাধ কি? আমি ত আর জীবনকে নিমন্ত্রণ করিয়া ডাকিয়া আনি নাই! এসকল দৈবদুর্ঘটনা আজ আমার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে, কাল তোমাদেরও ঘটিতে পারে। হিন্দুসমাজে একটা ডোমেরও থাকিবার স্থান আছে, কিন্তু আমার যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! ঘর নেই, পরনে মলিন বস্ত্র, এই কদর্য্য জল পান করিয়া বাঁচিয়া আছি, আমি অস্পৃশ্য ও সমাজ বর্জ্জিত! এমন লোকটী নেই যে অসুখ হইলে এক বেলা আমার মুখে একটু পথ্য তুলিয়া দেয়। লোক অভাবে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে না পারাতে আজ দু'দিন আমার কিছুই খাওয়া হয় নাই।" এই বলিয়া তিনি আবার কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সন্ন্যাসী, এইবার তোমার কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে, প্রবেশ করিবে, কি পশ্চাৎপদ হইবে? সন্ন্যাসী কিছুকাল মৌনভাবে ইহাই চিন্তা করিল। শাস্তার কথাগুলি সে তখনও ভুলিয়া যায় নাই, কি এক অশ্রুতপূর্ব্ব ঘণ্টাধ্বনি তাহার কর্ণে মধুর বাজিতেছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার সকল সন্দেহ দূরীভূত হইল, সে প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জকস্বরে বলিল,—"মাসীমা, আমি আপনাকে সাহায্য করিব।" জীবনের মাতাকে সে এই সম্বোধনই করিত।

বৃদ্ধা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন,—"তুমি যে করিবে তাহা আমি জানি, আমার চুলের মত তোমার পরমায়ু হউক।"

"আমি এই আসিতেছি" বলিয়া সন্ন্যাসী তথা হইতে প্রস্থান করিল। বৃদ্ধার আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হইবে, অথচ গৌণ করিলেও চলিবে না। সন্ন্যাসী মনন করিল যে তাহাদের ভাণ্ডার হইতে সে ইহা সংগ্রহ করিবে। তখন অলকাসুন্দরী, যক্ষের ধন-রক্ষক বাসুকির ন্যায় গৃহের মধ্যস্থানে বসিয়া ভাণ্ডার পাহাড়ায় নিযুক্ত ছিল। সন্ন্যাসী গৃহে প্রবেশ করিয়াই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"দেখি, ভাণ্ডারে মিষ্টান্ন কি কি আছে?"

অলকাসুন্দরী এইরূপ অভিনয় জীবনে কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই, একে ত সন্ন্যাসীর ভাণ্ডারগৃহে আসা কল্পনা মাত্র, তাহাতে আবার স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই সে মিষ্টান্নের অনুসন্ধান করিতেছে! অলকা কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া একটা পাত্র বাহির করিয়া বলিল,—"এই পাঁচখানা গজা, দশখানা লুচি, সাতখানা" সন্ন্যাসী বাধা দিয়া বলিল,—"তোমার ওসব কে জানিতে চাহিতেছে? ভাল মিষ্টান্ন কি আছে তাহাই বল।"

অলকা হতাশভাবে বলিল,—"আজ্ঞে ভাল কিছুই নাই।"

সন্ন্যাসী কৃত্রিম ক্রোধের সহিত বলিল,—"তা থাকিবে কেন? যাও সরকারকে বল গে, এখনই আমাকে ভাল মিষ্টান্ন আনিয়া দিতে হইবে।" অলকা তাড়াতাড়ি গৃহের বাহিরে আসিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে দিতে প্রস্থান করিল।

এদিকে সন্ন্যাসী অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিল চাউল, তরকারী প্রভৃতি কোথায় থাকে। তৎপর স্বীয় গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া তাহাতে কিছু চাউল, নানাপ্রকার তরকারী এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দু'একটী জিনিষ বাঁধিয়া পাশের জানালা দিয়া তাহা বাহির করিয়া দিল। সেদিকটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন, কাজেই কেহই দেখিতে পাইল না! তৎপর সে নিজে,

নিতান্ত ভাল মানুষটীর মত, ভাণ্ডারগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া জানালার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। পরে পুটলীটী কক্ষতলে স্থাপন করিয়া, গাত্রাবরণের অবশিষ্টাংশ দ্বারা সে শরীর সতর্কতার সহিত ঢাকিয়া লইল এবং ত্বরিতগতিতে বৃদ্ধার বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে সে কিছু মিষ্টান্নও সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল, এখন সে তাহা বৃদ্ধাকে আহার করিতে অনুরোধ করিল। তিনি বলিলেন, —"বাবা, এসব বাজারের প্রস্তুত জিনিষ আমি খাইব না।" এই বলিয়া তিনি চাউল ডাইল ধুইয়া রান্না করিতে বসিয়া গেলেন।

এইরূপে সন্ন্যাসী যাহা আনিয়াছিল তাহাতে বৃদ্ধার দুই দিন কাটিয়া গেল। পরে যখন তাঁহার পুনরায় খাদ্যদ্রব্যের অভাব উপস্থিত হইল, তখন সন্ন্যাসীকেই সেই অভাব মোচন করিবার ভার গ্রহণ করিতে হইল। অন্য উপায় নাই দেখিয়া সে নিজেই ছদ্মবেশে হাট হইতে জিনিষ কিনিয়া আনিতে লাগিল। কিন্তু দেশের লোকের এক মহা ভাবনা উপস্থিত হইয়া পড়িল—একা জীবনের মাতা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যক্ত হইয়া কিপ্রকারে দিন কাটাইতেছে। অতএব তাহারা এই মহা-সমস্যা সমাধান করিবার জন্য বৃদ্ধার বাড়ীর চতুর্দ্দিকে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া দিল। পরের উপকার যাহারা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে না, অসৎকার্য্যে তাহারাই উৎসাহের স্রোতে বেশী ভাসিয়া যায়!

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণা রজনীর গাঢ় অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া সন্ন্যাসী হাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। কাঁধে ক্রীত দ্রব্যসকলের একটী ক্ষুদ্র বোঝা, পথ অনুভব করিবার জন্য হস্তে একটী দীর্ঘ যষ্ঠী, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সন্ন্যাসী ভয়ে ভয়ে পথ বাহিয়া চলিয়াছিল; কারণ যেজন্য সে নিজেই মোট বহন করিতেছে তাহা অন্যে জানিতে পারিলে মহা অনিষ্টের সূত্রপাত

হইবার সম্ভাবনা। তাই সে বৃক্ষান্তরালে অদৃশ্য থাকিয়া চলিতেছিল, কিন্তু যেখানে পথটী একেবারে অনাবৃত হইয়া বৃদ্ধার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে আসিয়া সন্ন্যাসী একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া লইল। তৎপর যখন সে দ্রুতপদে অভীষ্টস্থানে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, অমনি বিপরীত দিক হইতে কে এক ব্যক্তি তাহার সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে যায়?" সন্ন্যাসী নিশ্চল, নিস্পন্দ, তাহার বোধ হইতেছিল যেন সমস্ত পৃথিবীটা তাহার পদতল হইতে ক্রমে ক্রমে সরিয়া পড়িতেছে। আগন্তুক অগ্রসর হইয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর মুখের অতি নিকটে চক্ষুস্থাপন করিয়া বলিল —"বুঝিয়াছি, ইহাই তোমাদের গুপ্ত মন্ত্রণা, কিন্তু আমাদের চক্ষে ধূলি দেওয়া কেন? তোমরা ইচ্ছা করিলে ত ইহা প্রকাশ্যেই করিতে পারিতে।" এই বলিয়া সে বিজয়ী বীরের মত সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সন্ন্যাসীর সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া পড়িতেছিল। তাহার কম্পিত হস্ত হইতে মোটটী ভূতলে পড়িয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, আর তাহারই নিকটে উপবেশন করিয়া সন্ন্যাসী আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"হায়! এ কি করিলাম?"

"বেশ করিয়াছ।" এই বলিয়া পশ্চাৎদিক হইতে পাপাত্মা আসিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়া বৃদ্ধার বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মল্লসঙ্ঘের উচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে মল্লসঙ্ঘের বাৎসরিক উৎসবের দিন সমাগত হইল। এই উৎসব ছিল তেজোবন্তের প্রাণের প্রিয়তম সাধনার জিনিষ, প্রতি বৎসর সে তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া ইহার অনুষ্ঠান করিত। কিন্তু এই বৎসর তাহার অবস্থা অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; আজ তাহার সেই উৎসাহও নাই, সেই উদ্যমও নাই; যাদুকরের কলের পুতুলের ন্যায় সে কাজ করিয়া যাইতেছিল মাত্র। পাপাত্মা বুঝিতে পারিয়া একদিন তাহাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিল,—"একি করিতেছ, ভাই! এযে অকালে বিসর্জ্জন করিতে বসিয়াছ দেখিতেছি!" তেজোবন্ত ধীরভাবে উত্তর করিল,—"কাল অকাল আর বুঝিতে পারি কই! কিন্তু তোমাকে আজ একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে।"

পাপাত্মা—"কি ?"

তেজোবন্ত—"বলিতে পার, হিন্দুগ্রামে আমার ন্যায় দ্বিতীয় বীর আর কেহ আছে কি ?"

পাপাত্মা—"কেন, তুমি কি মনে কর যে এই দেশ বীর্য্যবন্ত একমাত্র তোমাকেই প্রসব করিয়াছে ?"

তেজোবন্ত—"আমি সে কথা বলিতেছি না। কিন্তু আমার অভাবে প্রয়োজন হইলে এই দেশ রক্ষা করিতে পারে এমন কেহ আছে কিনা আমি তাহাই জানিতে চাই।" হায়রে দুর্ব্বলতা! মানুষ মরিতে বসিয়াও প্রাণের প্রিয় সাধনাটী পরিত্যাগ করিতে পারে না!

পাপাত্মা শুধু বলিল,—"তা থাকিলেও থাকিতে পারে।" কিন্তু সেই দিনই রাত্রির অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া সে হিন্দুগ্রামে আসিয়া সন্ন্যাসীকে সঙ্ঘের বাৎসরিক উৎসবে যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। জীবনের মাতার জন্য মোট বহিতে যাইয়া সন্ন্যাসী সেই দিনই তাহার কোন প্রতিবেশী কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল।

পাপাত্মার কিন্তু উৎসাহ বাড়িয়া গেল। হিন্দুগ্রামের যেখানে যে বীরত্ব ও সাহসের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, পাপাত্মা তাহাদের সকলকেই যাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। উৎসবের আয়োজনেও সে সর্ব্বান্তকরণে লাগিয়া গেল, যাহাতে কোন বিষয়ে অণুমাত্রও ত্রুটী লক্ষিত না হয়, তাহার জন্য সে প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতে লাগিল। দেখিয়া শ্যামা ভাবিল,—"বটে, বেটা বুড়ো, ভাবিয়াছ আমাদিগকে বাজে কথায় ভুলাইয়া রাখিবে!"

অচিরেই তেজোবন্তের দুর্গের সম্মুখস্থ ময়দানটীকে সমতলভূমিতে পরিণত করিয়া তাহার উপর এক বিস্তীর্ণ পটমণ্ডপ স্থাপিত হইল। মণ্ডপটী বৃত্তাকারে গঠিত হইয়াছিল, উপরের আচ্ছাদনখানা ঘরের চালার ন্যায় অর্দ্ধ-সমকোণে উঠিয়া গিয়া মধ্যদেশে বিভক্ত হইয়া ভিতরে আলো প্রবেশের পথ করিয়া দিয়াছে। চতুর্দ্দিকের বেষ্টনী পশ্চাতে রাখিয়া পরস্পর উচ্চ ধাপ-বিশিষ্ট কাষ্ঠের মঞ্চ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার একদিকে পুরুষগণের বসিবার আসন, অন্যদিক রমণীগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই মঞ্চবেষ্টিত স্থানের উপর উৎসবক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।

উৎসবের অঙ্গও অনেকগুলি। প্রথমতঃ মাঙ্গলিক-ক্রিয়া—ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক দেবতাদিগের পূজা এবং সঙ্ঘের মঙ্গলার্থে বলিপ্রদান। তৎপর বিখ্যাত মল্লগণ কর্তৃক ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন, পরস্পরের সঙ্গে মুষ্টামুষ্টি যুদ্ধ, সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশুগণের সঙ্গে রণ, অশ্বারোহণের দক্ষতা প্রদর্শন, নিপুণতার সহিত শব্দ ও লক্ষ্যভেদ করা, সর্ব্বশেষে সকলে মিলিয়া একটী

কৃত্রিম যুদ্ধে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অভিনয়। দিনের বেলা এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইত, আর রাত্রে উপস্থিত মল্লবীরগণের এবং সমাগত দর্শক-বৃন্দের তুষ্টিসাধন মানসে নৃত্যগীতাদি অনুষ্টিত হইত।

যথাসময়ে উৎসবকার্য্য আরম্ভ হইল। বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে, মঞ্চোপরি যে যাহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। স্তাবকগণ মধুর উদ্দীপনাপূর্ণ সঙ্গীতে সকলের চিত্তবিনোদন করিতেছিল, বাদকগণ যন্ত্রে যন্ত্রে তাল ধরিয়া তাহাতে যোগদান করিয়াছিল, রক্ষিগণ নিঃশব্দে দণ্ডায়মান, মল্লবীরগণ সজ্জীভূত, একটী ইঙ্গিত পাইলেই সেই বিশাল জনতার মধ্যস্থলে যাইয়া যে যাহার অভ্যস্ত কৌশল প্রদর্শন করিবে। উৎকণ্ঠা প্রগাঢ় নিস্তব্ধতার সহিত সেই স্থানে বিরাজ করিতে-ছিল, এমন সময়ে সঙ্কেতসূচক বাঁশি বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে সহস্র হৃদয়ে সেই স্বর প্রতিধ্বনি তুলিয়া বিলীন হইয়া গেল। যাহারা দুর্ব্বল, তাহারা বক্ষে হস্তপ্রদান করিয়া হৃদয়ের স্পন্দন প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, মল্লগণের গ্রীবা উন্নত ও বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে দশ জন বীর অগ্রসর হইয়া প্রাথমিক ক্রীড়া সকল সম্পন্ন করিয়া আরম্ভের সূচনা করিয়া দিল।

উৎসব চলিতে লাগিল। অবশেষে পশুগণের সহিত যুদ্ধের সময় সমাগত হইল। বর্ম্মপরিহিত দুই বীর, হস্তে বর্শা ও কটিদেশে শাণিত ছুরিকা ধারণ করিয়া ধীর পাদবিক্ষেপে রঙ্গভূমির কেন্দ্রস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল; বিপরীত দিক হইতে দুইটী সদাধৃত সিংহ মঞ্চের তলদেশ হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া ক্রিয়াভূমে অবতীর্ণ হইল। আসিয়াই তাঁহারা মনুষ্য-শোণিত-লোলুপ-রসনা প্রদর্শন করিতে করিতে একবার মঞ্চের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া আসিল, পরে বিফল মনোরথ হইয়া অদূরে দণ্ডায়মান মল্লদ্বয়ের প্রতি ধাবিত হইল। একটা দারুণ উৎকণ্ঠা আসিয়া সকলের

হৃদয়ে আঘাত করিতেছিল, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা চতুর্দ্দিক হইতে উত্থিত হর্ষধ্বনির সহিত দূরীভূত হইয়া গেল। সকলে বিস্ময়ের সহিত দেখিল একজন মল্লবীর একটী সিংহকে দক্ষতার সহিত বর্শা বিদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় বীরের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার বর্শা লক্ষ্যচ্যুত হইয়া ভূতলে আমূল বিদ্ধ হইয়া গেল, আর দেখিতে দেখিতে দ্বিতীয় সিংহটী এক লম্ফে আসিয়া তাহার উপর নিপতিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে ভূপতিত মল্লবীরের আর্ত্তনাদে মঞ্চের চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে এক অদ্ভুত-বেশ যুবক দ্রুত পাদবিক্ষেপে সেই ভীষণ দৃশ্যের সম্মুখীন হইল। দুই হস্তে সিংহের লাঙ্গুল আকর্ষণ করিয়া সে রক্তপানোন্মুখ সিংহকে দ্রুতবেগে নিজের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত করিতে লাগিল। অবশেষে যখন সে তাহাকে পরিত্যাগ করিল, তখন দেখা গেল, নিস্তেজ সিংহ ভূপতিত হইয়া রক্তবমন করিতেছে।

মল্লবীরের ভূপ্রথিত বর্শা নিকটেই পড়িয়াছিল। তাহা ক্ষিপ্রতার সহিত গ্রহণ করিয়া সে অবিলম্বে অবশদেহ সিংহের বিনাশ সাধন করিল।

চতুর্দ্দিক হইতে উত্থিত হর্ষ ও করতালি ধ্বনির সহিত দর্শকগণ যুবককে অভ্যর্থনা করিল। সেই ধ্বনি অতুল, মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তাহা মঞ্চ হইতে মঞ্চান্তরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

তেজোবন্ত প্রভূত হর্ষের সহিত যুবকের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল,—"যুবক, তুমি অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছ, আমি তোমার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি।" এই স্থানে বলা উচিত যে এক প্রকার শ্বেত আবরণে যুবকের আপাদমস্তক আবৃত ছিল।

যুবক উত্তর করিল,—"আমি তাহা বলিতে অক্ষম। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমি হিন্দুকুলোদ্ভব।"

তেজোবন্ত—"আমার পক্ষে আজ ইহাই যথেষ্ট, আমি তোমাকে আন্তরিক অভিবাদন করিতেছি।" এই বলিয়া যুবকের অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত করিতে সে মল্লভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ক্রীড়াস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে শান্তা শ্যামাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"সই, এ ব্যক্তি কে ?"

শ্যামা—"কেন, সন্দেহ হইয়াছে নাকি ?"

শান্তা—"বাবার সহিত কথা বলিতেছিলেন, স্বর আমার নিকট অতিশয় পরিচিত বলিয়া বোধ হইয়াছে।"

শ্যামা—"তবে চলনা একবার দেখিয়া আসি।" এই বলিয়া তাহারা যুবকের অনুসন্ধানে যত্নপর হইল। কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও আর কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না। পাপাত্মা শুধু বলিল,—"আবার আসিবে সে।" শুনিয়া তেজোবন্ত বলিল,—"সে যাহাই হউক, আমার সকল সন্দেহ ঘুচিয়া গিয়াছে, পাপাত্মা, তুমি কেরামতকে মুক্ত করিয়া দেও। আজ হইতে আমি এই সঙ্ঘের উচ্ছেদ ঘোষণা করিলাম।"

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পুত্র, পিতা ও মাতা।

লাঞ্ছিতা বড় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার নির্ব্বাসনের দীর্ঘ দীর্ঘ দিনগুলির প্রতিমুহূর্ত্ত সে মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া কাটাইতে ছিল। যখন তাহার সুখ ছিল, তখন তাহার অবসরেরও অভাব হয় নাই, কিন্তু এখন সুখও নাই, তাহার অবসরও নাই! লুকান রত্ন অনুসন্ধান করিতে যাইয়া যেমন হতভাগ্য ব্যক্তি সম্মুখে যাহা পায় তাহাই পরীক্ষা করিতে ব্যাপৃত হয়, লাঞ্ছিতাও সেইরূপ জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ হারাইয়া, সংসারের খুটী নাটী কার্য্যে নিজকে নিয়োজিত করিয়াছিল। তাহার ক্ষুদ্র সংসারের আবশ্যকীয় কাজগুলি সম্পন্ন করিতে তাহার অধিক সময় ব্যয়িত হইত না, কিন্তু যখনই হাতের কাজ প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিত, তখনই ব্যাধ-তাড়িত কুরঙ্গিণীর ন্যায় সে পুনরায় প্রথম হইতে তাহার দৈনিক কার্য্যগুলি আরম্ভ করিয়া দিত। এইরূপে ঘর ঝাট দেওয়া দিনে অনেকবার হইয়া যাইত, উঠান নিকান, তাহারও বিরাম ছিলনা; তারপর অনুষ্ঠিত কার্য্যগুলি পুনঃ পুনঃ সম্পন্ন করিয়াও যখন লাঞ্ছিতা দেখিত যে দিনমণি তখনও অস্তাচলের বহু উর্দ্ধে অবস্থান করিতেছে, তখন সুদুর ভবিষ্যতের অনেক কাল্পনিক অভাবের সৃষ্টি করিয়া সে আপনাকে কর্ম্মসাগরে ডুবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিত। তাহার ভয়, পাছে অবসর পাইয়া মনের সেই বাঘটা আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসে! কিন্তু মানুষের অদৃষ্ট এমনই, যাহার ভয়ে

সে এত সতর্ক, এমন করিয়া নিজকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল, এপর্য্যন্ত একমুহূর্ত্তও সে তাহার অনুসরণ করিতে পশ্চাদপদ হয় নাই! হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে সে যে আঘাত অনুভব করিতেছিল, বাহিরে চক্ষু বুজিয়া থাকিলেই কি সে তাহা ভুলিয়া যাইতে পারে!

ইহা ব্যতীত নিজের শরীরটাকেও শতপ্রকারে নির্য্যাতন করিতে লাঞ্ছিতা কুণ্ঠিত হয় নাই! এমন অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, যখন সারাদিন পরিশ্রমের পর কর্ম্মক্লান্ত দেহটা লইয়া সে উপবাসেই কাল কাটাইয়া দিয়াছে। নিদ্রিত ফকিরের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া যত বিনিদ্র রজনী সে অতিবাহিত করিয়াছে তাহার সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। এইরূপ অত্যাচারে তাহার স্বাস্থ্য ক্রমে ক্রমে ভগ্ন হইয়া পড়িতেছিল। লাঞ্ছিতা তাহা বুঝিতে পারিয়াও কোন প্রতিকারের চেষ্টা করে নাই। অবশেষে যখন সে সত্যই পীড়িত হইয়া পড়িল, তখন তাহার অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন। লাঞ্ছিতা দুরারোগ্য ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার যে বাঁচিবার আশা ছিলনা তাহা বলা যাইতে পারে না, কিন্তু অবস্থা দেখিয়া ফকির সেইরূপ কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারিল না। মাতৃবৎসল ছেলে সে, সংসারে মা বই আর কিছুই জানে নাই, এখনও মাতার আঁচলখানি টানিয়া মাথায় না দিলে তাহার নিদ্রা হইত না, এই অচিন্তনীয় বিপদে সে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। লাঞ্ছিতা রোগশয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, আর তাহারই পার্শ্বে উপবিষ্ট সেবা-নিরত ফকির বাষ্পাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, এইরূপে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে কি?"

লাঞ্ছিতা—"সে কি বাবা, মা কি ছেলেকে চিরদিনই অঞ্চলে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য বাঁচিয়া থাকে!"

ফকির—"তোমার অভাবে যে আমার কর্ম্মজীবন একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া যাইবে।"

লাঞ্ছিতা—"যদি তাহাই হয়, তবে আমার মরণই মঙ্গল। অতি শিশু ছিলে যখন সে সময় হইতে তোমার ত কোন শিক্ষারই ত্রুটী করি নাই আমি, এখন তুমি বড় হইয়াছ, আজও যদি আমার অভাবে তোমার কর্ম্মজীবন বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, তবে দেখিতেছি আমার সকল পরিশ্রমই একেবারে পণ্ড হইয়া গেছে! হারে ফকির, বল্ দেখি তুই সত্যই কি তাই?"

ফকির—"তোমার নিকট আমি তা বই আর কি?"

লাঞ্ছিতা—"আর অন্যের নিকট?"

ফকির—"সে কথা বলিবার সময় ত আমার এখনও উপস্থিত হয় নাই; আমি কি না করিতে পারি তাহা কেমন করিয়া বলিব।"

একটা অব্যক্তহর্ষে লাঞ্ছিতার রোগক্লিষ্ট মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; কিন্তু পুত্রের দিকে চাহিয়াই সেই তৃপ্তির জ্যোঃতি মুহূর্ত্তমধ্যে বিলীন হইয়া গেল। ফকির বলি বলি করিয়াও যেন মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেছিল না। তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া লাঞ্ছিতা স্নেহপূর্ণ-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"হারে বোকা ছেলে, আমি যে তোর্ মা সে কথা ভুলে গেলি নাকি! এমন কি কথা আছে তোর্ যাহা আমার নিকট বলিতে যাইয়া তোর্ মুখ ফুটিয়া বাহির হয় না? ছি! আজ এসময়ে আমার নিকট কিছু লুকাস্‌নে, বাপ।"

ফকির কম্পিতহস্তে অশ্রুমোচন করিতে করিতে বলিল,—"তোমার নিজের জন্য তুমি বাঁচিতে চাহ না, তাহা আমি জানি, কিন্তু আমার দিকে চাহিয়াও কি তোমার বাঁচিবার সাধ হয় না!"

লাঞ্ছিতা একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"কি করিতে বলিস্ তুই?"

ফকির—"একজন চিকিৎসক ডাকি, নতুবা তোমাকে এইভাবে বিদায় দিতে যে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে!"

লাঞ্ছিতা—"চিকিৎসক ডাকিয়া আর কি হইবে? আমার এই শরীরটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঔষধ পূরিয়া দিলেও কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। আর চিকিৎসক ডাকিলেই যদি রোগ সারিয়া যাইত, তবে আর পৃথিবীতে ভাবনা কিসের! সবই ভগবানের হাত, ফকির, যাঁহার আদেশ ভিন্ন একটী তৃণও স্থানচ্যুত হইতে পারে না, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানবের অভ্যস্ত কৌশল কোনপ্রকারে কার্য্যকারী হইতে পারে কি? আমার জন্য ভাবিও না, মৃত্যুর অন্তরালে আমি শান্তির আশ্রয় খুঁজিয়া পাইব; ভগবানকে ডাক, আমার অভাবে যিনি তোমাকে পুত্রাধিক স্নেহে রক্ষা করিবেন।"

ফকির—"যদি ভগবানকে ডাকিতে হয়, তবে তোমার জন্য ডাকাই তাহার শ্রেষ্ঠ সফলতা। মা, আমি চলিলাম, যদি ভগবানের আশীর্ব্বাদ লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারি, তবেই জানিবে আমি তোমার ছেলে, নতুবা তোমার অভাবে জগতের ঐশ্বর্য্যও আমার প্রার্থনীয় নহে।" লাঞ্ছিতা পুত্রকে ফিরাইবার জন্য ডাকিল, কিন্তু ফকিরের কর্ণে সেই স্বর প্রবেশ করিল না।

যেদিন ফেরেস্তাগণ জগতের হিসাব নিকাশ চুকাইয়া বিশ্রাম করিয়া থাকেন, বহরে আজ তাহার বাৎসরিক উৎসবের দিন। বহরের রাজকীয় মসজিদ্ পত্র-পতাকায় সুশোভিত হইয়া বিরাজ করিতেছিল। তাহার নির্ম্মল-সলিল-বিধৌত শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত দেহখানা স্নিগ্ধ কৌমুদীস্নাত সেফালিকা-স্তূপের ন্যায় পবিত্রতার বিমল আভায় ধর্ম্মপ্রাণ উপাসকের হৃদয়ে ভক্তির প্রস্রবণ প্রবাহিত করিতেছিল। বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত অভ্যন্তর-ভাগ প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মির মিশ্র আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া হাসিতেছিল। সম্মুখের শ্যাম-দূর্ব্বাসমাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ ময়দান, পশ্চাতের নির্ম্মল সলিলা দীর্ঘিকা, এবং চতুর্দ্দিকের লৌহ বিনির্ম্মিত বেষ্টনী, লতা-গুল্ম-বৃক্ষ-রাজির সমাবেশে স্থানটীর রমণীয়তা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু বহরের এই সৌন্দর্য্যশ্রেষ্ঠ মন্দিরটী সর্ব্বসাধারণের উপাসনার জন্য

নির্দ্দিষ্ট ছিল না। যাঁহারা জ্ঞানে যশের মন্দিরে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, যাঁহারা দৈবাধীনে রাজা বা রাজপরিবার সংশ্লিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, অথবা যাঁহারা রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী বা রাজানুগ্রহে আমির-ওমরাহ প্রভৃতি আখ্যাবিভূষিত, প্রধানতঃ তাঁহারাই এই মন্দিরে উপাসনা করিবার সম্মানলাভ করিতে পারিত। ইহা ব্যতীত আর এক সম্প্রদায়ের নিকটেও ইহার দ্বার অবারিত ছিল। সংসারে যাহারা দুস্থ বলিয়া পরিচিত, অভাগা যাহারা ভগবানের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে করুণা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত, বিবিধ ধর্ম্মোৎসব ব্যাপারে এই স্থানে তাহাদের আশানুরূপ ভিক্ষালাভ হইত। রাজাদেশে এই মন্দিরে তাহাদের প্রবেশও বারিত ছিল না। ফকির আজ এই মস্‌জিদে দীন ভিখারীর বেশে ভগবানের নিকট মাতার আরোগ্য প্রার্থনা করিতে উপস্থিত হইয়াছে।

তখনও উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় সমাগত হয় নাই। মন্দিরের প্রবেশবর্ত্মে যাত্রীগণের আহ্বান ও সম্ভাষণের কার্য্য অবিশ্রান্ত চলিতে-ছিল। ভিখারিগণ এই দৃশ্যের নিকট হইতে দূরে সরিয়া উদ্যানের এক কোণে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান; উৎসবের ঐ আদিপর্ব্বে তাহারা নিশ্চেষ্ট দর্শকমাত্র। ফকির সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া মন্দিরের অতি নিকটে ভূমিতলে জানু পাতিয়া বসিয়া নিবিষ্টমনে ভগবানকে ডাকিতেছিল। তাহার পরিধানে দীনের বসন, মুখমণ্ডল বিষাদ-কালিমায় অনুলিপ্ত, বক্ষসংলগ্ন অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত যেন প্রচ্ছন্ন প্রভাবে চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারা আকর্ষণ করিয়া ভগবৎ-পদে উপহার প্রদান করিতেছিল! জীবনের সকল বাসনা কেন্দ্রীভূত করিয়া, সর্ব্বশক্তির অনুকূল প্রয়োগে সে যে প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করিতে-ছিল, চিরস্নেহশীল ভগবানের আসন তাহাতে টলিবে না কি?

যথাসময়ে আমির সেই স্থানে উপাসনার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই তাহার উৎসুক-দৃষ্টি ফকিরের উপর নিপতিত

হইল। ফকির তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য, অনুচর-পরিবৃত পিতৃদেবের আগমন পর্য্যন্ত সে জানিতে পারে নাই। আমির কিন্তু দৃষ্টিমাত্রে ফকিরকে চিনিতে পারিয়া বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিল। ফকিরকে তদবস্থায় দেখিয়া একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু বহুকষ্টে প্রাণের উদ্বেল প্রশমিত করিয়া সে দ্রুতপদে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। উপাসনাকালে সেই দিন সে যে কি প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করিয়াছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু উপাসনাবসানে মন্দির পর্য্যবেক্ষণের ছলে সে ঘুরিতে ঘুরিতে ফকিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ফকির তখনও ধ্যানপরায়ণ, একজন অনুচরের আহ্বানে জাগরিত হইয়া সে অবনতমস্তকে পিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। আমির জিজ্ঞাসা করিল,—"ভিখারীর ছদ্মবেশে এই মন্দিরে তুমি প্রবেশ করিয়াছ, কেন?"

ফকির—"আমি যা, ইহা তাহারই উপযুক্ত বেশ। ছদ্মবেশে আমি এখনও অভ্যস্ত হইতে পারি নাই, জনাব।"

আমির—"তবে এখানে আসিয়াছ কেন?"

ফকির—"মাতার মঙ্গলার্থে ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।"

আমির—"কি বলিলে?"

ফকির—"আমার মাতা মৃত্যুশয্যায় শায়িতা, তাঁহার আরোগ্য কামনা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। তাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে এই সংসারে আর কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে?"

আমির স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যে আশঙ্কায় ফকিরকে দর্শনমাত্রে তাহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, ফকিরের নিকট তাহারই অনুরূপ সংবাদ শুনিয়া আমিরের পূর্ব্ব-স্মৃতি বহুদিনের বিস্মৃতির আবরণ ছিন্ন করিয়া তাহার হৃদয়মধ্যে জাগরূক হইয়া উঠিল। "লাঞ্ছিতা মৃত্যুশয্যায় শায়িতা!"—ওগো, এ কথা ভাবিতেও যে তাহার বুক ফাটিয়া

পাইতেছে! যে লাঞ্ছিতা তাহার পরিণীতা ধর্ম্মপত্নী, যে তাহারই জন্য আজন্ম-অর্জ্জিত সংস্কার উপেক্ষা করিয়া হিন্দুর সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল, আজ তাহারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে যাইয়া সে নির্ব্বাসনে মরিতে বসিয়াছে! অনুশোচনায় শান্তিলাভ করিতে যাইয়া আমির দেখিল তাহার অপরাধ অসীম, অনন্ত; সাহায্য প্রদানের সঙ্কল্প করিয়াও সে বুঝিতে পারিল, দৃঢ় শৃঙ্খলে তাহার হস্তপদ আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে! এইরূপে যখন আমির প্রতিকারের কোন পন্থাই খুঁজিয়া পাইল না, তখন সেইস্থানে ফকিরের উপস্থিতিও তাহার নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিল। অমনি সে বলিল,—"দূর হও আমার সম্মুখ হইতে, রাজাদেশে তোমরা নির্ব্বাসিত হইয়াছ, যদি আর কখনও বহরের সীমা মধ্যে তোমাদিগকে দেখিতে পাই, তবে কঠোর রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।"

ফকির অবনতমস্তকে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। যেস্থানে পথ মন্দিরের প্রবেশ-দ্বার অতিক্রম করিয়া রাজবর্ত্মের সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া এক বিপুল জনতা কোলাহল করিতেছিল। ফকির তাহার মধ্যদিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু সেই তুমুল কোলাহলও তাহার সমাধি ভঙ্গ করিতে পারিতেছিল না, পৃথিবী আজ তাহার নিকট লোকশূন্য, জগতের সকল শব্দ তাহার নিকট নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে! এমন সময় এক অতি বৃদ্ধ পুরুষ জনতার মধ্য হইতে বাহির হইয়া ফকিরের হস্ত ধরিয়া বলিল,—"ভাই, বড় লাগিয়াছে কি? এস, আমার সঙ্গে, তোমার মাতার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

তাহার দিকে দৃষ্টি করিবামাত্র ফকিরের রুদ্ধ-অশ্রু বর্ষার বারিধারার ন্যায় প্রবাহিত হইল, অমনি সে লুপ্ত-চেতন হইয়া বৃদ্ধের বাহুমূলে পড়িয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রতিক্রিয়া।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাজপ্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে বসিয়া তিনজন পরামর্শ করিতেছিল। সভাপতি জান্‌বিবি, পার্শ্বে আমির উপবিষ্ট, সম্মুখে কেরামত দণ্ডায়মান। এক হস্তে একটা পোষা সিংহ-শাবকের কেশ আকর্ষণ করিতে করিতে জান্‌বিবি জিজ্ঞাসা করিল,—"এখন, কেরামত, তোমার সংবাদ কি, বল।"

কেরামত মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তাহার দুঃখের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া শুনাইল। সে বলিতেছিল, নছিবের প্রতিকূলাচরণই তাহার পরাজয়ের একমাত্র কারণ, হিন্দুগণ জান্‌বিবির ভয়ে তাহাকে মুক্ত করিয়া দিযাছে, বন্ধনাবস্থায় হিন্দুগণ তাহার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিল, তাহারা মুসলমান ও মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, আর জান্‌বিবিকে ঘৃণা করে। কারাবাস হইতে মুক্ত হইয়া কেরামতের ইহাই প্রথম জান্‌বিবি সম্ভাষণ।

জান্‌বিবি নির্ব্বাক হইয়া শুনিতেছিল, যখন কেরামত তাহার কাহিনী নিঃশেষ করিয়া আদেশ অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল, তখন জান্‌বিবি একটা বহুকালরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—"কেরামত তোমার সংবাদ উত্তম! তোমার প্রতি নির্য্যাতন করিয়া হিন্দুগণ মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিয়াছে। এখন হইতে আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব। দেখ, পৃথিবী হইতে হিন্দু ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিতেই মুসলমানের সৃষ্টি হইয়াছে, ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতি অনুপরমাণু হিন্দু-বিদ্বেষ-বিষে গঠিত, আর এই বিষ আজ হইতে আমাদের মজ্জাগত হইয়া রহিল। অর্দ্ধছিন্নগ্রীব পশুর ন্যায় নিষ্পেষিত হিন্দুগণকে জগতের সমক্ষে নিক্ষেপ

করিতে হইবে, যেন সকলে প্রত্যক্ষ করে শুধু রক্তেই মুসলমানের প্রতিহিংসা পরিতৃপ্ত হয় না। যাও, কেরামত, বহরের ঘরে ঘরে আমার এই ঘোষণা প্রচার করিয়া দেও।"

অমনি বাধাদিয়া আমির বলিল,—"ছিঃ জীবন, আমরা কি উভয় সম্প্রদায় এক আধারে মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে পারি না?"

জান্‌বিবি—"মূর্খ তুমি! পৃথিবীর এমন আধার কোথায়, যাহার সহায়তায় সে প্রতিদ্বন্দ্বী আমাদিগকে নিজের বক্ষোপরে তুলিয়া লইবে! যদিও লয়, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সেই বক্ষ মুহূর্ত্তমধ্যে ধূলিকণায় পর্য্যবসিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।"

আমির—"জীবন, এখনও বিবেচনা করিয়া দেখ তুমি কোথায় চলিয়াছ।"

জান্‌বিবি—"তুমি বিবেচনা করিতে পার, তোমার অগ্রজ হিন্দুগ্রাম শাসন করিতেছে, কিন্তু সমগ্র মুসলমান জাতির পক্ষ হইয়া আমার এতটা চিন্তা করিবার অবসর কোথায়?"

আমির—"জানিনা, জীবন, মুসলমানজাতি আমাদের নিকট কি প্রত্যাশা করে?"

জান্‌বিবি—"ভীরুতা—নিশ্চয়ই নহে।"

আমির—"অবিমৃশ্যকারিতা কি?"

জান্‌বিবি—"চুপ রহো, এত জ্ঞান হইয়াছিল ত মুসলমান হইতে আসিয়াছিলে কেন?"

আমির দমিয়া গেল। এইরূপে অপদস্থ হইয়া তাহার আর প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা রহিল না। মানুষের এমন একটা সময় আসে যখন নেশা ছোটে ছোটে ছোটে না, পা চলে চলে চলে না, চক্ষু ফুটিয়াও আবার মুদিয়া আসে। আমিরও এখন ঠিক সেই অবস্থায় নিপতিত! আজ

ফকিরের নিকট মসজিদে লাঞ্ছিতার অবস্থা সম্বন্ধে সে যাহা শুনিয়াছিল, শতচেষ্টাসত্ত্বেও সে তাহা ভুলিতে পারে নাই। সে এখন বুঝিতে পারিতেছে কিছুই ভাল হইতেছে না, অথচ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাও তাহার নাই! আমির কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিল, পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সে অদৃশ্য হইলেই জান্‌বিবি কেরামতের দিকে চাহিয়া বলিল,—"হিন্দুর ছেলে কিনা, এখনও নিরামিষ আহারের প্রভাবটা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। তা থাক্, কিন্তু কেরামত, তুমি কি করিবে?" কেরামত তিনবার কুর্ণিস করিয়া বলিল,—"গোলামের অন্য অভিলাষ নাই, বেগম সাহেবার কার্য্যেই সে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছে। আমার প্রাণের চেয়ে বেগমের কাজ অধিক মূল্যবান বলিয়া মনে করি।" জান্‌বিবি—"বাহাবা কেরামত! তুমিই উপযুক্ত, তুমিই বীর! আজ আবার আমি আশান্বিত হইলাম। যাও, কেরামত, কঠোর অনুসন্ধান আরম্ভ কর, গত যুদ্ধে যাহারা আমাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; ইহাতে শত্রু মিত্র বিবেচনা করিও না। পৃথিবীর সম্মুখে বিভীষিকার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে হইবে, নতুবা আমার পিপাসার শান্তি হইবে না।" এই বলিয়া সে দ্রুতবেগে গৃহহইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

আর কেরামত, হতভাগিনী বেহুনাকে তাহার সকল লাঞ্ছনার কারণ মনে করিয়া, তাহার ধ্বংস সাধনে ধাবমান হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বেহুনার নির্ব্বাসন।

বিনিদ্র রজনী যখন প্রভাতের কাকলিতেও সুপ্তিভঙ্গের সূচনা করে নাই, অনপগত-ক্লান্তি বেহুনা তখন শয্যা পরিত্যাগ করিয়া গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে। রাত্রির শেষভাগে উঠিয়া তাহাকে গোখানার তত্ত্বাবধান করিতে হইত। তখনকার সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের গো-ধন একটা গর্ব্বের সামগ্রী ছিল, কেরামতের ন্যায় মর্য্যাদাভিমানী ব্যক্তিও গোপালন হেয় কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিত না। বেহুনার তত্ত্বাবধানে অর্পিত গাভী গুলির প্রভাতের আহার্য্য তাহাকে নিশাবসানে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইত। এই সকল গাভীর দুগ্ধ কেরামতের বেগমগণের সেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। বেহুনা এখন তাহাদের আজ্ঞাধীনা দাসী, সপত্নী নির্য্যাতনে তাহারা কখনও পরাঙ্মুখ নহে, বিশেষতঃ কেরামত বেহুনার সম্বন্ধে সম্পূর্ণই উদাসীন। নির্য্যাতনের এমন সুযোগ ভারতের কোন্ রমণী সহসা পরিত্যাগ করিয়া সপত্নী-স্নেহের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন? তাই দ্রৌপদীর ন্যায়, পঞ্চ স্বামীর পরিবর্ত্তে বেহুনাকে বহু স্বামিনীর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইত। সে যে কি সুখ, তাহা দুই একজন পাঠিকা অবস্থাভেদে এখনও বুঝিতে পারিতেছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

পাণ্ডুবরণ উষারাণীর রঞ্জিত অলকাবলী যখন অনুসরণ-তৎপর সূর্য্যদেবের দীর্ঘশ্বাসে সহসা উৎক্ষিপ্ত হইয়া দৃশ্যমান জগতের পূর্ব্বপ্রান্ত ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে, বেহুনা তখন তন্দ্রাসক্ত সপত্নীগণের দ্বারে দ্বারে ঘটপূর্ণ করিয়া জল রাখিয়া দিতেছিল। শূন্যগর্ভ ঘট জলধারা দ্বারা পূর্ণ করিবার কালে তাহা হইতে যে স্বাভাবিক শব্দ উত্থিত হইতেছিল,

কেরামতের প্রথম স্ত্রীর তাহাতে নিদ্রাভঙ্গ হইল। আরামের ব্যাঘাত হওয়াতে দলিতাফণিনীর ন্যায় শয্যার উপর উপবেশন করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেরে ?"

বেহুনা নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—"আমি।"

"তা কি আর বুঝিতে আমার বাকী আছে! তুই পোড়ামুখী, এ সময়ে জ্বালাতন করিতে এলি কেন ?"

"আমি জল ধরিয়া রাখিতে'ছ।"

"রাথার শ্রী দেখ! যেন বর্ষার নদী পাহাড় ভাঙ্গিয়া ছুটিয়াছে! বলি, একবার এদিকে এলি ?"

আহ্বানমাত্রে বেহুনা কম্পিতপদে গৃহাভ্যন্তরে যাইয়া উপস্থিত হইল। তন্দ্রাজড়িত ঢুলু ঢুলু নেত্রে গৃহস্বামিনী অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় দক্ষিণ করতলে মস্তক রক্ষা করিয়া, বাম হস্তের অঙ্গুলী সঞ্চালনে একটা উন্মুক্ত জানলার প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—"এই জানালাটা, সারারাত্রি এইরূপ ভাবেই খোলা রহিয়াছে, আর রাত্রের শীতল বাতাস গায়ে লাগিয়া আমার সমস্ত শরীরে বেদনা ধরিয়া গেছে। এখন বল্ দেখি এইরূপ ভাবে জ্বালাতন করিয়া তোর্ কি লাভ ?"

"এই জানালা ত আমি খুলিয়া রাখি নাই।"

"কিন্তু খুলিয়া আছে কিনা তাহাত তোর্ দেখা উচিত ছিল ? যা'র যে কাজ সে তাহা করিবে। আমিও কি তোর্ মত দাসীপনা করিতে যাইব নাকি ?"

বেহুনা নির্ব্বাক প্রস্তরময় মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু প্রধানা বেগম তাহার এই নীরবতা সহ্য করিতে পারিল না। বেগে শয্যা হইতে উঠিয়া সে কেশাকর্ষণে বেহুনাকে গৃহতলে পাতিত করিল, পুনরায় যখন তাহাকে তুলিয়া সে প্রহার করিতে যাইবে, এমন সময়ে গৃহান্তর হইতে

একটা আহ্বান আসিয়া তাহার শ্রুতিমূলে প্রবেশ করিল। মেজ বেগম বেতুনাকে ডাকিতেছিল। প্রধানা বেগমের এমন সাহস হইল না যে আর এক মুহূর্ত্তও বেতুনাকে তাহার কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া রাখে, কারণ মেজর সঙ্গে সে কিছুতেই পারিয়া উঠিত না, এবং উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতিও ছিল না। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের কবল-প্রাপ্ত শিকারকে অনিচ্ছাসত্ত্বে পরিত্যাগ করার ন্যায়, প্রধানা বেগম বেতুনাকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় শয্যার উপর আসিয়া উপবেশন করিল। রাগে তাহার শরীর কাঁপিতেছিল, ধমনীর সমস্ত রক্ত বিদ্যুৎবেগে চালিত হইয়া তাহার আয়তচক্ষু দুটীর স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে ফুটিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছিল। বেতুনার কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না, হৃদয়ের অপরিমিত বেদনারাশির ক্ষিপ্ত উদ্বেল প্রভূত সহিষ্ণুতার সহিত প্রশমিত করিয়া, সে ত্বরিতগতিতে মেজ বেগমের আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পৃথিবীতে এমন লোকও আছে, যাহারা গন্ধকের ন্যায় সামান্য উত্তাপেই অগ্নিকাণ্ড করিয়া বসে। যেখানে অঙ্কচ্যুত লতাটীকে বৃক্ষগাত্রে জড়াইয়া দিলেই অনায়াসে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, সেখানে তাহারা কুটীল ভ্রূকুটীর সহিত তরুমূল উন্মূলিত করিয়া নিজের গন্তব্য পথ পরিষ্কার করিয়া থাকে। এইরূপ একটী অগ্নিময় ছাচে ঢালিয়া ভগবান মেজ বেগমকে গঠন করিয়া ছিলেন। হতভাগিনী বেতুনা, প্রধানা বেগমের পরিচর্য্যা করিতে যাইয়া, তাহার মুখ প্রক্ষালনের জল রাখিয়া যাইতে পারে নাই, মেজ বেগমের নিকট ইহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া প্রতীয়মান হইল! বেতুনা সবেমাত্র তাহার গৃহমধ্যে একপদ অগ্রসর হইয়াছে, অমনি সে আঘাতপ্রাপ্ত ভুজঙ্গীর ন্যায় গ্রীবা বাঁকাইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল,—"এতবেলা হইয়াছে, অথচ আমার ঘরে আজ জল খুজিয়া পাইনা কেন?"

বেতুনা—"বড় বেগমের পরিচর্য্যা করিতে যাইয়া দেরী হইয়া গিয়াছে।"

মেজ—"কি বলিলি ?"

বেহুনা ভয়ে ভয়ে তাহার কথার পুনরুক্তি করিল। শুনিয়া মেজ বেগম জলদগম্ভীরস্বরে বলিল,—"তবে রে একচখো মাগী, বড় বেগমের পরিচর্য্যা করিতে পার, আর আমরা বুঝি এই বাড়ীতে তোর্ মত কেনা বাঁদী হইয়া আসিয়াছি! তোর্ বড় স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে, এই অবহেলার এই শাস্তি!" এই বলিয়া সে দেখিতে দেখিতে বেহুনার উপরে আসিয়া পড়িল, এবং তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া নিষ্ঠুর প্রহারে তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। অবশেষে যখন বেহুনা "মাগো" বলিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, মেজ বেগম তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া একেবারে বড় বেগমের আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারের পার্শ্বেই জলপূর্ণ ঘট রক্ষিত হইয়াছিল। মেজ বেগম পদাঘাতে তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলিল, তখন বড় বেগমও রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু এ সকল আখ্যায়িকা বর্ণনা করা আমাদের গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে।

এইরূপে বেহুনা সপত্নী সহবাসে কাল কাটাইতেছিল। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব যতগুলি উৎকর্ষের অধিকারী হইতে পারে, বেহুনাতে তাহার প্রত্যেকটীই পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল; এখন সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া সে দেখিল তন্মধ্যে দুইটীমাত্র তাহার জীবনধারণের সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে! একটী তাহার অদমনীয় সহিষ্ণুতা, অপরটী তাহার অনুপম সৌন্দর্য্য। নিজের পূর্ব্ব গৌরব বিস্মৃত হইয়া সে যে পরসেবাব্রতে নিজকে নিয়োজিত করিয়াছিল, তাহার প্রতি মুহূর্ত্তে অপমান ও অত্যাচারের নির্ম্মম আঘাতে যখন তাহার হৃদয় বিধ্বস্ত হইয়া যাইবার উপক্রম হইত, তখন একমাত্র অমানুষিক ধৈর্য্যকেই অবলম্বন করিয়া সে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইত। আর, তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যও তাহার এই বিষাদময় জীবনকে কখন কখন সুখের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিত। অবশ্যই

রূপের ব্যবসায় করা তাহার অভ্যাস ছিল না। কিন্তু ভাগ্যচক্রের বিচিত্র আবর্ত্তনে যে অতুল রূপরাশি তাহার সকল দুর্ভাগ্যের সূচনা করিয়া দিয়াছিল, এখন সেই রূপরাশির আকর্ষণেই দুই একটা মিঠা কথা, একটু উচ্ছৃষ্ট স্নেহ দৈবাৎ তাহার ভাগ্যে আসিয়া জুটিত। কেরামত তাহার এই রূপ মদিরা পান করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আসিয়া বেহুনাকে অনুগৃহীত করিয়া যাইত। ইহাকে তোমরা সুখ বলিতে চাও বলিতে পার, কিন্তু বেহুনার নিকট সেই আদর, সেই স্বার্থপূর্ণ লালসাময় স্নেহ, নিতান্ত অপ্রীতিকর যন্ত্রণা বিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরিণীতা পত্নী সে, সে কি শুধু রূপ বিলাইয়াই পরিতৃপ্ত হইতে পারে! কিন্তু তাহার অদৃষ্টে যাহা জুটিতেছিল তাহাতেই সে নিজকে ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিত। এই অবস্থায় অধিক আশা করাও তাহার ধৃষ্টতা মাত্র।

যেদিন হিন্দুমুসলমানের যুদ্ধে নছিবের বিপক্ষতায় কেরামতের দর্প চূর্ণ হইয়া গেল, সে দিন নছিবের বড় আনন্দের দিন। নছিব প্রভূত তৃপ্তির সহিত এই সংবাদ বহন করিয়া বেহুনার সহিত আসিয়া নিভৃতে সাক্ষাৎ করিল। তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবার পরে ইহাই পিতাপুত্রীর প্রথম সাক্ষাৎ, নছিব আশা করিয়াছিল তাহার এই সাফল্যের সংবাদে উৎফুল্ল বেহুনাকে বক্ষে ধারিয়া সে জন্মের মত একদিকে ছুটিয়া পলাইবে। অন্ধকারময় রাত্রি, প্রায় দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, বেহুনা গৃহকার্য্য সমাপনান্তে পুকুরে গা ধুইতে যাইতেছিল, এমন সময় নছিব আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। বেহুনা অতিমাত্র ভীত হইয়া প্রস্থান করিতেছিল, কিন্তু অগ্রসর হইয়া নছিব বলিল,—"বেহুনা, মা আমার, এ'যে আমি।"

বেহুনা—"বাবা! বাবা! আজও তুমি জীবিত আছ! কিন্তু আর কি দেখিতে আসিয়াছ, বাবা!" এই বলিয়া বেহুনা পিতার কণ্ঠলগ্ন হইয়া অজস্র অশ্রুস্রোতে তাহার বক্ষ সিক্ত করিয়া দিল।

নছিব আদরিণী কন্যার রুক্ষ চুলগুলি যথাস্থানে বিন্যস্ত করিতে করিতে বলিল,—"বেহুনা, আর নয়, আর তোকে কাঁদিতে হইবে না, আজ আমাদের সকল দুঃখের অবসান করিয়া আসিয়াছি।"

পিতার কথা শুনিয়া একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় মুহূর্ত্ত মধ্যে বেহুনার জড়ভাব দূরীভূত হইয়া গেল। নছিবের ক্রোড় হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি করিয়াছ, বাবা?"

নছিব—"যে রাক্ষস তোর্ গর্ভধারিণীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া তোকে কড়িয়া লইয়া আসিয়াছে, যাহার প্রতারণায় আমি সর্ব্বস্ব হারাইয়া পাগলের মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, আজ যুদ্ধে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছি। সেই পাপিষ্ঠ আজ আহত ও বন্দী। হিন্দুর হস্তে তাহার নিস্তার নাই।"

শুনিবামাত্র বেদনা অস্ফুট চীৎকার করিয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কাতরকণ্ঠে বলিল,—"কেন এ কাজ করিলে, বাবা?"

নছিব—"প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ! কিন্তু এখনও কেরামতের রক্তে স্নান না করিতে পারিলে যে আমার এই জ্বালা নির্ব্বাপিত হইবে না।"

বেহুনা চীৎকার করিয়া বলিল,—"বাবা, রক্ষা কর তাঁহাকে, বাঁচাও, আমি যে তাঁহার..." বেহুনা আর বলিতে পারিল না, চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। নছিব কিছু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—"কি বলিলি?"

বেহুনা—"ওগো, সে আমার স্বামী, আমার এত যন্ত্রণার মধ্যেও একদিন তাঁহার অমঙ্গল কামনা করিতে পারি নাই।"

সহসা সম্মুখে বজ্রপাত হইলেও নছিব এতদূর চমকিত হইত না, সে কিছুকাল হতবুদ্ধি হইয়া বেহুনার দিকে চাহিয়া রহিল, পরে রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন এ কাজ করিলি, পাপিয়সি?"

বেহুনা—"নতুবা আজ যে আমাকে সর্ব্বস্ব হারাইয়া রমণীর অধম

হইয়া বাস করিতে হইত। বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, বাবা, তাহাকে বাঁচাইতে হইবে।"

নছিব—"হাঃ! হাঃ! হাঃ! আমার মেয়ে তুই, কেরামতের অঙ্গশায়িনী হইয়াছিস্! বেশ, বেশ, বেশ! কর্ণ আমার বধির হও, পৃথিবীর আর কোন শব্দ গ্রহণ করিও না; চক্ষু আমার অন্ধ হইয়া যাও, পৃথিবীর জ্বালাময় প্রতিবিম্ব আর গ্রহণ করিয়া কাজ নাই! আমার মেয়ে, কেরামতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া আমারই নিকটে প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে! হাঃ! হাঃ! হাঃ। আমার কেহ নাই, জগতে আমার কেহ নাই গো!" বলিতে বলিতে নছিব পাগলের মত সেই অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

এইরূপে বেদুনা দেখিল হঠাৎ দুইদিক হইতে তাহার দুইটী আশ্রয় অপসৃত হইয়া গেল। আজ যে চলিয়া গেল সে আবার আসিতে পারে, কিন্তু যাহার আভাস দিয়া গেল যদি তাহা সত্যই কার্য্যে পরিণত হয়? বেদনা আর ভাবিতে পারিল না। সেই প্রস্তরময় উপাধানে মস্তক রক্ষা করিয়া সে রাত্রিটা কাটাইয়া দিল।

তারপর অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে; এই কয় দিন বেদুনা কলের পুতুলের ন্যায় কার্য্য করিয়া যাইতেছিল। কিন্তু কেন, তাহা জগতে কয় জন লোকে বুঝিতে পারিবে? যাহার জন্য বেদুনা সমস্ত পূর্ব্বস্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়াছিল, প্রগাঢ় পিতৃস্নেহ অকাতরে বিসর্জ্জন করিয়াছে, সেই কেরামতও তাহাকে চিনিতে পারিল না, একবার ভাবিল না, বেদুনা তাহার কে! তাই নিজের পরাজয়ের জন্য বেদুনাকেই সর্ব্বপ্রথম দোষী সাব্যস্ত করিয়া সে বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেদুনার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ, তাহার পিতা হিন্দুপক্ষ সমর্থন করিয়া কেরামতকে লাঞ্ছিত করিয়াছে। বেদুনার সপত্নীগণ প্রভৃত নির্য্যাতনের পর লৌহশলাকা উত্তপ্ত করিয়া তাহার সর্ব্বশরীর চিহ্নিত করিয়া দিল। তারপর কেরামত

স্বয়ং দণ্ডদাতাবেশে বেহুনার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া অতিশয় রুক্ষস্বরে ডাকিল,—"বেহুনা?"

বেহুনা উত্তর করিল,—"কেন প্রভু?"

কেরামত—"ভুলিয়া যাও বেহুনা, তোমার সঙ্গে আমার কোনকালে ওরকম সম্বন্ধ ছিল। নছিবের মেয়ে তুমি, যে দিন তোমার ইন্দ্রজালে বিমোহিত হইয়া দীন ভিখারীর ন্যায় অনুমাত্র কৃপা ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম, সে দিন আমি দাস ও তুমি প্রভু হইয়াছিলে। কিন্তু ছিলে ভাল, আমি বুঝিতে পারি নাই, তাই তোমার মত কালসাপিনীকে গৃহে তুলিয়া আনিয়াছিলাম!"

বেহুনা—"সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সে বেহুনা বহুদিন মরিয়া গিয়াছে। তবে আর ও কথা কেন প্রভু? এ বেহুনা তোমার চরণ ভিন্ন আর কিছু জানিতে শিখে নাই, তাহার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধের বিচার করিতে যাইয়া সে নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে।"

কেরামত—"তাই তাহার পিতা বিধর্ম্মীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া আমার অস্তিত্ব লোপ করিতে প্রয়াস পায়! বেহুনা, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম।"

বেহুনা তাহার বেদনাকাতর দেহটাকে বহন করিয়া আনিয়া কেরামতের পদতলে নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"ক্ষমা কর প্রভু, সেই অপরাধও আমার। পৃথিবীতে যত প্রকার কঠোরতম শাস্তি প্রচলিত আছে—অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত করিয়া, অথবা ব্যাঘ্রকবলে, হস্তীপদতলে বা সর্পমুখে নিক্ষেপ করিয়া, প্রচলিত, অপ্রচলিত বা নব-উদ্ভাবিত যে কোন প্রকার কষ্টদায়ক শাস্তি হইতে পারে—আমাকে তাহাই প্রদান কর, আমি অকাতরে সহ্য করিব, কিন্তু এমন নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে রমণীজাতির অধম করিয়া দিও না।"

কিন্তু পর্ব্বত টলিল না, কেরামত সর্ব্বসমক্ষে তাহাকে যথারীতি পরিত্যাগ করিয়া, তাহার মুণ্ডিত মস্তকে ঘোল ঢালিয়া দিল। তৎপরে অর্দ্ধবসন পরিধান করাইয়া শত করতালির মধ্যে তাহাকে বেত্রাঘাতে পুরীর বাহির করিয়া দিল।

বেহুনা তখন উন্মাদিনী, একটা প্রবল ঝড়ের তরঙ্গের মত সে ছুটিয়া চলিয়াছিল। যে অসহনীয় জ্বালায় তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, বেহুনা কোথাও তাহার আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া পাইতেছিল না। পথে যাহা পড়িতে-ছিল, তাহাই সে আলিঙ্গন করিয়া মলিন করিয়া দিতেছিল। দূর হইতে নছিব ইহা দেখিতে পাইয়া বেহুনার সম্মুখবর্ত্তী হইল। বেহুনা তাহারও কণ্ঠলগ্ন হইয়া একটু রোদন করিল, কিন্তু নছিব তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। নছিব বুঝিল, তাহার জ্বলন্ত হৃদয়ের উত্তাপের চেয়েও কত কঠোর তীব্রজ্বালা বেহুনা হৃদয়ে পোষণ করিতেছে! বেহুনা পুনরায় ছুটিয়া চলিতেছিল, নছিব কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—"যাও বেহুনা, জগতের ঘরে ঘরে তোমার এই বিষাদ-কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া শান্তিলাভ করগে। যদি বহরের একটী হৃদয়েও প্রতিধ্বনি তুলিতে পার, আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি—আবার স্রোত ফিরিবে!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ব্যাধির ঔষধ।

এলেমের আশ্রয়দাতা বৃদ্ধ সংজ্ঞাশূন্য ফকিরকে লইয়া নিজ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে এলেমের শুশ্রূষার গুণে ফকির শীঘ্রই চেতনা ফিরিয়া পাইল, কিন্তু তখনও তাহার আতঙ্ক দূরীভূত হয় নাই; দেখিয়া এলেম বলিল,—"ছিঃ, তোমার এই দুর্ব্বলতা পুরুষের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে! শিক্ষিত হইয়াছ তুমি, আজও যদি যে কোন আঘাতে এমনি ভাবে নুইয়া পর, তাহা হইলে শক্তি জগতে আর কোন্ আশ্রয়ে বিকশিত হইবে? আমি তোমাকে এতটা কোমল বলিয়া আজও ভাবিতে পারি নাই।"

ফকির—"বুঝিতে পার নাই, এলেম, পৃথিবীতে মা ভিন্ন আমার আর আছে কে?"

এলেম—"হ'তে পারে, তুমি মা দেখিয়াছ; কিন্তু আমি মাও দেখি নাই, বাবাও দেখি নাই; আমার মাতাপিতার মূর্ত্তি কল্পনা করিতে যাইয়া আমি জগতটাকেই ধরিয়া বসি। চল, আজ তোমার মাকে দেখিয়া আসি।"

ফকির কিছু সুস্থ হইয়াই এলেমের অনুগমন করিল। যখন তাহারা লাঞ্ছিতার আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন লাঞ্ছিতাও অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহার শয্যাপার্শ্বে ওকে উন্মাদিনী মূর্ত্তিতে বসিয়া আছে! ফকির বিস্মিত হইয়া ভাবিল এই নির্জ্জনস্থানে স্বয়ং বনদেবী ভিন্ন আর কে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য উপস্থিত

হইবে ! কিন্তু এলেম যাইয়া ভক্তিভাবে লাঞ্ছিতার পদবন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, এ কে ?"

লাঞ্ছিতা—"এ আমারই মত আর এক অভাগিনী, মা। বহুরের বীর-পুত্র কেরামতের পরিণীতা ধর্ম্মপত্নী। কিন্তু হতভাগিনীর দুঃখে আমার হৃদয়েও শান্তি আসিয়া পড়িয়াছে !" এই বলিয়া তিনি বর্ণনা করিতে লাগিলেন ;—

ফকির চলিয়া গেলে লাঞ্ছিতা রোগ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল, আর ভাবিতেছিল নিঃসহায় বালক ফকির তাহার আরোগ্য কামনা করিয়া এমন উন্মাদের মত কোথায় চলিয়া গেল ! এমন সময় বেহুনা ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া একেবারে লাঞ্ছিতার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বেদনা-কাতর মুখ ও উন্মাদের ন্যায় উদাস-দৃষ্টি দেখিয়া লাঞ্ছিতা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল,—"মা, তুমি কে ?"

অমনি বেহুনা একটা অট্টহাসি হাসিয়া বলিল,—"আমি বেহুনা গো, আমি বেহুনা ! আমাকে জানিতে চাও ? তবে এই দেখ আমি কে ?" এই বলিয়া বেহুনা লাঞ্ছিতার একটা হাত টানিয়া লইয়া তাহার বুকের উপর ধরিয়া রাখিল।

লাঞ্ছিতা অনুমাত্রও হতবুদ্ধি হইল না, সে দৃঢ়মুষ্টিতে বেহুনাকে আকর্ষণ করিয়া তাহার পার্শ্বে বসাইল। সেই কর-নিপীড়নে বেহুনার সমস্ত শরীরে কি যে শান্তির তরঙ্গ প্রবাহিত হইল তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু দেখা গেল বেহুনা অনেকটা সংযতভাবে বসিয়া লাঞ্ছিতার মুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছে। লাঞ্ছিতা পুনরায় স্নেহপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, তুমি কি আমারই মত দুঃখ-নিমজ্জিত কোন হতভাগিনী ? নতুবা···"

বেহুনা বাধা দিয়া বলিল,—'নাগো, না, আমি হতভাগিনী নই ! আমার বাবা আমাকে অতি যত্নের সহিত স্নেহের ক্রোড়ে মানুষ করিয়া-

ছিলেন, ভগবানের কৃপায় আমার ধন, ঐশ্বর্য্য, স্নেহ, মমতা, কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু তিনি একটা ভুল করিয়াছিলেন, এই যে দেখ শরীরটা, এই শরীরটা তখন এমন ছিল না ; রূপের যতখানি একটা শরীরে ধরিতে পারে, তাহার অনেক বেশী তিনি আমাকে দিয়াছিলেন। তারপর একটা সর্পের সহিত আমার দেখা হইল, তাহারই বিষের জ্বালায় সমস্ত শরীরে চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে।" এই বলিয়া বেহুনা তপ্তশলাকা-চিহ্নিত দাগগুলি লাঞ্ছিতাকে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

লাঞ্ছিতা কিছুই বুঝিতে পারিল না ; পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,— "তোমার বাবার কথা বলিতেছ, কে তিনি ? কোথায় থাকেন ?" কিন্তু বেহুনা কোনই উত্তর করিল না, এক দৃষ্টে লাঞ্ছিতার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল।

লাঞ্ছিতা বুঝিল বেহুনার এই কষ্ট প্রকাশ করিবার নহে, অদমনীয় আবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাকে একটু প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল,—"মা তুমি কিছু খাবে ? বোধ হয় বহুদিন তোমার কিছুই খাওয়া হয় নাই ?"

বেহুনা উত্তর করিল,—"ভুলে গেছি।"

লাঞ্ছিতার কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। অতিশয় যত্নের সহিত নিকটে বসিয়া সে তাহার রোগীর পথ্য ও ফলমূলাদি যাহা গৃহে সঞ্চিত ছিল তাহা বেহুনাকে খাওয়াইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করিয়া একে একে তাহার সমস্ত সংবাদ বাহির করিয়া লইল। যখন শুনিল যে বেহুনা নছিবের মেয়ে এবং কেরামতের পরিণীতা পত্নী, স্বামী তাহাকে নিষ্ঠুর নির্য্যাতনে উন্মাদিনী করিয়া গৃহের বাহির করিয়া দিয়াছে, তখন লাঞ্ছিতার নিজের দুঃখ অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল। প্রগাঢ় সমবেদনার সহিত বেহুনাকে বুকে ধরিয়া সহস্র চুম্বনে সে তাহার গণ্ডদেশ রক্তিমাভ

করিয়া দিল। এমন আদর বেতুনা অনেক দিন উপভোগ করিতে পায় নাই, তাহার বিকারাবস্থা অনেকটা প্রশমিত হইয়া আসিল; লাঞ্ছিতার বুকে মাথা রাখিয়া সে অজস্র অশ্রুস্রোতে তাহার বক্ষ সিক্ত করিয়া দিল।

দুইটী বেদনাভরা হৃদয়ের এইরূপ অচিন্তনীয় সাক্ষাতে উভয়েরই চিত্তের সমতা সম্পাদিত হইল। লাঞ্ছিতার নিকট তাহার নিজের দুঃখ অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু বেতুনার সঙ্গে তুলনা করিয়া, সে এখন নিজকে অনেক ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিষের জ্বালাও অন্তর্হিত হইয়া গেল। যদি জ্বালাই না থাকিল, তবে আবার দুঃখ কি? লাঞ্ছিতা সেই মুহূর্ত্ত হইতে নিজকে অনেকটা সুস্থ বলিয়া বোধ করিল। আর বেতুনা? বহুদিন পরে আজ সে একটু শান্তির আশ্রয় পাইয়াছিল, কাঁদিয়াও দুঃখের ভার সে অনেকটা লাঘব করিতে পারিয়াছে, তাহারও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছিল। এমন সময় ফকির ও এলেম সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

বেতুনার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া এলেম বিস্ময়ের সহিত বেতুনাকে দেখিতে লাগিল। তাহার অঙ্গের দাগগুলি নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার সপত্নীগণ তোমাকে এইরূপ যন্ত্রণা দিয়াছে?"

বেতুনা কোন উত্তর করিতে পারিল না; সতীনদের কথা মনে হইতেই তাহার গাত্র শিহরিয়া উঠিল।

এলেম পুনরায় প্রশ্ন করিল,—"আর তোমার স্বামী তোমাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে?"

বেতুনা আর বসিতে পারিল না, লাঞ্ছিতার দিকে চাহিতে চাহিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দ্রুতবেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

লাঞ্ছিতা আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া বলিল,—"বেতুনা, বেতুনা বেতুনা, দাঁড়াও।"

বাহির হইতে একটা শব্দ আসিল,—"আবার আমি আসিব, মা।" কিন্তু কেহই আর বেতুনাকে খুঁজিয়া পাইল না।

লাঞ্ছিতা বেতুনার জন্য বড়ই কাতর হইয়া পড়িলে তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া এলেম বলিল,—"আক্ষেপ করিও না, মা, বেতুনার যাওয়াই মঙ্গল। বহরের ঘরে ঘরে যাইয়া বেতুনা তাহার এই দুঃখের কাহিনী বিবৃত করুক, লোকে বুঝিতে পারিবে একটা বিজাতি-বিদ্বেষ রূপান্তরিত হইয়া কি প্রকারে গৃহের শান্তি নষ্ট করিতে চলিয়াছে! বেতুনার অবস্থা দেখিলে তাহাদের চক্ষুও তখন ফুটিয়া উঠিবে, তাহারা কেরামতকে চিনিতে পারিবে। আমরা এখন তাহাই চাই।"

লাঞ্ছিতা কোন উত্তর করিল না, কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে সে ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল।

একদিন দিবা অবসানকালে ক্ষুদ্র সরিৎতীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া এলেম ও ফকির কথোপকথন করিতেছিল। তাহারই মাঝখানে থামিয়া এলেম জিজ্ঞাসা করিল,—"আমাদের উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী কোন কাজ করিতে পারিয়াছ কি?"

ফকির—"আমার যাহা সাধ্য তাহা করিতে ত্রুটি করি নাই, এলেম। গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, দেশ নৈশ-পাঠশালা ও বালিকা-বিদ্যালয়ে ভরিয়া উঠিয়াছে। যাহাতে দীন কৃষকও শিক্ষা হইতে বঞ্চিত না হয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছি, এখন প্রত্যেকেই লেখা-পড়া শিখিতেছে, অথচ এই জন্য কাহাকেও যেন অধিক আর্থিক ত্যাগ স্বীকার না করিতে হয় তাহার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে। যাহাদের সহানুভূতি আমরা পাইয়াছি, তাহাদিগকে শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছি, তাহাদের সাহায্য না পাইলে আমি কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতাম না।"

এলেম বলিল,—"যাহা করিয়াছ তাহা মন্দ নয়, কিন্তু মনে রাখিও

এসব শিক্ষার সোপান মাত্র, ইহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলিতে পারা যায় না। আমাদের লক্ষ্য হইবে একমাত্র সেই শিক্ষা, যাহা মানুষকে মানুষ করিতে পারে, মনকে সুগঠিত করিয়া তোলে, এবং ধর্ম্মকে কুসংস্কার বর্জ্জিত করে। শুধু পুস্তকপাঠে এই শিক্ষা সুসম্পন্ন হইতে পারে না, জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সাধকের পর্য্যায়ে মানব যাহা শিক্ষা করে, তাহাই হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। আশা করি তোমরা ইহা বিস্মৃত হইবে না। তোমার বন্ধুগণ কি করিতেছেন?"

ফকির—"যথেষ্ট। কিন্তু অর্থাভাবে তাহারা বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।"

এলেম—"অর্থ! অর্থ আমি কোথায় পাইব? আর যাহা চাহ, আমি দিতে পারি, কিন্তু ধনদানের সামর্থ্য আমার নাই। আর উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে কি ধন এতই আবশ্যকীয় জিনিষ! অর্থাভাবে পৃথিবীর কোন কার্য্য পণ্ড হইয়া গিয়াছে, এ ধারণা আমার নাই। ক্ষুদ্র সরিৎ যখন পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া প্রবাহিত হয়, তখন ভাবে সে বড়ই ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর জিনিষটী, ঐ অতিদূরে বিশাল সমুদ্র পড়িয়া রহিয়াছে, কি করিয়া যাইয়া সে তাহার সঙ্গে মিলিত হইবে! কিন্তু যতই চলিতে থাকে, একে একে, অনেক নির্ঝরিণী আসিয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হয়, তখন সেই সরিৎ আর ক্ষুদ্র নয়, কিন্তু বিপুলকায়া, খরপ্রবাহিনী স্রোতস্বতী! নিজ বেগপ্রভাবে ভূভাগ, ভূধর, বিদীর্ণ করিয়া অনন্তের সঙ্গে মিশিতে ছুটিয়াছে! হৃদয় চাই, ফকির, হৃদয় চাই! তোমাদের উৎসাহ ও উদ্যম আমার প্রার্থনীয়, ধনদানে তাহা ক্রয় করা সম্ভবপর কি?"

ফকির অধোবদনে বসিয়া রহিল।

এলেম পুনরায় বলিল,—"বেশ কথা; তোমার বন্ধুগণকে আমার সম্ভাষণ জানাইও, আর বলিও যে তাহাদের সঙ্গে দেখা হইলে আমি বড়ই

সুখী হইব। এ পর্য্যন্ত কিন্তু আর একটী দিকে তোমাদের চেষ্টা মোটেই প্রসারিত হয় নাই। দেশের রমণীগণকেও শিক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু তোমরা পুরুষ মানুষ তাহাদের অভাব তোমরা বুঝিতে পারিবে না। এই ভারটা আমিই গ্রহণ করিলাম।”

এলেম আরও কিছু দিন লাঞ্ছিতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিল, তারপর সে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইয়া উঠিলে, তাহার অনুমতি লইয়া নিজ আবাসে চলিয়া আসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—০—

আহ্বান।

বাড়ী আসিয়াই এলেম পত্র লিখিতে বসিল। বেহুনার প্রতি তাহার সপত্নীগণ যেরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা শুনিয়া এলেম বুঝিতে পারিল যে অন্তঃপুর মধ্যেও শিক্ষা বিস্তার না করিতে পারিলে, আর কোন প্রকার সুফল লাভেরই সম্ভাবনা নাই। রমণী কোমল হইলেও বিধাতার শাণিত অস্ত্র, যেরূপ দেখা গিয়াছে, সিংহ-প্রকৃতি পুরুষও সেদিকে চাহিয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। অতএব এলেম লিখিল,—

"ভগিনীগণ, ভগবৎ-কৃপায় আমরা জগতের শ্রেষ্ঠ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। যদিও অতি ক্ষুদ্র কীটানুর ক্রমিক অভিব্যক্তির সমবায়ে আমাদের এই পঞ্চভূতাত্মক দেহের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু মানব বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সমষ্টিতে নহে, হৃদয়বৃত্তির উপরই তাহার অস্তিত্ব স্থাপিত এবং এই মনোবৃত্তিসকলের পূর্ণ বিকাশ সম্পাদন করাই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু ভাবিয়া দেখ আমরা কোথায়? পৃথিবীতে যাহা প্রার্থনীয়, আমরা তাহাতে উদাসীন, আর যাহা পশুত্বের পরিচায়ক আমরা তাহা লইয়াই উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছি!

ভগিনীগণ, মানবসমাজে আমরা অর্দ্ধাধিক স্থান অধিকার করিয়া আছি। জগতের কর্ম্মবীর আমাদের স্তন্যে প্রতিপালিত হয়, ভবিষ্যতের প্রদীপটী আমরাই উজ্জ্বল করিয়া দেই। একহস্তে সংসারের আবর্জ্জনারাশি ঘাটিতে ঘাটিতে, আমাদিগকেই অন্যহস্তে উদ্যমপূর্ণ ললাটদেশ উজ্জ্বল-

তর করিয়া আয়াসজাত স্বেদবিন্দু মুছাইয়া দিতে হয়! ধরিত্রী আমাদেরই স্নেহের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রাণীজগত প্রতিপালন করিতেছে, আমাদেরই মত প্রশস্তহৃদয় জলধি প্রশান্তবক্ষে কুলুকুলুনাদে প্রেমের গীতি গাহিতে গাহিতে অনন্তের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে, আমাদেরই প্রতিমূর্ত্তি প্রকৃতিদেবী এই পরিদৃশ্যমান নিখিল জগত প্রসব করিয়াছেন! আমরা আর কি তাহা কে বলিতে পারে?

ভগিনীগণ, শস্যক্ষেত্রে আগাছার ন্যায় অজ্ঞতা স্বতঃই আমাদের হৃদয় ঘিরিয়া বাড়িতে থাকে। কিন্তু আগাছায় ক্ষেত্রশোভা বর্দ্ধিত হয় না, তাহারা শস্যপ্রদানে অশক্ত। আমাদিগকে শস্যচয়ন করিতে হইবে— আমাদের স্নেহ স্বার্থহীন, প্রেম নির্ম্মল ও আত্মত্যাগ দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইবে। শিক্ষা হৃদয়ের পূর্ণতা সম্পাদন করে, মন সুগঠিত ও কার্য্যক্ষম করিয়া তোলে। তাই আজি আহ্বান আসিয়াছে, এস, যে সক্ষম, অগ্রসর হও, নিজের উন্নতি সাধন কর, জগতের মঙ্গল বিধান কর।"

লেখা সমাপ্ত হইলে, এলেম উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল,—"সুখা, ও সুখা, একবার এদিকে আয় ত মা?"

রন্ধনদণ্ড হস্তে লইয়া সুখা আসিয়া বলিল,—"কেন মা?"

এলেম,—"তোর্ স্বামী কোথা?"

সুখা—"এই মাত্র আমার বাপান্ত করিয়া একটু শান্ত হইয়া বসিয়াছেন।"

এলেম—"বটে! এখনও তোর্ ঐ রকম!"

সুখা অধোবদনে রহিল।

এলেম—"তবে তুই কিছুই করিতে পারিস্ নাই?"

সুখা—"কি করিব, মা?"

এলেম—"তাহাও ভুলিয়াছিস্, দেখিতেছি!"

সুখা—"আমার কাজ আমি ভাল করিয়া করিতে পারি না!"

এলেম—"আর যদি আমি তাহা করিয়া দেই ?"

সুখা—"সেই ভাল, আমি পারিব না।"

এলেম—"তাহা হইলে আমি তোর্ স্বামীর ভার গ্রহণ করিলাম, কিন্তু তোমাকে কিছুদিনের জন্য অন্যত্র যাইতে হইবে।"

সুখা—"কোথা যা'ব মা ?"

এলেম—"এই বলিতেছি" এই বলিয়া সে কতকগুলি সামান্য কাচের জিনিষ, স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য্য তৈজসপত্র, দু'চার খানা অলঙ্কার, একটা ধামার মধ্যে সজ্জিত করিয়া বলিল,—"বহরের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া এই সকল বিক্রয় করিয়া আসিতে হইবে। গরীব দেশ, জিনিষগুলি পুরাণ, দামও কম, যাহাতে প্রত্যেক অন্দরে প্রবেশ করিতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে। আর এই লিখিয়া দিলাম, ইহাও অতি পুরাতন কথা, লোকে যাচিয়া পরিবে না। অতএব বিক্রীত জিনিষ মুড়িয়া প্রত্যেক দ্বারে দ্বারে এক একখানা করিয়া রাখিয়া আসিও।"

সজ্জীভূত হইয়া আসিয়া সুখা জিজ্ঞাসা করিল,—"কবে ফিরিব মা ?"

এলেম—"তোমার স্বামীর জন্য চিন্তা করিও না, আমি আছি। যখন কার্য্য সমাধা হইবে তখনই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।"

সুখা—"তবে ত দেখিতেছি তুমি আমাকে বনবাসে পাঠাইতেছ! কিন্তু মা, তোমাকে একটা কথা বলিয়া যাই, তাঁহাকে একটু আদর যত্ন করিও।"

এলেম—"তা করিব বৈ কি ?"

সুখা—"আর দেখ, সে একটু বেশী-সিদ্ধ ভাত খাইতে ভালবাসে।"

এলেম—"বটে!"

সুখা—"আর ভাজাটা তাহার না হইলেই নয়।"

এলেম—"আমি তাহাকে দু'বেলাই ভাজা দিব।"

সুখা আবার বলিতেছিল—"আর——" কিন্তু এলেম বাধা দিয়া বলিল,—"যারে পাগ্‌লি, তোর্ কিছুই বলিতে হইবে না, আমার নিকট সে সুখেই থাকিবে।" সকল জিনিষ বুঝিয়া লইয়া জিনিষ বিক্রেত্রীর বেশে সুখা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিচার।

হিন্দুগ্রামের কঠোর নিয়মাবদ্ধ সমাজ; শুচিরাম শর্ম্মা অন্তরালে থাকিয়া তাহার বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেছিল। যেদিন জীবনের মাতার জন্য মোট বহিতে যাইয়া সন্ন্যাসী ধরা পড়িল, তাহার পর হইতে হিন্দুগ্রামের উপর দিয়া আন্দোলনের প্রবল ঢেউ বহিয়া যাইতে লাগিল। যাহারা সন্ন্যাসীর নিকটবর্ত্তী, সম্পর্কজনিত দোষেও তাহাদের উপর ঢেউগুলি গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে আসিয়া আছাড়িয়া পড়িতে লাগিল। সকলেই স্ব স্ব অনুধাবনাকে অভ্রান্ত সত্যরূপে উপলব্ধি করিয়া বুঝিল যে অমৃতই সমাজের চক্ষে ধূলি প্রদান মানসে এই গর্হিত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। কেহ বলিল তাহাকে "কুলাঙ্গার" কেহবা "সমাজের কালাপাহাড়" আখ্যায় তাহাকে বিভূষিত করিল। কিন্তু শুচিরাম অবিচলিত, সে জানিত, যে বাঁধন একবার আটিয়া গিয়াছে, তাহা সহজে টুটিবার নয়! অতএব স্বকীয় প্রভুত্বের প্রতি বিশ্বাসবান হইয়া সে একদিন সমবেত গ্রামবাসিগণকে লইয়া অমৃতের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পুত্র ও পিতার সম্বন্ধ কি! যদি সত্যাবদ্ধ পিতা প্রয়োজন হইলে পুত্রের শিরচ্ছেদ করিয়াও ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের তৃপ্তিবিধান করিতে পারে, তাহাতে কিন্তু পুত্রেরই মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, পিতৃত্ব ধ্বংস হইয়া যায়! পা ধাতুর অর্থ একদিকে যেমন এই পঞ্চভূতাত্মক দেহটাকে অন্নজলে বর্দ্ধিত করিয়া তোলা বুঝায়, কিন্তু তাহার আরও একটা মহান্ দিক আছে। স্ব স্ব পরিবার বা সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করিয়া যে এক অনন্ত

পরিধিবেষ্টিত স্থান পড়িয়া রহিয়াছে, যেখানে পিতৃত্ব ও পুত্রত্ব এক, এবং প্রত্যেককেই কেন্দ্র করিয়া যাহার বিস্তৃতি, সেই মহান্ বিশ্বপ্রাণের সত্তা উপলব্ধি করিতে সাহায্য করাই পিতার প্রধানতম কর্ত্তব্য। পিতৃত্ব, পুত্রত্ব, পরিবার, সমাজ ও দেশ, সেই একই মহান্ সত্যের এক একটী অতি ক্ষুদ্রতম পরমাণু মাত্র; ইহার কাহারও স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি করিয়া অপরের দাবী অগ্রাহ্য করিবার অধিকার কাহারও নাই। কিন্তু মানব! নিজের পরিকল্পিত গজ-কাটী লইয়া তুমি ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতা পরিমাণ করিতে অগ্রসর হও!

বহুজনসমাকীর্ণ বিচার সভা, যে বৃদ্ধ সেও যষ্টি ভর করিয়া দেখিতে আসিয়াছে। একটী উচ্চ বেদীর উপর অমৃত উপবিষ্ট, মুখশ্রী গম্ভীর, দৃষ্টির প্রশান্তভাব শুধু কর্ত্তব্যের টানে মহনীয়। পার্শ্বে শুচিরাম শর্ম্মা, এক হস্তে যষ্টি, অন্য হস্ত অমৃতের আসনপ্রান্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। সম্মুখ-ভাগে জীবনের মাতা, বা হিন্দুর কুলকামিনী, বা সহায়হীনা বৃদ্ধা যাহাই বল, প্রকাশ্য বিচার সভায় নিতান্ত সঙ্কোচের সহিত পরিধেয় বসন দ্বারা সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া দণ্ডায়মানা। সন্ন্যাসী একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অবনত-মস্তকে যেন একটী একটী করিয়া পৃথিবীর পরমাণু গণিতেছিল। গভীর জল,—নিষ্ঠুর আঘাতেও তরঙ্গের বেগ অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত পৌঁছিবে কিনা সন্দেহ।

যথাসময়ে বিচার আরম্ভ হইল। শুচিরাম গম্ভীরস্বরে বলিল,—"সন্ন্যাসী, এই সনাতন সমাজের বিধি লঙ্ঘন করিয়া তুমি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। তোমার কি বক্তব্য আছে?"

সন্ন্যাসী—"এই মাত্র যে আমি এই নিঃসহায় রমণীকে সাহায্য করিয়াছি,—ভাল মন্দের ধারণা আমার নাই।"

শুচি—"কিন্তু না থাকিলে চলিবে কেন? তুমি ধর্ম্মপ্রাণ অমৃত রায়ের

পুত্র, হিন্দুগ্রামের ভাবী উত্তরাধিকারী, হিন্দুর আশা, ভরসা এবং সমাজের সহায় সম্পদ। তোমার তাহা থাকা উচিত ছিল।"

সন্ন্যাসী—"বেশ কথা। যদি আমার উপর এতটাই নির্ভর করে, তবে আমার কর্ত্তব্য কি তাহাও আমি বিদিত আছি। ধর্ম্মপ্রাণ পিতার পুত্র, পিতার ধর্ম্মের উজ্জ্বলতর মূর্ত্তি জগতের সম্মুখে প্রকাশিত করিবে, ভূম্যধিকারীরা শুধু বন নদী মাঠের উপর রাজত্ব করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে না! হিন্দুর আশা ভরসা কত উচ্চ, কোন্ মহান্ স্বর্গে তাহাদের আহ্বান পৌঁছিতে পারে, তাহা আমি জানি, সমাজ রক্ষার প্রকৃতি কি তাহাও আমার অবিদিত নাই। আমার বিশ্বাস, জগতের চক্ষে যাহা ন্যায্য, ক্ষুদ্র সমাজ আমার নিকট তাহা হইতে অধিক দাবী করিতে পারে না।"

অমৃতের চক্ষু দিয়া একটী প্রীতির আভা ঝলসিয়া গেল।

শুচিরাম—"উদ্ধত যুবক, তোমার এই পাগলের প্রলাপ পরিত্যাগ কর।"

সন্ন্যাসী—"তবে আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।"

শুচিরাম—"হাঁ! তবে তাহাই হউক। তোমার শাসনে হিন্দুগ্রাম রসাতলে যাইবার সম্ভাবনা আছে। আজ হইতে আমরা তোমাকে নির্ব্বাসিত করিলাম।"

শুনিয়া সভাস্থল কম্পিত করিয়া একটা হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল; সকলেই একবাক্যে শুচিরামের প্রস্তাব সমর্থন করিল।

জীবনের মাতা কম্পিতস্বরে বলিল,—"কি! কি! কেন?"

শুচিরাম—"হতভাগিনি, তোমাকে সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া।"

জীবনের মাতা—"আমার জন্য! আমি মহাপাপী তাহা জানি, কিন্তু পতিতকে উদ্ধার করিতে যাইয়া কবে কাহার চিত্ত কলুষিত হইয়াছে?"

শুচিরাম—"বা! ম্লেচ্ছের মুখে আবার ধর্ম্মের কথা!"

জীবনের মাতা একটু তেজের সহিত বলিল,—"কেনই বা না আসিবে! লোক বুঝিয়া ত একই ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন বিধি প্রণয়ন করে না! আমার অদৃষ্টের দুর্ঘটনার জন্য যদি আমি এইরূপেই হেয় ও লাঞ্ছিত হইতে পারি, তবে আপনার আসন্ন-প্রসবা গাভীটির যে জলে পড়িয়া অপমৃত্যু হইয়াছিল, তাহার জন্য আপনি কি করিয়াছিলেন?"

শুচিরাম—"আঃ! আঃ! একথাটাত আমার মোটেই মনে হয় নাই! আমি ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। শাস্ত্রে আছে, "পাপের জ্ঞান হওয়া মাত্রেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।" এই বলিয়া শুচিরাম পরিধেয় বসনের এক প্রান্ত ছিঁড়িয়া লইয়া তাহা দ্বারা একটী উত্তরীয় প্রস্তুত করিল। পরে তাহাতে একটী চাবি ঝুলাইয়া দিয়া উত্তরীয়টী গলদেশে ধারণ করিল এবং "হাম্বা! হাম্বা! হাম্বা!" রবে তিন বার উচ্চৈঃধ্বনি করিল। প্রায়শ্চিত্তের কাল পর্য্যন্ত তাহার কথা বলা রহিত হইয়া গেল।

জীবনের মাতা—"যদি আপনি কেবল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই পাপমুক্ত হইতে পারেন, তবে আমার পক্ষে সে অধিকার থাকিবে না কেন?"

শুচিরাম এই বার মাথা ও হাত নাড়িয়া জানাইল যে তাহার সে অধিকার নাই।

শুচিরামের নিকট কোন ফললাভের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, জীবনের মাতা সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"হৃদয়বান্ সভাসদগণ, সত্য বটে আমি নিতান্তই হতভাগিনী, নতুবা নিজের মেয়েই আমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে কেন! কিন্তু অভাগিনী বলিয়া কি আমি মানব পর্য্যায়েও স্থান পাইতে পারি না! ভাবিয়া দেখুন, দীন ভিখারী যে, তাহাকেও দশ জনে সাহায্য করিয়া থাকে, কিন্তু আমার কে আছে? সমাজ কর্ত্তৃক আমি পরিত্যক্ত হইয়াছি, দেশের নিকট আমি ঘৃণ্য সংস্পর্শ-বর্জ্জিত! আমি বৃদ্ধ, সহায়হীন, উপায়হীন—এক বেলা অন্ন জুটিতে পারে সেরূপ সংস্থান

আমার নাই, রোগে এক বিন্দু জল মুখে তুলিয়া দিতে কেহ আসিবে না! যদি পরের দুঃখ মোচনের জন্যই দয়ার সৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে আমি তাহা সম্পূর্ণই আপনাদের নিকট হইতে দাবী করিতে পারি, কিন্তু তথাপি আজ আমি তাহা আপনাদের নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি।"

সভাস্থল নীরব, সকলেই অধোমুখ হইয়া নিজ নিজ হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করিতেছিল। এমন সময় একজন কিছু বলিতে যাইবে বুঝিতে পারিয়া শুচিরাম যাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। মনের আবেগ দমন করিতে না পাড়িয়া অমৃত আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল, দেখিয়া শুচিরাম তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক আসনে বসাইয়া দিল! তৎপর নানা অঙ্গভঙ্গির সহিত সে সম্মুখস্থ টেবিলের উপর হস্তদ্বারা আঘাত করিতে করিতে সেই চঞ্চল জনতার মধ্যে পুনরায় শান্তি আনয়ন করিল।

জীবনের মাতা—"বুঝিয়াছি, আমার অদৃষ্টে কিছুই হইবে না! কিন্তু এই বালক, যে আমার জন্য আপনাদের বিরাগভাজন হইয়াছে, আপনারা তাহার প্রতি সুবিচার করুন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ঘরে পচিয়া মরিব, তথাপি আর কখনও তাহার সাহায্য গ্রহণ করিব না।"

সকলে অমৃতের দিকে দৃষ্টি করিল। অমৃত বলিল,—"তাহার বিচার পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে! আমি এখন এই সভা ভঙ্গ করিলাম।"

শুনিয়া জীবনের মাতা হতচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। পরে যখন তাহার জ্ঞানোদয় হইল, তখন শুনা গেল, বৃদ্ধা অস্ফুটস্বরে বলিতেছে, "হায়! হায়! আমারই জন্য!! হায়! হায়! আমারই জন্য!!"

এদিকে সভাস্থান হইতে অমৃত অন্দর মহালে প্রবেশ করিলে আদৃতা ছল ছল চক্ষে জিজ্ঞাসা করিল,—"করিলে কি! ছেলেটাকে পরিত্যাগ করিলে?"

অমৃত—"বুঝিতে পার নাই, আদৃতা! সন্ন্যাসীর জন্য আজ আমরা গৌরবান্বিত! সে যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে, আজ তাহার সকল প্রতিবন্ধক লোপ করিয়া দিয়াছি।"

সভা ভঙ্গের পর সকলে নিজ নিজ বাড়ীর অভিমুখে যাত্রা করিল। অমৃতের হৃদয়ের বলের, তাঁহার অপক্ষপাতিতার এবং রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ন্যায়পরতার শত শত প্রশংসাবাণী শত শত মুখে উচ্চারিত হইতে লাগিল। কিন্তু সাবধান, হিন্দুসমাজ, ব্যক্তিগত ত্যাগের মোহে পড়িয়া তুমি নিজের লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়াছ!!!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উদ্যোগ পর্ব্ব।

বেহুনার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া বহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই কেরামত জান্‌বিবির নিকট তেজোবন্তের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। শুনিয়া জান্‌বিবি নিরাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল,—"সিংহের গহ্বরে যাইয়া তাহাকে আক্রমণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে, কেরামত, কৃতকার্য্য তুমি যে হইবেই সে বিষয়ে সন্দেহ না করিয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না।"

কেরামত—"সন্দেহ যে সম্পূর্ণই ছিল, পূর্ব্বে আমিও তাহা বিশ্বাস করিতাম, এখন কিন্তু সে বিষয়ে আমি সন্দিহান হইয়াছি!"

জান্‌বিবি—"কেন?"

কেরামত—"আমি শুনিয়া আসিয়াছি, তেজোবন্ত মল্লসঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া দিয়া দেওয়ানা হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে।"

জান্‌বিবি—"কাফেরকে বিশ্বাস করিওনা।"

কেরামত—"সেইজন্যই আমি গোপনে যাইয়া তাহার দুর্গ আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করি, বহরে যাহারা বীরত্ব ও কৌশলের জন্য বিখ্যাত, একমাত্র তাহাদিগকেই সঙ্গে লইলে যথেষ্ট হইবে।"

জান্‌বিবি—"যদি এই উপায়ে কার্য্য-সিদ্ধি করিতে পার, ভালই। কিন্তু অতিসাবধানে অগ্রসর হইও, এক পদক্ষেপ যেন অন্য পদ না জানিতে পারে।"

কেরামত—"বেগম সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মের ধ্বজা।

এদিকে উৎসবের পরেই তেজোবন্ত হৃষ্টচিত্তে মল্লসজ্ঘ ভাঙ্গিয়া দিল। যাহারা এত কাল তাহার সেবা করিয়া আসিতেছিল, শিক্ষা ও দীক্ষার জন্য যাহারা তেজোবন্তের নিকট সম্পূর্ণই ঋণী, বিদায়ের সময়ে তাহারা সকলেই বড় কাতর হইয়া পড়িল। আঙ্গিনায় সমবেত মল্লবীরগণের নিকটে তেজোবন্ত বিদায় বক্তৃতা করিল,—"ভাইসব, মানব জীবনে দেহ ও মন উভয়েরই উৎকর্ষ বিধান করা কর্ত্তব্য, সুগঠিত উভয়ের দ্বারাই আমরা পৃথিবীতে আত্মরক্ষায় সমর্থ বটে, কিন্তু মন পরকালেও আমাদিগকে ত্রাণ করিয়া থাকে। আশা করি এখন হইতে মন তোমাদের যত্নের বিষয় হইবে।" এই বলিয়া সে প্রত্যেককে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় করিয়া দিল। তৎপর একে একে যে যাহার দেশের দিকে চলিয়া গেল, তখন সেই বিস্তীর্ণ ময়দানটী নির্জ্জন, নিস্তব্ধ! তেজোবন্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া বিষাদমাখা প্রীতির সহিত বহুবার সেই নিস্তব্ধতা উপভোগ করিতে লাগিল।

রাত্রি চারিদণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, বহুদিন পরে শ্যামা ও শান্তা নৈশ-বায়ু সেবনার্থে বাহিরে আসিয়া বসিয়াছিল। সম্মুখে সেই ছোট ফুলবাগানটী, চতুর্দ্দিকে নিস্তব্ধ মাঠ। রক্ষীগৃহগুলি অন্ধকারে আবৃত, পূর্ব্বে এই সময়ে তাহাদের মধ্যহইতে দীপালোক বাহির হইয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া রাখিত। মনের সঙ্গে বাহ্য প্রকৃতির এমনই নিকট সম্বন্ধ যে শান্তা প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করিতে লাগিল আজ বায়ুপ্রবাহ

যেন বড়ই মুক্ত, স্বাধীনতা প্রাপ্ত—প্রতিস্পর্শে হৃদয়ের মাঝে আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া দিতেছে। কিন্তু সে প্রাণভরিয়া এই আনন্দ উপভোগ করিতে পড়িতেছিল না। বহুদিনের একটা যাতনাময় বোঝা যখন হইতে অপসারিত হইয়া যায়, হৃদয় যদিও তখন আপনাকে স্তরে স্তরে উন্মুক্ত করিয়া সমস্ত প্রকৃতিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে এবং মন নিজের অবসর বুঝিয়া একটী একটী করিয়া বিমল রত্ন প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে কুড়াইয়া লইতে ব্যস্ত হয়, কিন্তু এমন সময়ও আসে, যখন চুরি করিতে যাইয়া মন আপন আবেগে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রকৃতির পায়ে লুটিয়া পড়ে—তাহার বড়ই দুঃখ—স্মৃতির তাড়নায় একটী মাত্র অভাবের জন্য তাহার সকল বাসনা, সকল আনন্দ, অপূর্ণ রহিয়া গেল! শান্তাও আজ যে অভাব অনুভব করিতেছিল, তাহাতে এত আনন্দেও সে তৃপ্তির আস্বাদ পাইতেছিল না।

শ্যামা সেই নিস্তব্ধতা ভগ্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"সই, আজ রাত্রি কেমন?"

শান্তা—"শুনিতেছ না, এই স্তব্ধময়ী রজনী কেমন নীরব ভাষায় আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে।"

শ্যামা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"কিন্তু সই, ভাবনার একটা বিষয় আছে!"

শান্তা—"কি?"

শ্যামা—"বাবার মুসলমান বিদ্বেষ চিরপ্রসিদ্ধ, আজ যদি কেহ পূর্ব্ব শত্রুতার প্রতিশোধ লইতে আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে?"

শান্তা—"তবে কি হয়?"

শ্যামা—"অন্যের কথা ছাড়িয়া দেও, আমাদের অদৃষ্টে কি ঘটে তাহাই একবার ভাবিয়া দেখ!"

শান্তা নীরব হইয়া বসিয়া রহিল।

শ্যামা এই অবসরে লিখিতে আরম্ভ করিল :—

"শ্রীযুক্তেশ্বর ত্রিকালেশ্বর হৃদয়েশ্বর স্বামী মহাশয়ের শ্রীপাদ-পারিজাতে জীবন-যৌবন সমর্পণকারী দাসী শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরীর আদেশ লিপিমিদং কার্য্যঞ্চাগে। যেহেতু অত্রাঞ্চলে ইদানিং নিতান্ত মুসলমান-ভীতির সম্ভাবনা হইয়াছে, অতএব অধিনী যৎপরোনাস্তি ভয়বিহ্বলিতচিত্তে তাহার জীবিত নাথের আশ্রয়ভিক্ষা করিতেছে। বিশ্বাস, তিনি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য জাতিকুলমান এইরূপে বিপদসঙ্কুল রাখিয়া এতাদৃশ বিত্তোপার্জ্জনে প্রয়োজন নাই, ইহাই একমাত্র স্থির সিদ্ধান্ত করিবেন অতএব এই লিপি পাঠান্তে মহাশয় নিজ দেশাভিমুখে যাত্রা করিবেন, ইহাই একমাত্র এই সন্দেশবহের তাৎপর্য্য। নিবেদনমিতি বেদবানাঙ্ক শকাব্দার সৌর বৈশাখস্য চতুর্থ দিবসে।

আজ্ঞাধীনা

শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দাসী।"

শান্তা জিজ্ঞাসা করিল,—"ওকি লিখিতেছ?"

শ্যামা—"একখানা চিঠি; আমার "গোয়ালের একটী গরু" আছে, তাহা জান; তাহাকেই তলব করা হইল।"

এমন সময়ে দুর্গদ্বারে মুসলমানগণ কোলাহল করিয়া উঠিল। শান্তা চমকিত হইয়া বলিল,—"ওকি, সই?"

শ্যামা—"আমাদেরই অদৃষ্ট, যাহা বলিতেছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে!"

শান্তা—"কি? মুসলমান আসিয়াছে?"

শ্যামা—"হাঁ! চল, এখন আত্মরক্ষার উপায় করিতে হইবে।" এই বলিয়া সে শান্তাকে লইয়া উঠিয়া দুর্গের ভিতরে যাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া

দিল। দেখিতে দেখিতে মুসলমানসেনা আসিয়া দুর্গটীকে ঘিরিয়া ফেলিল। কোনরূপ বাধা না পাইয়া তাহারা বিস্মিত হইয়া ভাবিল যে কাফেরের দল ভয় পাইয়া পলাইয়া গিয়াছে। কেরামত সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া দুর্গের তোড়ণদ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই কালীদেবীর মন্দির, কেরামত উৎসাহভরে বিগ্রহ চূর্ণ করিয়া বহু ধন রত্ন আত্মসাৎ করিল, তৎপর সে দুর্গ-লুণ্ঠন ব্যাপারে মনোনিবেশ করিল।

তখন অর্গল-রুদ্ধ কক্ষে শান্তা ও শ্যামা নিম্নলিখিত প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছিল :—

শান্তা বলিল,—"সই, এখন উপায় ?"

শ্যামা—"দেখনা, আমি কি করি!" এই বলিয়া সে রমণীজনোচিত বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোচিত বেশভূষা পরিধান করিল।

শান্তা বিস্মিত হইয়া বলিল,—"এ কি ?"

শ্যামা—"যদি বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে তবে শীঘ্র এই পন্থা অবলম্বন কর, নতুবা গৌণ করিলে বিপদ ঘটিবে।"

শান্তা—"না, সই, আমি তাহা পারিব না। মরিতে হয় এই বেশেই মরিব, কিন্তু রমণীর পুরুষ সাজিয়া বাঁচিয়া লাভ নাই।"

তখন গৃহের পার্শ্বে আক্রমণকারিগণের কোলাহল শ্রুত হইতে লাগিল। শ্যামা এক গাছি লাঠি হাতে লইয়া দরজার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। পুনঃ পুনঃ ভীষণ আঘাতে সেই কাঠের আবরণ অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিল না। সকলে দরজা ভাঙ্গিয়া মার মার শব্দে গৃহে প্রবেশ করিল। এক কোণে মিটি মিটি একটী বাতি জ্বলিতেছিল, সেই আলোকে কেহই শ্যামাকে চিনিতে পারিল না; কেরামত লাঠি তুলিয়া শ্যামার মাথায় আঘাত করিল, সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। শান্তা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কেরামত বাতিটী উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়া তাহাকে দেখিয়াই

সহর্ষে "ইয়ে আল্লা!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার আদেশে কয়েকজন মুসলমান আসিয়া লুপ্তচেতন শান্তাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

তারপর যথাবিহিত লুণ্ঠন কার্য্য সমাপনান্তে মুসলমানগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর পাপাত্মা ও তেজোবন্ত আসিয়া অপহৃত জিনিষসকলের তালিকা করিতে বসিল। দেখিল তাহাদের জীবনের অতিপ্রিয় জিনিষ-গুলিও অপহৃত হইয়াছে। শান্তার অভাবের পরেই তাহারা দেখিল কেরামত শুধু কালী-বিগ্রহ চূর্ণ করিয়াই নিরস্ত হয় নাই, কিন্তু কালীমন্দিরের উপকরণগুলিও সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই সকল উপকরণের দ্বারা বহরের প্রান্তভাগে এক বিপুলকায় মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। আজও তাহার প্রাচীর-গাত্রে হিন্দুমন্দিরের নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং শিক্ষিত মুসলমানগণ নাকি তাহা দেখিয়া গৌরব অনুভব করেন!!!

তেজোবন্ত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। পাপাত্মা বলিল,—"এস, আমরা এই নির্ম্মম অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিব।" তেজোবন্ত হাসিয়া বলিল,—"পরীক্ষা করিতেছ, পাপাত্মা, জীবনের শত পরীক্ষার মধ্যে আজ এইটাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! ইহাতে বিচলিত হইলে চলিবে কেন?"

নবম পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধার সংসার।

আঘাত যত বড়ই হউক না কেন, তাহাকে মুক্তাগর্ভ সুক্তির ন্যায় হৃদয়ের রসে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার মত প্রবৃত্তি তখন সন্ন্যাসীর অনুমাত্রও ছিল না। কাজেই সর্ব্বসমক্ষে ধর্ম্মপ্রাণ পিতা ও হিন্দুগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া যখন সে প্রথম আঘাতের তীব্রতা প্রশমিত করিয়া লইল, তখন চক্ষু মেলিয়াই সে দেখিল, সেই নির্জ্জন সভাতলে জীবনের দুঃখিনী মাতা ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! সন্ন্যাসী অগ্রসর হইয়া অতি সন্তর্পণে তাহাকে নিজ স্কন্ধোপরে তুলিয়া লইল, এবং ধীর পাদবিক্ষেপে তাহাকে বহন করিয়া বৃদ্ধার জীর্ণ কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে তাহার শুশ্রূষাগুণে বৃদ্ধা শীঘ্রই চেতনা ফিরিয়া পাইল, কিন্তু সে প্রবল জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। তথাপি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়াই সন্ন্যাসীকে সেবা-নিরত দেখিয়া, সে বলিল,—"না, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না।"

সন্ন্যাসী—"কেন, মাসীমা?"

বৃদ্ধা—"তোমার সেবা, এইরূপ নির্ম্মমভাবে আমি গ্রহণ করিব, কেন?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল,—"আজ এ কথা কেন, মাসীমা? যাহা হইবার তাহাত হইয়া গিয়াছে, এখন আপনার আশ্রয়ে আমি সুখেই থাকিব।"

শুনিয়া কপালে করাঘাত করিয়া বৃদ্ধা হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

এইরূপ ঘটনাস্রোতে সন্ন্যাসী এক নূতন সংসারের গৃহিণী হইয়া পড়িল। বৃদ্ধার ন্যায় রোগীকে কালের গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে হইলে, ঘরের চালার মধ্য দিয়া রৌদ্র ও বৃষ্টি পতনের পথ প্রথমেই বন্ধ করিতে হইবে,এ কথা সন্ন্যাসীর জানা ছিল। স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে,গৃহটী ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার, ইহাও তাহার অবিদিত ছিল না। কিন্তু কাজ করিতে যাইয়া সে বড়ই হতাশ হইয়া পড়িল। চালা মেরামত করিতে চেষ্টা করিয়া সে দেখিল, একটী ছিদ্র বন্ধ করিতে যাইয়া সে যুগপৎ দুইটী ছিদ্র সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে! ঘর ঝাট দিতে যাইয়া সে দেখিল একদিকের অপসৃত আবর্জ্জনারাশি ঝাটার অব্যাহত গতি প্রভাবে পুনরায় সেই দিকেই আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছে! তার পর পথ্য প্রস্তুত করা ত এক বৃহৎ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল! বাহিরের প্রজ্জ্বলিত ইন্ধন উনানের মধ্যে প্রবেশ করাইবার কালে নিভিয়া যায়, অথবা জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিঃশেষ হইয়া গেলেও সেই অগ্নি প্রকৃত ইন্ধনে সংক্রামিত হয় না! উদ্বেলিত দুগ্ধ, সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া আধার ভাসাইয়া পড়িয়া যায়! কিন্তু একদিন বৃদ্ধার বাসনানুযায়ী মুগের যুস প্রস্তুত করিতে যাইয়া সন্ন্যাসী একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া পড়িল। সে ভাবিয়াছিল, গোটা মুগ সিদ্ধ হইয়া নরম হইলে, ঘূর্ণায়মান কাঁটার আঘাতে তাহা অতি সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইবে, তখন লঘু খোসাগুলি জলের উপর ভাসিয়া উঠিলে তাহা ছাঁকিয়া লইলেই মুগের যুস প্রস্তুত হইবে। কিন্তু গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াও যখন সে দেখিল সিদ্ধমুগ কাঁটার আঘাতে ভাঙ্গেও না, গলেও না, তখন হতবুদ্ধি হইয়া আসিয়া সে বৃদ্ধার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। শুনিয়া বৃদ্ধা বলিল,—"হায়, আমার কপাল! তুমি কি গোটা মুগই সিদ্ধ করিতে বসিয়াছ!"

সন্ন্যাসী—"কিন্তু এখন উপায়?"

বৃদ্ধা—“উপায় আর কি? মুগগুলি বাটিয়া পুনরায় সিদ্ধ করগে।”

এইরূপে যুস প্রস্তুত হইলে পর, খাইতে বসিয়া, বিমর্ষ সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া বৃদ্ধা বলিল,—“তুমি কি মনে কর, এই সকল খাদ্যদ্রব্যের ভালমন্দ বিচার করিবার প্রবৃত্তি আমার আছে? তোমার প্রস্তুত প্রত্যেক জিনিসটীর মধ্যে আমি এমন একটা একপ্রাণতার আস্বাদ পাই যে, তাহা হইতে স্বর্গের সুধাও আমার নিকট অধিক মিষ্ট লাগিতে পারে না।”

সন্ন্যাসী—“না, মাসীমা, আপনার এই কষ্ট আর আমি সহ্য করিতে পারি না।”

বৃদ্ধা—“কষ্ট ত এখন আমার এমন কিছু নাইরে বাবা, তবে যাহা আছে, তাহা আমি না মরিলে লোপ পাইবে না।”

সন্ন্যাসী—“কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতেই যাহাতে অনেকটা লোপ পায় তাহার বন্দোবস্ত করিতে আমি সঙ্কল্প করিয়াছি।”

বৃদ্ধা—“কি?”

সন্ন্যাসী—“আপনাকে কোন হিন্দুর সংসারে রাখিয়া দিব, কর্তৃত্ব করিয়া থাকিবেন।”

বৃদ্ধা—“হিন্দুর সংসারে আমার কর্তৃত্ব! পাগল নাকি?”

সন্ন্যাসী—“পাগল নই, মাসীমা, হিন্দুগ্রামে এমন লোকও থাকিতে পারে, আপনাকে আশ্রয় দিতে যাহারা দ্বিধা বোধ করিবে না।”

বৃদ্ধা—“তাহা ত তোমার দৃষ্টান্তেই বুঝিয়াছি। কিন্তু এখন যাহাদের কথা বলিতেছ, তাহারা তোমার খুব আত্মীয় বুঝি? বল দেখি, সেই নির্ভীক হৃদয়ের একটু পরিচয় জানিয়া লই।”

উত্তর দিতে যাইয়া সন্ন্যাসীর গণ্ডস্থল রক্তিমাভ হইয়া উঠিলেও সে আজ স্নেহের নিকট আত্মপ্রকাশ করিতে বসিয়াছে, বৃদ্ধার প্রশ্নের উত্তরে একটি একটি করিয়া সে তেজোবন্তের বাড়ীর সকল কথাই বলিয়া ফেলিল; শান্তার

কথাও গোপন করিতে পারিল না! শুনিয়া বৃদ্ধা অতিশয় হর্ষের সহিত বলিলেন,—"একথা আমাকে আগে বলিতে হয়! তোমার নিকটে থাকিয়া তোমার স্ত্রীকে মানুষ করিব, ইহা হইতে বেশী সুখের আমার আর কি হইতে পারে? তুমি যাইয়া সকল বন্দোবস্ত করিয়া এস।"

"ধরা পড়িয়াছি।" ভাবিয়া সলজ্জভাবে উঠিয়া সন্ন্যাসী কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিসর্জ্জন।

মুসলমান আসিয়া যখন জীবনের মাতার বাড়ী লুণ্ঠন করিয়া গিয়াছিল, তখন "অত্যাচার, অবিচার!" বলিয়া চীৎকার করিয়া হিন্দুগণ মেদিনী কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল! কিন্তু এই হতভাগিনী বৃদ্ধাকে পুনরায় নিগৃহীত করিবারকালে সেই হিন্দুগণই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তাহাদের নির্ম্মম ব্যবহারে সমর্থন করিয়াছিল। ধর্ম্মের দ্বারে বৃদ্ধা অস্পর্শা, পাপিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, অতএব সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিত। কিন্তু এই ঘৃণা তাহাদের বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছিল, যেদিন সমগ্র হিন্দুসমাজের অসন্তোষ উপেক্ষা করিয়াও সন্ন্যাসী প্রকাশ্যভাবে বৃদ্ধার সেবা করিতে দ্বিধা বোধ করিল না। বৃদ্ধার সাহায্য! নির্য্যাতিত, অবহেলিত তৃণ সে, তাহাকে সমাজের কোলহইতে ঠেলিয়া ফেলিবার কালে, সে যে সমাজের শ্রেষ্ঠ চূড়াটীই অবলম্বন করিয়া ভূপতিত হইল, তাহা অনেক হিন্দুর প্রাণেই শেলসম বিদ্ধ হইয়াছিল। তাই তাহারা বৃদ্ধার এই সৌভাগ্য-গৌরব লাঘব করিবার জন্য অধিকতর ব্যগ্র হইয়া পড়িল। কিন্তু এতদিন তাহাদের একটি সুযোগও ঘটিয়া উঠে নাই! অবশেষে যখন বৃদ্ধার আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য সন্ন্যাসী তেজোবন্তের বাড়ী চলিয়া গেল, তখন এক রাত্রিতে হিন্দুগণ ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়া বৃদ্ধার বাড়ীতে নিপতিত হইল। ম্লেচ্ছ-বাড়ীর কোন দ্রব্য তাহারা গ্রহণ করিল না সত্য, কিন্তু বৃদ্ধার সামান্য তৃণটীও আর স্বস্থানে খুঁজিয়া পাওয়া

গেল না! সর্ব্বশেষে যখন তাহারা বৃদ্ধাকে বাঁধিতে আরম্ভ করিল, তখন সে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি করিতে চাহ, তোমরা?"

"তোমার এই অপবিত্র দেহ গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া তোমার পরকালের একটা উপায় করিয়া দিব।"

এইরূপ শোচনীয় পরিণামের দিকে নরস্কন্ধে বাহিত হইয়া অগ্রসর হইবার কালে বৃদ্ধার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। "আমি কি করিয়াছি? কিসের জন্য আমাকে এই নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইতেছে?" এই কথা ভাবিতেই হিন্দুগ্রামের উপর একটা বিজাতীয় বিদ্বেষে তাহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। অমনি, "হিন্দুগ্রাম-রক্ষক, ইহার প্রতিফল গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হও; তোমার মাতার এইরূপ অবস্থা করিয়া আমাকে মরিতে হইবে। আর এই যে সমাজ, যাহা এমন নির্দ্দয়ভাবে আমাকে নিপীড়িত করিয়াছে, সন্ন্যাসীকে তাহার শিরে বসাইয়া ইহারও নির্ব্বোধ গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিব।" এইরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া বৃদ্ধা জীবনের শরণাপন্ন হইতে কৃতনিশ্চয় হইল।

কেরামতের অভিযানের পরে, দুর্গস্থ কালীমন্দিরের ভগ্ন উপকরণ যাহা অবশিষ্ট ছিল, তেজোবন্ত তাহাই যত্নপূর্ব্বক কুড়াইয়া আনিয়া গঙ্গায় বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছিল। তাহার সঙ্গে ছিল পাপাত্মা ও সন্ন্যাসী। কার্য্য তাহাদের প্রায় সম্পন্ন হইয়া আসিয়াছিল, এমন সময়ে কোলাহল করিতে করিতে জীবনের মাতাকে লইয়া হিন্দুগণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাদের বিপুল কোলাহলে আকৃষ্ট হইয়া তেজোবন্ত, পাপাত্মা ও সন্ন্যাসী আসিয়া তাহাদের নিকটে যাহা অবগত হইল, তাহাতে তেজোবন্ত নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পাপাত্মাও হতবুদ্ধি, কিন্তু সন্ন্যাসী একগাছি লাঠি তুলিয়া লইয়া এমন ভীষণভাবেই হিন্দুগণকে আক্রমণ করিল যে

তাহারা বৃদ্ধাকে পরিত্যাগ করিয়া যে যেদিকে পারিল পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিল। তখন বৃদ্ধার নিকটবর্ত্তী হইয়া সন্ন্যাসী বলিল,—"এই যে মাসীমা, আমি আসিয়াছি।"

বৃদ্ধা—"কে? বাবা সন্ন্যাসী! আবার তুমি আমার জন্য প্রাণ বলি দিতে আসিয়াছ?"

সন্ন্যাসী—"মাসীমা, ..."

বৃদ্ধা—"না, না, আর কিছু বলিতে হইবে না, শুধু প্রতিজ্ঞা কর, আজ আমি যাহা বলিব তাহা করিবে।"

সন্ন্যাসী—"আমি কবে আপনার অবাধ্য হইয়াছি, মাসীমা?"

বৃদ্ধা—"তবে আজই আমাকে বন্দরে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে, আমি মুসলমান হইব।"

সন্ন্যাসী—"এ সঙ্কল্প কেন মাসীমা, আমি সকল বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি, হিন্দুর সংসারে কর্তৃত্ব করিয়া থাকিবেন।"

বৃদ্ধা—"সেই ভ্রান্তি আমার ঘুচিয়া গিয়াছে। হিন্দুর সমাজ লোক চায় না, তাহার বিধি-ব্যবস্থার দীর্ঘজীবন কামনা করে। আমি নিশ্চয়ই মুসলমান হইব।" ইহা কতখানি বেদনাভরা অভিযোগ, বুঝিতে পারিয়া সন্ন্যাসী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আর সেই মুহূর্ত্তেই তেজোবন্ত মহাপ্রস্থানের সঙ্কল্প করিয়া বসিল। সে পরিতেছিল গৈরিক বসন, দেখিয়া পাপাত্মা জিজ্ঞাসা করিল,—"একি করিতেছ, ভাই?"

তেজোবন্ত—"ইহাই প্রায়শ্চিত্ত। সারা জীবনের পাপের শাস্তি পরহস্ত হইতে গ্রহণ না করিয়া, নিজেই সেই ভার গ্রহণ করিয়াছি।"

পাপাত্মা—"কেন?"

তেজোবন্ত—"দেখিতেছ না, ধর্ম্মাত্মাদের কি উৎসব? আমি পড়িতে

চাহিয়াছিলাম সিংহ, কিন্তু গড়িয়া উঠিয়াছে শৃগাল! ইহার পরিণাম দেখিবার আর আমার বাসনা নাই।"

পাপাত্মা—"কিন্তু এই দেশটা পড়িয়া রহিল যে?"

তেজোবন্ত—"এই ভার আমি সেই সিংহহস্তাবীরের উপর অর্পণ করিয়া যাইতেছি, তুমি তাহার নিকট পরিচিত, তাহাকে আমার এই অভিলাষ জানাইও।"

পাপাত্মা—"তুমি নিজেই এই কথা বলিয়া যাইতে পার, হিন্দুগ্রামের ভাবী উত্তরাধিকারী, সেই সিংহহস্তাবীর আজ তোমার নিকটেই উপস্থিত হইয়াছে। সন্ন্যাসী, তেজোবন্তের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।"

তেজোবন্ত অতিমাত্র আনন্দের সহিত প্রণতঃ সন্ন্যাসীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল,—"বড় অসময়ে আসিয়াছ, বাবা, আমার সাধ্য নাই যে তোমাকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করি। এই দেশের ভার আমি তোমার উপর অর্পণ করিয়া যাইতেছি। কিন্তু আবার ভুল করিয়া বসিও না; যে অধ্যায় আমরা অভিনয় করিয়া গিয়াছি, তাহার যবনিকা এই স্থানেই নিপতিত হইল। কিন্তু আজ এইমাত্র যাহা দেখিতে পাইয়াছ, তাহা এক নূতনতর অধ্যায়, আশীর্ব্বাদ করিতেছি ইহার অভিনয় তোমরা কৃতিত্বের সহিত সুসম্পন্ন করিতে পারিবে। আর আমার এই সংসারটা— যদি শান্তাকে উদ্ধার করিতে পার, তাহাকে গ্রহণ করিয়া আমার ইহ সংসারের তৃপ্তি বিধান করিও।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

হিসাব শোধ।

যে দিন জানবিবির কার্য্যে প্রতিবাদ করিতে যাইয়া আমির অপদস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই দিন হইতে আমিরও একটু বদলাইয়া গিয়াছে, জান্‌বিবিও একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। ক্ষণিক বিজলী-চমকে যেমন অন্ধকাররাশি শতধা ছিন্ন হইয়া যায়, জান্‌বিবির ঐ এক দিনের ব্যবহারে সেইরূপ আমিরের পুঞ্জীভূত সকল মোহ দূরীভূত হইয়া গেল। সে ভাবিল, দেশের শাসনকর্ত্তা সে, জান্‌বিবিকে আধিপত্য করিবার এতটা সুযোগ দিয়া তাহাকে বাড়াইয়া তোলা তাহার ভাল হয় নাই। তাই, এখন সকল বিষয়েই সে একটু রক্ষণশীল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বুদ্ধিমতী জান্‌বিবির নিকট ইহা গোপন রহিল না। কিন্তু সে ভীত হইবার মেয়ে নহে, তাহার ভয় করিবার কোন কারণও ছিল না। নানাপ্রকারে উৎসাহ প্রদান করিয়া সে এখন কেরামতকে তাহার শাণিত অস্ত্ররূপে গড়িয়া তুলিয়াছে; কেরামত বীরও বটে, অনুগ্রহের প্রতিদান দিতেও যে জানে না, তাহাও নয়। কেরামতের চক্ষে সে এই ইতিহাস সহস্র বার পাঠ করিয়াছে, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তাহাকে আশাও দেয় নাই, নিরুৎসাহও করে নাই। তাহার কারণ যাঁহারা রমণী চরিত্র লইয়া খেলা করিয়াছেন, তাঁহারাই ভাল বুঝিতে পারিবেন। আমরা শুধু বলিব, জান্‌বিবি নিজের ভবিষ্যতের সম্বল প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছিল। আধিপত্য লইয়াই জান্‌বিবি, যদি কোন দিন তাহাতে কোন অপ্রত্যাশিত বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে আমিরকে অপসারিত করিয়া তাহার স্থানে

কেরামতকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। তাই, আমিরের অসন্তুষ্টি তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না, কিন্তু এই অসন্তোষের গভীরতা নিরূপণ করিবার জন্যই সে আমিরকে না জানাইয়া কেরামতকে তেজোবন্তের বাড়ী লুণ্ঠন করিতে পাঠাইয়াছিল।

কেরামতের প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই তাহার কৃতকার্য্যের সংবাদ বহরে আসিয়া পৌঁছিল। জান্‌বিবি প্রভূত হর্ষের সহিত তাহা আমিরকে অবগত করাইতে আসিয়াছে। আমির দরবার-গৃহে বসিয়া কতগুলি রাজকীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করিতেছিল, জান্‌বিবি ধীরে ধীরে আসিয়া তাহারই সম্মুখস্থ এক আসনে উপবেশন করিয়া বলিল,—"হিন্দুগ্রাম হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কেরামত তেজোবন্তের বাড়ী লুণ্ঠন করিয়া শীঘ্রই প্রত্যাবৃত্ত হইবে।"

আমির কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল,—"কেরামত! সে ত তেজোবন্তের অনুগ্রহে সেই দিন প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, এই অল্পসময়েই সে তাহা বিস্মৃত হইতে পারিয়াছে কি?"

জান্‌বিবি—"বিস্মিত হইও না; আমি এইমাত্র তাহার কৃতকার্য্যের সংবাদ অবগত হইয়াছি।"

আমির—"কই, আমি ত তাহাকে এই কার্য্যের জন্য প্রেরণ করি নাই।"

জান্‌বিবি—"আমি তাহাকে গোপনে পাঠাইয়াছিলাম।"

আমির—"এই সংবাদ এতদিন আমাকে বল নাই কেন?"

জান্‌বিবি—"আবশ্যক বিবেচনা করি নাই।"

আমির—"আজ কি আবশ্যক বোধ করিলে?"

জান্‌বিবি—"তাহাও নহে।"

আমির—"তবে?"

জান্‌বিবি—"পৃথিবীতে কৃতজ্ঞতা বলিয়া একটা জিনিস আছে, তাহা তুমি জান কিনা, শুধু তাহা দেখিবার জন্য। নিজের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া, অগ্রজের আজ্ঞাবহ ভৃত্যরূপে পরিণত হইয়াছিলে, আমিই তোমাকে কুড়াইয়া আনিয়া এই স্বর্ণ-সিংহাসনে বসাইয়াছি, আজ আমার একটু আধিপত্য তুমি নীরবে সহ্য করিতে পার না, ইহা আশ্চর্য্য বটে!"

আমির—"আশ্চর্য্য কিছুই নয়। যদি সত্যই আমার কিছু উপকার করিয়া থাক, আমার উপর আধিপত্যের দাবী তুমি করিতে পার, কিন্তু আমার নামে আধিপত্যের অপব্যবহার করা তোমার সঙ্গত হইয়াছে কি? আমার অবস্থা, আগেও যাহা ছিল, এখনও তাহাই রহিয়াছে; শুধু এইটুকু পার্থক্য যে দেবোপম ভ্রাতার অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া, আজ রাজমুকুট পরিয়াও আমি তোমার দাসত্ব করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছি না। জানিও জীবন, তোমার জন্য আমাকেও কম ত্যাগ-স্বীকার করিতে হয় নাই! যাহা পাইবার তোমার কোন আশাই ছিল না, তুমি তাহাই পাইবার আশায় ছুটিয়া আসিয়াছিলে, আর আমি যাহা পাইয়াছিলাম তাহা পরিত্যাগ করিয়া তোমার পশ্চাতে ছুটিয়া আসিয়াছি!"

এইরূপে যখন উভয়ের দেনা পাওনা পরিশোধ হইতেছিল তখন প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল যে কেরামত আদেশ অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। জান্‌বিবির হুকুমে সে শীঘ্রই আসিয়া দরবারে উপস্থিত হইল।

জান্‌বিবি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—"সংবাদ কি, কেরামত, তেজোবন্তকে বন্দী করিয়া আনিয়াছ?"

কেরামত—"সেই কাফের ভয়ে পলাইয়া গিয়াছিল, আমরা তাহাকে বন্দী করিতে পারি নাই।"

জান্‌বিবি—"তাহার ধনরত্ন?"

কেরামত—"যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা সামান্যই।"

জানবিবি—"আর কিছু ?"

কেরামত—"কিছুই নহে।"

"মিথ্যা কথা"—এই বলিয়া উন্মাদিনী বেদুনা সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিতে পাইয়া আমির বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল; কেরামত চিনিতে পারিয়া বলিল,—"ও একটা পাগলিনী, উহার কথায় বিশ্বাস করিবেন না।"

বেদুনা—"বিশ্বাস না হয়, চলুন আমি প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিব। আপনাদের সেনাপতি তেজোবন্তের মেয়েকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিয়াছে, আর তাহাকে বিবাহ করিবে বলিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহাও আমি জানি!"

কেরামত ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া বলিল,—"পাগলিনি, দূর হ আমার সম্মুখ হইতে।"

বেদুনা—"না—না, ও কথা বলিও না, আজ আমি নালিশ করিতে আসিয়াছি। ওগো, তোমরা কেহ আমার বিচার কর না গো!"

কিন্তু জানবিবি কোনই উত্তর করিল না। এইমাত্র যাহা সে শুনিয়াছে, তাহাতে তাহার মনে একটু আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল। জানবিবি ভাবিতেছিল,—"কেরামত বুঝি আমার সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া পলাইল! তাহা হইলে এই সঙ্কট সময়ে আমার কি হইবে? আমিরের সঙ্গে ত হিসাব নিকাশ এক প্রকার মিটিয়া গিয়াছে! না, না, এখন কেরামতকে হাতছাড়া করা হইবে না, আধিপত্যের এই দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিবার পক্ষে কেরামত আমার প্রধান সহায়। কেরামত সেনাপতি,

তাহার সাহায্যে সৈন্যমণ্ডলী বশীভূত করিয়া আমিরকে পদচ্যুত করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে কেরামতকে আর দূরে রাখিলে চলিবে না! নাই বা রাখিলাম, আমার পক্ষে সবই সমান, কেরামত আর আমিরে কোনই তফাৎ নাই। কিন্তু তাহার আগে কাফেরের মেয়েকে কেরামতের চক্ষুর বহির্ভূত করিতে হইবে, প্রয়োজন হইলে তাহাকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিতেও দ্বিধা বোধ করিব না।" অতএব জানবিবি কেরামতের দিকে চাহিয়া বলিল,—"রাজকার্য্যে প্রতারণার আশ্রয় করা তোমার সাজে না, কেরামত; যাও, ঘোষণা করিয়া দেও, কাল প্রকাশ্য দরবারে লুণ্ঠিত দ্রব্যসকলের যথাবিহিত ব্যবস্থা করা হইবে; প্রজা সাধারণের অভিযোগাদি শুনিবারও ব্যবস্থা করিতে অবহেলা করিও না; আর, যাহা আনিয়াছ, তাহার প্রত্যেকটী জিনিস, তুচ্ছ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত দরবারে উপস্থিত করিও।"

কেরামত নিতান্ত বিমর্ষভাবে চলিয়া যাইতেছিল। কোথায় সে আশাতীত পুরস্কার লাভ করিয়া সম্মানিত হইবে, আর কোথায় তাহাকে জানবিবির নিকট অবিশ্বাসী সাজিয়া বিদায় লইতে হইল! বেহুনার প্রতি তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যেই সে অগ্রসর হইবার জন্য এক পদ উত্তোলন করিয়াছে, অমনি বেহুনা নিতান্ত করুণস্বরে কাঁদিয়া বলিল,—"যেওনা, যেওনা, তুমি, বলিবার যে আমার আরও অনেক রহিয়া গেল! ওগো, তোমরা কেহ আমার বিচার কর না গো!"

কেরামত করুণদৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া বলিল,—"এইরূপে আমার সর্ব্বনাশ করিয়া তোমার কোন্ স্বার্থ সিদ্ধ হইবে, বেহুনা; এখানে কেহই তোমার অভিযোগ শুনিবে না।"

আমির বাধা দিয়া বলিল,—"না না, আমি শুনিব; বলে যাও পাগলিনী, তোমার বিচারের ভার আমি গ্রহণ করিতেছি।"

কিন্তু কেরামতের দিকে দৃষ্টি করিয়া বেহুনা আর কিছু বলিতে পারিল না। একটু নীরব থাকিয়া সে আমিরের দিকে চাহিয়া বলিল,—"তুমি আমার বিচার করিবে! না, না, তুমি এই বিচার করিবার অধিকারী নও। যে নিজের স্ত্রীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানে না, অন্যের স্ত্রীর দুঃখ সে কি প্রকারে বুঝিবে?" এই বলিয়া উন্মাদিনী বেহুনা মুহূর্ত্তমধ্যে সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

আমির নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। প্রাণের মাঝে যখন সহস্র যন্ত্রণা বিষম জ্বালাময় অনুভূতি লইয়া জাগিয়া উঠে, ইন্দ্রিয়গণ তখন স্তম্ভীভূত হইয়া যায়, চক্ষু দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলে, কর্ণ শুনিতে পায় না, জিহ্বা জড়ভাবাপন্ন হয়, হস্তপদ নির্জ্জিবভাবে পড়িয়া থাকে। আমিরেরও তাহাই হইয়াছিল, কিন্তু একটু পরেই তাহার স্বাভাবিক ক্ষমতা ফিরিয়া আসিল। তখন পাগলিনী বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, জানবিবি এবং কেরামতও সেই গৃহমধ্যে বসিয়া নাই। আমির গৃহমধ্যে পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল,—"ঠিক কথা, এই বিচার করিবার ক্ষমতা আমার নাই। মোহের বশবর্ত্তী হইয়া পুত্র-পরিবার বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম, আজ সেই পাপেই আমার এই প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। লাঞ্ছিতাকে আর পাইব না তাহা ঠিক, সে হয়তঃ এতদিন বাঁচিয়া নাই। কিন্তু জীবন, আমি যাইবার আগে তোমার এই গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া যাইব। ধীরে, অতি ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে, কেহ কিছু না জানিতে পারে, কোন প্রকারে সন্দেহ উপস্থিত না হয়। আজ হইতে আমি কৃত-সঙ্কল্প হইলাম।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নূতন পথে।

পরদিন রাজ-প্রাসাদের এক কক্ষে দরবার বসিয়াছে, উচ্চ মঞ্চের উপর জান্‌বিবি উপবিষ্ট, সম্মুখে কেরামত দণ্ডায়মান। তখন একে একে বিচার-কার্য্য চলিতে ছিল। প্রথম নম্বর অভিযোগকারী ছন্নু মিঞা। আহ্বানমাত্র সে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া তিনবার কুর্ণিস করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—"হজরত বেগম সাহেবা, আমার পিতার আমি একমাত্র পুত্র, তথাপি জীবনের অষ্টাশি বৎসরে পদার্পণ করিয়াও সে আমার হস্তে কার্য্য-ভার প্রদান করিতেছে না, আমার প্রতি কি আদেশ হয়?"

জান্‌বিবি—"তোমার পিতাকে বন্দী করিয়া কারাগারে প্রেরণ কর, এবং নিজ হস্তে কার্য্যভার গ্রহণ কর।"

দ্বিতীয় নম্বরে আসিল আলিমিঞা। পূর্ব্ববৎ তিনবার কুর্ণিস করিয়া সে বলিতে আরম্ভ করিল,—"আমার জ্যেষ্ঠ ভাই, পিতার মৃত্যুর পর তাহার অভিপ্রায় অনুযায়ী, সকল সম্পত্তি দখল করিয়া বসিয়াছে।"

জান্‌বিবি,—"তাহাকে হত্যা করিয়া তুমি যাবতীয় সম্পত্তি স্বাধিকার-ভুক্ত করিতে পার।"

তৃতীয় নম্বরের অভিযোগকারী গণিমিঞা। সে বলিল,—"আমার প্রতিবেশী আমা হইতে অধিক সঙ্গতিপন্ন, তাহার এই সৌভাগ্য আমার প্রতিহিংসার উদ্রেক করিয়াছে?"

জান্‌বিবি—"তোমার সহচরগণসহ ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে শত প্রকারে বিপদগ্রস্ত কর, যে পর্য্যন্ত তাহার ধ্বংস সাধিত না হয়।"

এইরূপভাবে অনেক অভিযোগের বিচার কার্য্য সমাধা হইল। তৎপর কেরামত শান্তাকে আনিয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করিল। সৌন্দর্য্যময়ী সেই প্রতিমা দেখিয়া সভামধ্যে কিরূপ কল্লোল উত্থিত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। রক্ষিগণ বহু কষ্টে শান্তিরক্ষা করিল।

জান্‌বিবি পুনরায় বিচার আরম্ভ করিবে, এমন সময় আমির সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"জীবন, অসহায়া রমণীর প্রতি অত্যাচার কোন্ ধর্ম্ম সমর্থন করিয়া থাকে ?"

জান্‌বিবি—"তাহা তোমার পিতামহদের প্রবর্ত্তিত হিন্দুধর্ম্মের মূলমন্ত্র—যেখানে স্ত্রীলোকেরা নিজের মাংস কাটিয়া লোলুপ পুরুষদিগের বাসনা চরিতার্থ করিতে বাধ্য হয় !"

আমির—"কিন্তু ইসলাম ধর্ম্মটা তুমিই ভাল বোঝ, তাহাও কি রমণীর প্রতি অত্যাচারের পক্ষপাতী ?"

জান্‌বিবি—"কখনও নহে।"

আমির—"তবে এই পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের নামে আমি এই কন্যার মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি।"

জান্‌বিবি,—"বাতুল ! তুমি জান্‌বিবির নিকট কথা বলিতেছ !"

আমির,—"শুধু জান্‌বিবির কেন, সমগ্র পৃথিবীর নিকট দাঁড়াইয়া আমি মুক্তকণ্ঠে ইহা দাবী করিতে পারি। ন্যায়ের নিকট কয়জন জান্‌বিবি মস্তক অবনত না করিয়া থাকিতে পারিবে ?"

জান্‌বিবি—"সাবধান আমির ! ফকির ও এলেমের পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখ ; জান্‌বিবির কার্য্যে বাধা প্রদানে অভিলাষী হইও না।"

আমির—"আমার সে অধিকার আছে।"

"তবে তাহার পরিণাম প্রত্যক্ষ কর।" এই বলিয়া জান্‌বিবি আদেশ

করিল—"এই কাফেরের মেয়েকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখ, অচিরে তাহার সহিত কোন মুসলমান যুবকের পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।"

আমির দেখিল আদেশমাত্র রক্ষিগণ শান্তাকে লইয়া প্রস্থান করিল। ঘৃণা ও অভিমানে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল, সে আর সভাস্থলে দাঁড়াইতে পারিল না; উন্মত্তবৎ বাহিরে চলিয়া আসিল। সে বুঝিতে পারিল কিসের অনুসন্ধানে সে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে, অমনি তীব্র অনুশোচনা আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। মুহূর্ত্তমধ্যে অতীতের স্মৃতি তাহার মনে আসিয়া উদয় হইল—সে আজ দেখিতে পাইল, ভ্রাতার সেই অকপট স্নেহ, পতি পরায়ণা স্বাধ্বী স্ত্রীর অপার্থিব প্রেম, স্বার্থশূন্য সংসারের নিরবচ্ছিন্ন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যতা, তারপর জানবিবির সহিত পরিচয়, তাহার পরামর্শ, অবশেষে স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি ও স্বজাতির উৎপীড়ন! আমির বুঝিল, কে যেন তাহাকে চক্ষু বাঁধিয়া এত দূরে লইয়া আসিয়াছে! আজ বহুদিন পরে জানবিবির পার্শ্বে সে লাঞ্ছিতাকে প্রত্যক্ষ করিল। দেখিল—একদিকে স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা ও আত্মোৎসর্গ, আর অন্য দিকে মোহ,—রূপজ ও কামজ—উন্মত্ততা ও আত্মাভিমান! তাই সে একবার মনে মনে প্রাণ ভরিয়া লাঞ্ছিতাকে ডাকিয়া লইল—"ঐ নির্ম্মল প্রেম-প্রীতি-দায়িনী! মম জীবন স্নিগ্ধকারিনী ঐ! আজ একবার আসিয়া আমার হৃদয়ে শান্তির প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়া যাও। এইবার আমি চির-স্থির, আমরান্ত-প্রণয়!"

ঠিক সেইসময়ে লাঞ্ছিতা বসিয়া ফকিরকে উপদেশ দিতেছিল। হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া হৃদয়ের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—"আমি রাজপ্রাসাদে যাইব।"

ফকির—"কেন, মা?"

লাঞ্ছিতা,—"আজ আবার তিনি আমাকে ডাকিয়াছেন!"

এদিকে সভাভঙ্গের পর প্রাসাদের এক নির্জ্জনকক্ষে চিন্তাক্লিষ্ট জান্‌বিবির পদপ্রান্তে কেরামত আদেশ অপেক্ষায় বসিয়াছিল। হঠাৎ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া জান্‌বিবি জিজ্ঞাসা করিল,—"কেরামত, তুমি আবার বিবাহ করিবে?"

কেরামত বিস্মিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

জান্‌বিবি বলিল,—"তেজোবন্তের মেয়ে তোমার শয্যাশায়িনী হইবার উপযুক্তা।" কেরামত তিনবার কুর্ণিস করিয়া বলিল,—"গোলাম আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না।"

জান্‌বিবি—"আমার হুকুম।"

কেরামত—"এইজন্য গোলাম প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে।"

জান্‌বিবি,—"কি! আমার আদেশ অবহেলা। শাস্তি গ্রহণ কর।" এই বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে তাহার টুক্‌টুকে পা দুখানি কেরামতের কোলের উপর তুলিয়া দিল।

আজ কেরামতের সাধনা সফল হইয়াছে।

কিন্তু এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে জীবনের মাতা তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। জান্‌বিবি বিস্মিত হইয়া দরবারের বেশেই মাতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার চাকচিক্যময় পরিচ্ছদ দেখিয়া বৃদ্ধা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন,—"জীবন, দেখ, হিন্দুগ্রামের নৃশংস ব্যবহারে আমার কি দুর্গতি হইয়াছে! যদি তোমাকে গর্ভে ধরিয়া মানুষ করিয়া থাকি, তাহা হইলে অমৃতের মাতার এই অবস্থা করিয়া আমার পরকালের তৃপ্তি বিধান করিও।" এই বলিয়া বৃদ্ধা প্রাণত্যাগ করিলেন।

জীবনের হৃদয়ে আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

বসুধৈব কুটুম্বকম্।

এইরূপে জীবনের মাতাকে বহরে পৌছাইয়া দিয়া, সন্ন্যাসী অনুভব করিল, তাহার সকল বন্ধনই যেন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে! পিতৃস্নেহ হইতে সে বঞ্চিত হইয়াছিল, একটা বস্তীর্ণ জনপদের আধিপত্যও তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু যে একমাত্র আশ্রয় অবলম্বন করিয়া সে এইসকল প্রার্থনীয় জিনিস অকাতরে বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছিল, আজ তাহাকেও এইভাবে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী চতুর্দ্দিক শূন্য বোধ করিল। শাস্তার অপহরণেও সে একেবারে অভিভূত হইয়া পরিয়াছিল। তাই প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সে দীর্ঘনিশ্বাসসহকারে বলিয়া উঠিল,—"হায়! আজ আমি কাহার কল্যাণে বাঁচিয়া থাকিব!"

পাপাত্মা তাহার সঙ্গেই আসিয়াছিল, সে দেখিল সন্ন্যাসী ভালরূপে পথ চলিতে পারিতেছে না, তাহার সকল গ্রন্থি যেন একেবারে শিথিল হইয়া গিয়াছে! বিশেষতঃ তাহার মুখে উক্ত প্রকার আক্ষেপের বাণী শুনিয়া সে একেবারে চমকিয়া উঠিল। অমনি সন্ন্যাসীর হাত ধরিয়া সে বলিল,—"তুমি কি মনে কর, মানুষ যে গণ্ডীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করে তাহার বাহিরে তাহার সুখ শান্তি স্নেহমমতার আর কিছুই থাকিতে পারে না?"

সন্ন্যাসী—"নিশ্চিত যাহা, তাহা আমি হারাইয়াছি; অনিশ্চিতের আশা করিয়া আর কি হইবে?"

পাপাত্মা আর কিছু বলিল না, কিন্তু সন্ন্যাসীকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য সে ফকিরের বন্ধুগণের সঙ্গে তাহাকে মিশাইয়া দিল। অবিলম্বেই

সন্ন্যাসী বুঝিতে পারিল যে পৃথিবীতে বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতার অভাব নাই, কার্য্যও অনন্ত পড়িয়া রহিয়াছে। তারপর একদিন পাপাত্মা তাহাকে আনিয়া লাঞ্ছিতার সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। তখন সন্ন্যাসী বুঝিতে পারিল যে মাতৃস্নেহ অপার্থিব জিনিষ বটে, কিন্তু জগতে একেবারে দুর্ল্লভ নহে! লাঞ্ছিতাও আর তাহাকে ছাড়িয়া দিল না, নিজের স্নেহের ক্রোড়েই পালন করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুখার দৌত্য।

দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিয়া সুখা চলিয়া আসিয়াছে। মস্তকে বিক্রেয় দ্রব্য সকলের প্রকাণ্ড বোঝা, হস্তে দীর্ঘ যষ্ঠি, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সে তাহার ক্লান্ত দেহটাকে বহরের কুটীর হইতে কুটীরান্তরে মন্ত্রমুগ্ধবৎ পরিচালিত করিয়া ঘুড়িয়া বেড়াইয়াছে। এইপ্রকার অভিযানে সে যে সম্পূর্ণই অনভ্যস্ত ছিল তাহা নহে, কিন্তু অবসাদ আসিয়া আজ তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। যখন নিজের স্বামীর গাড়ী টানিয়া সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুড়িয়া বেড়াইত, তখন অবসাদই ছিল তাহার শত্রু, সেই শত্রুকে সে মনের বলে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার সেই হৃদয়ের বলের অধিকাংশই সে তাহার স্বামীর নিকট ফেলিয়া আসিয়াছে, অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহার অনেকখানিই শুধুই দুর্ব্বলতা, শুধুই বিষাদময়! তাই পদ তাহাকে অগ্রবর্ত্তী করিলেও, হৃদয় তাহার প্রতি-মুহুর্ত্তেই পশ্চাতের দিকে নুইয়া পড়িতেছিল। এইরূপে চলিতে চলিতে একদিন দ্বিপ্রহরের সূর্য্যকিরণে তাপিত হইয়া সুখা বহরের এক নির্জ্জন বনপ্রদেশে এক বৃক্ষমূলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

তখন বাতাস মৃদু বহিতেছিল। সেই কোমল স্পর্শে শরীর তাহার

যতই স্নিগ্ধ হইতে আরম্ভ করিল, বৃক্ষশাখাস্থিত পক্ষিগণের মৃদু কলরবে ততই তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিতে লাগিল। অবিলম্বে ধরিত্রীর ক্রোড় আশ্রয় করিয়া সুখা তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

বেহুনা তখন সেই বনপ্রদেশে বিচরণ করিতেছিল। একটী অপরিচিতা রমণী এইরূপ নিরাশ্রয়ভাবে বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া সুখার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুখার বোঝা তাহার নিকটেই ভূমিতলে রক্ষিত হইয়াছিল, বেহুনা তাহার বাঁধন খুলিয়া একটী একটী করিয়া বিক্রেয় জিনিসগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। চঞ্চলতা তখনও তাহাতে পূর্ণরূপেই বিদ্যমান ছিল, তাই একটীর পর আর একটী জিনিস যথাযথভাবে সজ্জিত করিয়া রাখিবার কালে, একটীর গায়ে আর একটী নিক্ষেপ করিয়া সে যে উৎকট শব্দ উৎপাদন করিল, তাহাতে সুখার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চমকিত হইয়া উঠিয়াই সে বেহুনাকে হাত ধরিয়া বাধা প্রদান করিয়া বলিল,—"একি! তুমি কে?"

বেহুনা প্রসন্নমুখে উত্তর করিল,—"আমি বেহুনা গো।"

সুখা—"তা যেই হওনা কেন, কিন্তু এই জিনিসগুলি লইয়া তুমি কি করিতেছিলে?"

বেহুনা—"আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলাম, তুমি বেদে, না, বোঝা! তা ভাই, এই নির্জ্জনবনে এমন একরাশি রূপ লইয়া তুমি ঘুমাইতে এলে, কেন? না, তুমি বাসি ফুল?" এই বলিয়া বেহুনা সুখার চিবুক ধরিয়া একটু নাড়িয়া দিল।

সুখা অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—"তুমি মর!"

বেহুনা—"তাহা হইলেই আমি বাঁচি।"

সুখা—"এত দুঃখ!"

বেহুনা—"তাহাও অনুভব করিবার ক্ষমতা আমার আছে নাকি?"

এই বলিয়া বেহুনা কিছুদূর ছুটিয়া গিয়া পুনরায় সংযত হইয়া আসিয়া সুখার নিকট উপবেশন করিল।

দুঃখ যে কাহাকে বলে সুখা তাহাতে অনভিজ্ঞ নয়, কাজেই দুঃখী দেখিলেই দুঃখিত হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। আবার সে বুদ্ধিমতীও বটে, তাই নানাপ্রকার তুষ্টবাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া সে শীঘ্রই বেহুনাকে আপনার করিয়া লইল, আর তাহার নিজের কথাও সবিস্তারে বলিতে গিয়া সে বেহুনার নিকটে এতটাই আত্মসমর্পন করিয়া বসিল যে তাহার সারাজীবনের অতি ক্ষুদ্র ঘটনাও তাহার নিকট অপরিজ্ঞাত রহিল না। শুনিয়া বেহুনা সমবেদনারস্বরে বলিল,—"তবে ত দেখিতেছি তুমি বিষাদসাগরে ভাসিতেছ! এখন তোমার মরণই শান্তি।"

সুখা—"না ভাই, একথা বলিও না, আমি মরিলে আমার স্বামীর উপায় কি হইবে! বরং ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর, আমি সুস্থ থাকিয়াই যেন তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করিয়া যাইতে পারি।"

কথাটা বেহুনার হৃদয়ে আসিয়া বিষম আঘাত করিল, আর তৎক্ষণাৎ তাহার মনে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল।

সে পুনরায় মুখে হাসি লইয়া সুখাকে বলিল,—"তাইত, দেখিতেছি, তুমি ভাই, মস্ত ওঝা!"

সুখা—"দূর, আমি বুঝি?"

বেহুনা—"তবে?"

সুখা—"যিনি আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন তাঁহার কথা বল।"

বেহুনা—"তাঁহার শিষ্যা ত তুমি, তোমাকে আমার একটা কাজ করিতে হইবে।"

সুখা—"কি?"

বেহুনা—"ঐ যে দেখিতেছ বৃক্ষের অন্তরালে একখানা বাড়ীর ঈষৎ

আভাসমাত্র দেখা যাইতেছে, ঐ বাড়ীটাই আমি বড় ভালবাসি। কিন্তু ইহার মধ্যে এমন অনেক জিনিস আছে যাহার এক একটা কোমল করিয়া গড়িয়া তুলিতে তোমার এক জন্মও কাটিয়া যাইতে পারে! তোমাকে যাইয়া দেখিয়া আসিতে হইবে ঐ বাড়ীতে আমার একটু স্থান হয় কিনা। চল, আমার সহিত, তোমাকে দেখাইয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া বেদনা সুধাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। অকস্মাৎ এক স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল,—"আমি আর যাইতে পারিব না, তুমি এই পথ ধরিয়া চলিয়া যাও, ঐ যে পুকুরধারে প্রকাণ্ড চারিমহল বাড়ী দেখিতে পাইতেছ, সেই বাড়ীতেই প্রবেশ করিও।" এই বলিয়া বেদনা প্রবল ঝড়ের মত একদিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সুধা পথ বাহিয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু যেখানে চারিটী পথ এক কেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, সেখানে সে পথ ভুলিয়া যাইতেছিল, অকস্মাৎ পশ্চাৎ দিক হইতে বেদনা আসিয়া "এই পথে" বলিয়াই পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেল। সুধা পুনরায় চলিতে চলিতে কেরামতের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তখন কেরামতের প্রধানা বেগম দারুণ বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিল। আজ এতদিন পরে সে বুঝিতে পারিয়াছে কে তাহার বড় আপনার, আর সে নিজেই বা কি? এতদিন আধিপত্যের পূর্ণগৌরবে অন্ধ হইয়া সে জগতটাকে তলাইয়া দেখিবার অবসর পায় নাই। রুদ্ধ পিঞ্জরের স্বর্ণ-বিহঙ্গিনী সাজিয়াছিল সে, যখন দুইটী তৃষিত শ্রবণ বাসনার তীব্র জ্বালা লইয়া আসিয়া বিবিধ প্রকারে তাহার মন ভুলাইতে প্রয়াস পাইত, তখন দুই একটী অভ্যস্ত বুলি বলিয়া সোহাগের শ্রেষ্ঠ দান আদায় করিয়াই সে ভাবিত জগতটাই তাহাকে ভালবাসে! যখন আদেশমাত্র সে দেখিত যে শত শত বিনীতমস্তক তৎপ্রতিপালনে

চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইয়াছে, তখন সে ভাবিত—এই জগৎটাই তাহার বশীভূত। আর তাহার অপ্রতিহত প্রভাবে হস্তক্ষেপ করিতে পারে এমন কেহ তাহার কল্পনাপথে উদয়হওয়ামাত্রই তাহাকে নির্য্যাতন করিতে যাইয়া সে নিজকে যাহা কল্পনা করিত, বেচুনার সঙ্গে ব্যবহারেই তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন তাহার এই ভীষণ পীড়ার সংবাদ অবগত হইয়াও কেরামত আসিল না, বরং পৌরবর্গকে সাবধান হইতে লিখিয়া দিল, এবং এই সুযোগে দাসদাসী সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন বেগমের প্রথম মনে হইল যে এই সংসারে তাহার আপনার বলিতে কেহই নাই। মানবী সে, সুন্দরী রমণীও সে ছিল, কিন্তু আজ সে বুঝিতে পারিল যে জগত তাহাকে মানবের আসনে বসিতে দেয় নাই, তাহার রূপের সেবাই করিয়া আসিয়াছে! ওগো, এমন কেহ নাই কি জগতে, যে একমাত্র তাহাকেই চায়, রূপহীন, বিত্তহীন, আধিপত্যবিহীন একমাত্র তাহাকেই অঞ্চল দিয়া ঘিরিয়া রাখিতে পারে? তাই অসহ্য রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে বেগম ডাকিতেছিল,—"মা, মা", এমন সময়ে সুখা আসিয়া আঙ্গিনামধ্যে দাঁড়াইল। বেগমের আর্ত্তনাদে আকৃষ্ট হইয়া সে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল বেগমের সর্ব্বশরীর ফুলিয়া গিয়াছে, শরীরে সূচিবিদ্ধ করিবার স্থান পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! সহানুভূতির সহিত অগ্রসর হইয়া সুখা বেগমের গায়ে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিল।

সে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি, মা?"

সুখা—"আমি ভিখারী গো।"

বেগম—"আমার দুঃখ দেখিতে আসিয়াছ?"

সুখা—"তোমার পরিচর্য্যা করিতে আসিয়াছি।"

বেগম—"কেন?"

সুখা—"তোমার নিতান্ত দরকার বলিয়া।" শুনিয়া বেগম চুপ করিয়া রহিল।

তারপর সুখার ঐকান্তিক শুশ্রূষার গুণে বেগম যখন নিরোগ হইয়া উঠিল, তখন এই দারুন ব্যাধি তাহার অতুলনীয় চক্ষু দুইটী এবং সেই অনুপম সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে লোপ করিয়া দিয়াছিল। সে উৎকণ্ঠিত হইয়া কেরামতের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, যেন কত অপরাধী সে, নিশ্মম বিচারকের নিকট হইতে তাহাকে দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে! দেখা করিবার পূর্ব্বে কেরামতও একটা কৈফিয়ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, দরকার বোধ করিলে সে তাহা আওড়াইবে। কিন্তু বেগমকে দেখিয়া সে কৈফিয়তের কোনই প্রয়োজন বোধ করিল না। যেন এক যুগ পরে উভয়ের সাক্ষাৎ, "কেন আসিলে না" বলিয়া যখন বেগম উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের আবেগে ভূমিতলে বসিয়া পড়িল, কেরামত কিন্তু তাহাকে একটীও সান্ত্বনার কথা বলিল না, বরং বিরক্তিসহকারে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। আর সেই আঘাতে সংজ্ঞাহীন হইয়া বেগম ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

পরদিন কেরামতের আদেশে অন্দরের একটী নিকৃষ্টতম ঘরে বেগমের বাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট হইল। দাসদাসী তাহার আর একটীও রহিল না; সুখাই তাহাকে রান্না করিয়া দিতে লাগিল। তথাপি ভাটার নদীর জলস্রোতের ন্যায় রহিয়া রহিয়া তাহার দিন চলিতেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এক দিনের অনিচ্ছাকৃত একটা অপরাধে তাহাকে চিরদিনের জন্য আশ্রয়চ্যুত হইতে হইল।

সেদিন স্নান সমাপনান্তে বেগম বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছিল। হস্ত ও পদকে চক্ষুরকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সমস্ত পথটা অনুভব করিয়া আসিবার কালে সে পথ ভুলিয়া পার্শ্বস্থ উদ্যানের মধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইল। উদ্যানে

কেরামতের স্বহস্ত-রোপিত একটা গোলাপের গাছ ছিল, বেগমের পদাঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল। কথাটা কেরামতের কর্ণে উঠিতে অধিক সময় অতিবাহিত হইল না। শুনিবামাত্র অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া আসিয়া সে বেগমকে বলিল,—"তোমাকে আর এই বাড়ীতে থাকিতে হইবে না।"

বেগম—"কেন ?"

কেরামত—"আজ গোলাপের গাছটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কাল আমার আর কি সর্ব্বনাশ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে ?"

বেগম—"আমার অক্ষমতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দয়া কর।"

কেরামত—"তোমার অক্ষমতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই বলিতেছি যে তোমাতে আর আমার কোন প্রয়োজন নাই।"

বেগম দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"কিন্তু এমন দিন ত ছিল, যখন আমিই তোমাকে এমন অনেক জিনিস দান করিয়াছি যাহা পাইয়া তুমিই শত শত বার নিজ মুখে বলিয়াছিলে "অপার্গিব"।"

কেরামত—"সেদিন আর তোমারও নাই, আমারও নাই। আমি তোমাকে আর আশ্রয় দিতে পারিব না।"

বেগম—"আশ্রয় যে আমি পাইব না, তাহা আমিও বুঝিতে পারি। আজ মনে পড়ে, একদিন আর একজনকে এইরূপ ভাবেই আমি বিদায় করিয়া দিয়াছিলাম, তাহার যে শাস্তি তাহা আমি প্রসন্নবদনেই গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু বিনা অপরাধে তুমি আমাদের দুইজনকে যেভাবে বিদায় করিয়া দিলে, তোমাকেও যাহাতে সেইভাবে বিদায় লইতে না হয় তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখিও।" এই বলিয়া সুখার হস্ত ধরিয়া বেগম রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। তাহার চক্ষু দিয়া অজস্র অশ্রুস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল; পথিমধ্যে বেহুনা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইল। বেগম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে গো ?"

বেহুনা—"আমি বেহুনা। তোমাকে লইতে আসিয়াছি।"

বেগম—"আজও তুমি আমাকে ভুলিতে পার নাই!"

বেহুনা—"আজই তোমাকে ভুলিয়াছি।" এই বলিয়া উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু সুখা আর অগ্রসর হইল না। সে তাহার জিনিসের বোঝাটী জলে নিক্ষেপ করিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আতুরের শিক্ষা।

এই জগতে কখনও মানবের বৃদ্ধত্ব তাহার বয়সের হিসাব লইয়া পরিমাণ করা হয় না; এমনও দেখা যায় যেখানে অশীতিপর বৃদ্ধ ও সদ্যপ্রসূত শিশু একই সমতলে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে! সুখার স্বামী তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

পশু জগতকে লোভ ও ভয়প্রদর্শন করিয়া আয়ত্বাধীনে আনয়ন করা হয়, শিশুগণকেও সংযত করিবার জন্য আমরা তদ্রূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি। সুখার স্বামীকেও উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে এলেম এই প্রথাই অবলম্বন করিল। অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া মানব আপনিই গঠিত হইয়া উঠে, যখন তাহাকে বাহিরের শত অভাবে মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া যায়। অভাব অনুভূত হইলেই তাহা মোচনের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই আমাদের মনে আসিয়া উদিত হয়—নিতান্ত জড়ভাবাপন্ন ব্যক্তিও জলে পড়িলে একবার হাত পা নাড়িয়া চেষ্টা করিয়া থাকে। এইরূপ চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মনির্ভরতা আসিয়া উপস্থিত হয়—ইহাই শিক্ষার প্রথম সোপান।

পত্রসহ সুখাকে পাঠাইয়া এলেম তাহার স্বামীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে? সুখা?"

এলেম—"না। তাহাকে কোন বিশেষ কার্য্যে আমি স্থানান্তরে পাঠাইয়াছি, বোধ হয় শীঘ্র ফিরিতে পারিবে না।"

কণ্ঠস্বর শুনিয়াই সে বুঝিতে পারিল যে স্বয়ং এলেম আসিয়া তাহার সহিত কথা বলিতেছে, অমনি ভয়ে জড়সড় হইয়া সুখার স্বামী বলিল,—"তা, আমার এই কয় দিন চলিবে কি প্রকারে?"

এলেম—"কেন? আমি রান্না করিয়া তোমাকে পাঠাইয়া দিব; তুমি কোনমতে অন্যান্য কার্য্য চালাইয়া লইও। এই কয়টা দিন বইত নয়! কেমন পারিবে না?"

সুখার স্বামী একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল; তথাপি স্বীকৃত না হইলে পাছে এলেম রাগ করে, এই ভয়ে নিতান্ত ভালমানুষটীর মত মাথা নাড়িয়া সে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। তখন এলেম বলিল,—"তা বেশ।" এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

পর দিন হইতে দুই বেলা সুখার স্বামীর জন্য দুই থালা ভাত আসিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু এই পর্য্যন্ত; এলেম অন্যান্য কোন কার্য্যেই সুখার স্বামীকে সামান্যও সাহায্য করিত না। প্রথম দিন বেচারা ভাত খাইল, কিন্তু থালা ধুইল না; বিকালে এলেম আসিয়া তাহা দেখিয়া বলিল,—"একি! উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি এখনও পড়িয়া আছে; পরিষ্কার করিয়া রাখিতে পার নাই?"

সুখার স্বামী হতাশভাবে বলিল,—"তাহাও কি আমাকে করিতে হইবে?"

এলেম,—"হাঁগো, হাঁ! ভাত সিদ্ধ ছাড়া তোমাকে সবই করিতে হইবে, এ কথা যে সেই দিন বলিয়া দিয়াছি।"

সুখার স্বামী অমনি উঠিয়া বাসন ধুইতে ব্যস্ত হইল।

পরদিন আবার খাদ্য আসিল; এলেম আহার্য্যবস্তুগুলি অন্ধের নিকট রাখিয়া চলিয়া গেল। তখন সুখার স্বামী ভাত সম্মুখে লইয়া ভাবিতে বসিল। বাসন যে ধুইতে হইবে এই কথাটাই সর্ব্বপ্রথম তাহার মনে

আসিয়া উদিত হইল। তাহার বড় রাগ হইল,—তাহাকে কিনা অবশেষে ইহাও করিতে হইতেছে, সে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিয়া কিছুতেই ভাত খাইবে না। মনের আবেগের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাত পা গতিশীল হইল, অমনি ধাক্কা লাগিয়া জলের গ্লাসটী ভাতের থালার উপর পড়িয়া গেল; কাজেই তাহার আর সেই বেলা খাওয়া হইল না। অপরাহ্নে এলেম আসিয়া তাহা দেখিয়া তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া তাহার রাত্রের আহারও বন্ধ করিয়া দিল।

অন্য দিন এলেম আসিয়া দেখিল সুখার স্বামীর থাকিবার ঘরটী বড়ই অপরিস্কৃত হইয়া রহিয়াছে, অমনি সে তিরস্কার করিয়া বলিল,—"একি! ঘরখানাও দিনের মধ্যে একবার ঝাটাইতে পার না? এ যে গোয়ালেরও অধম হইয়া রহিয়াছে! অপরিষ্কার গৃহে থাকিলে ব্যারাম হয়, আর একদিন এতরূপ দেখিলে আমি তোমার ভাত রাঁধা বন্ধ করিয়া দিব।" এই বলিয়া এলেম চলিয়া গেল।

সুখার স্বামী ঝাটা হাতে করিয়া ঘর পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল। এইবার সুখার কথা তাহার মনে হইল, সে ক্রমে বুঝিতে পারিল, সুখা তাহার জন্য কতখানি করিয়াছে! মানুষের স্বভাব এমনই, যতদিন অভাব না আসে, ততদিন তাহারা বস্তুর প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না!

একদিন বিষাদিত সুখার স্বামী এলেমকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ! মা! সুখা কবে আসিবে?"

এলেম—"কি করিয়া বলিব? সে কি আর এদেশে আছে?"

শুনিয়া সুখার স্বামী একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

এলেম জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন?"

সুখার স্বামী—"সে আসিলে, আমি তাহাকে একবার রান্না করিয়া খাওয়াইতাম" শুনিয়া হাসিতে হাসিতে এলেম চলিয়া গেল।

তারপর যখন সুখার স্বামী অনুশোচনায় জলিয়া পুড়িয়া সংশোধিত

স্বর্গের ন্যায় হইয়াছে, এমন সময় সুখা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। আজ বহুদিন পরে আবার পতিপত্নীতে মিলন হইবে, একজন শত দুর্ব্ব্যবহারের ধার পরিশোধ করিতে ইচ্ছুক, অন্যজন তাহার কিছুই অবগত নহে। আসামাত্র সুখার স্বামী উৎফুল্ল হইয়া বলিল,—"একি! সুখা আসিয়াছ?"

সুখা—"হাঁ!" এই বলিয়া সে স্বামীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

স্বামী—"এত দিন কোথায় ছিলে?"

সুখা—"নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে।"

স্বামী—"তাইত, সারাদিন হাটিতে হাটিতে তুই বড় রোগা হয়ে গেছিস্? আয়, এদিকে বসিয়া একটু বিশ্রাম কর।" এই বলিয়া সে হাত ধরিয়া সুখাকে নিজের পার্শ্বে বসাইল।

সুখা কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল,—"আজ এ নূতন কথা কেন? আমার জন্য তুমি ভাব?"

স্বামী—"ভাবি না?"

সুখা—"কই, এতদিন চলিয়া গিয়াছে, এমন কথাত তোমার নিকট একদিনও শুনিতে পাই নাই!"

স্বামী—"এত দিন আমি নিজের অভাবই অনুভব করিতে পারি নাই, পরের দুঃখ কি করিয়া বুঝিব! আজ ওসব ভুলিয়া যাও।" এই বলিয়া সে সুখাকে একটু আদর করিল। সুখা বিস্ময়ের সহিত দেখিল তাহার স্বামীর চক্ষে জল ঝরিতেছে; সে বুঝিতে পারিল ইহা হৃদয়ের প্রকৃত উচ্ছ্বাস ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, তাই আনন্দে সেও হৃদয়ের বেগ দমন করিতে পারিল না, সুখা স্বামীর কাঁধে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

স্রোতের বেগ ফিরিয়াছে, সুখা নূতন সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, আজ প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল সে একবার যাইয়া এলেমের পদে মাথা কুটিয়া জানিয়া আসে মানুষ গড়িবার তাহার এমন কি অদ্ভুত ক্ষমতা আছে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

——:০:——

শিক্ষার ব্যভিচার।

হিন্দুগ্রামের প্রান্তভাগে বহরের সন্নিকটে এক ঘর সঙ্গতিপন্ন হিন্দুগৃহস্থ বাস করিত। দেশের সর্ব্বত্র তাহার প্রতিপত্তি ছিল। সে যে সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ তাহা বলিয়া নহে, কিন্তু ন্যায়পরায়ণ ও পরোপকারী ব্যক্তি বলিয়া সকলেই তাহাকে সম্মান করিয়া চলিত। যখন দেশে দেশে শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে সামান্য আন্দোলনও উপস্থিত হয় নাই তখন এই হিন্দুগৃহস্থ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই নিজব্যয়ে স্বগ্রামে একটী উচ্চ অঙ্গের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। জনসাধারণের উপকারার্থে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিতেও সে দ্বিধাবোধ করে নাই। ইহা ব্যতীত দেশের রাস্তাঘাট ও পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতির সংস্কার-কার্য্যেও অর্থব্যয় করিতে সে কখনও কুণ্ঠিত হইত না। তাহার অধিকাংশ প্রতিবেশীই ছিল মুসলমান, অথচ তাহার দীর্ঘজীবনের মধ্যে এমন একটী দিনও অতিবাহিত হয় নাই, যে দিন হিন্দু ও মুসলমানে তারতম্য করিয়া সে কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত করিয়াছে। দেশে এমন দুঃস্থ পরিবার ছিল না, যে তাহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হয় নাই; এমন গৃহস্থ ছিল না যে সুবিধাজনক সর্ত্তে তাহার নিকট হইতে ভূমি গ্রহণ করিয়া লাভবান হয় নাই। তাহাদের কেহ ছিল তাহার "চাচা" আবার অনেকেই "দাদাভাই" প্রভৃতি আত্মীয়তা সূচক সম্বোধনে তাহাকে অভিহিত করিত। দোল, দুর্গোৎসব, ঈদ, মহরম প্রভৃতি পর্ব্বে তাহাদের আদান প্রদান চলিত; এইরূপে উভয়সম্প্রদায় পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া সুখে বাস করিতেছিল।

তারপর সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া দেশে অনেক মৌলবী ও মুন্সির সৃষ্টি হইল। তাহারা বিবিধ ছন্দে-বন্দে মুসলমানগণকে বুঝাইয়া দিল যে মহম্মদ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ, আর ভারতবর্ষ তাহাদের মাতৃভূমি নহে, কেবল বাসভূমি মাত্র। চীনে যে মুসলমান আছে, তাহারা নাকি বাবরকে তাহাদের পিতামহ মনে করিয়া ভারতবর্ষ জয়ের জন্য গৌরব অনুভব করিয়া থাকে! ধর্ম্মকার্য্যের জন্য গোহত্যা যে না করিলেই নয়, এই কথা এতদিন এত কঠোরভাবে না বুঝিয়া মুসলমানগণ অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছিল। এইরূপ শিক্ষার দরুন হিন্দুমুসলমানের প্রীতির বন্ধন অচিরেই শিথিল হইয়া পড়িতেছিল।

কিন্তু আমরা সঙ্গতিপন্ন হিন্দুগৃহস্থের কথা বলিতেছিলাম। সেদিন প্রাতকৃত্য সমাপনান্তে সে সবেমাত্র বাহিরে আসিয়া বসিয়াছে, এমন সময়ে তাহার প্রতিবেশী এক মুসলমান বন্ধু আসিয়া বলিল,—"ভাই, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে!"

গৃহস্থ—"কি?"

বন্ধু—"আমার ছোট ভাইকে তুমি ভালই জান, সে জানবিবির নিকটে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছে।"

গৃহস্থ—"কেন?"

বন্ধু—"আমার আধিপত্য নাকি তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, সে এখন আমাকে বন্দী করিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিতে চাহে।"

শুনিয়া গৃহস্থ কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিল,—"ভাই, এই বিপদের প্রতিকার করিবার সামর্থ্য আমারও নাই, তবে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার, সময়োচিত সাহায্য হইতে তুমি বঞ্চিত হইবে না।"

তারপর ছোট ভাই আসিয়া যখন শত প্রকারে চেষ্টা করিয়াও বড় ভাইকে অপসারিত করিতে পারিল না, তখন সে যাইয়া কেরামতের

সাহায্য প্রার্থনা করিল। কেরামত তাহার অধীনস্থ একদল সৈন্যকে তাহার অনুগমন করিতে আদেশ প্রদান করিল। এইরূপে বল সঞ্চয় করিয়া সে আসিয়া শুধু তাহার অগ্রজেরই সর্ব্বনাশ সাধন করিল না, কিন্তু যাহারা তাহাকে অনুমাত্রও সাহায্য প্রদান করিয়াছিল, তাহাদিগকেও লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করিতে লাগিল।

কিন্তু নূতন আধিপত্য গ্রহণ করিয়াই সে সর্ব্বপ্রথমে বুঝিতে পারিল যে পূর্ব্বোক্ত হিন্দু-গৃহস্থের প্রতাপ ক্ষুণ্ণ না করিতে পারিলে যে সে তাহার আধিপত্যেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না! শিক্ষা প্রভাবে তাহার কার্য্য করিবার ক্ষেত্রও প্রস্তুত হইয়াছিল। যাহারা গৃহস্থকে খাজনা দিয়া জমি চাষ করিত, তাহারা সকলেই একযোগে খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল। যাহারা ভাগে জমি চাষ করিত, তাহারা পূর্ব্বসর্ত্ত একেবারে অস্বীকার করিয়া বসিল। গৃহস্থ যখন উপায়ান্তর রহিত হইয়া রাজদ্বারে অভিযোগ লইয়া উপস্থিত হইল, দেখিল অবিকল তাহার হস্তাক্ষরে লিখিত রসিদ তাহারই বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা হইয়াছে! এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাহার আয়ের পথ ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু সংসার-খরচ তাহার অতি সামান্যই ছিল, তথাপি তাহা দ্বারা স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলি লইয়া সে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। অর্থ ব্যয় করিয়াও সে কাজ করিবার লোক সংগ্রহ করিতে পারিতেছিল না। মুসলমানগণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল, তাহারা আর হিন্দুর কোন কার্য্য করিবে না, সর্ব্ব প্রকারে হিন্দুকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের স্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত করিবে। এইরূপে জটিলতা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি সুচারুরূপে পরিচালিত করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন ততই অধিক হইয়া পড়িল। গৃহস্থ নিজের যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এই সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। এইরূপে সর্ব্বস্বান্ত

হইয়া যখন সে বিত্তহীন, প্রতিপত্তিহীন, অনাদৃত ও অবহেলিত অবস্থায় সত্য সত্যই মৃত্যুর সীমায় পদার্পণ করিল, তখন একদিন নিজের দলবল লইয়া ফকির আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া বৃদ্ধ ছটফট করিতেছিল, দেখিয়া সমবেদনার স্বরে তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া ফকির বলিল,—"আপনার প্রতি যে অবিচার হইয়াছে, শত চেষ্টা করিয়াও আমরা তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারি নাই, আর আজ এইভাবে আপনাকে মরিতে দেখিয়া আমাদের বুক ফাটিয়া যাইতেছে।"

বৃদ্ধ তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুটী ফকিরের প্রতি ন্যস্ত করিয়া বলিল,—"ভ্রান্তি, তাহাদের বিষম ভ্রান্তি! যদি কেহ মনে করিয়া থাকে যে এইরূপ ভাবে আমাকে অপদস্থ করিয়া আমার নাম পৃথিবী হইতে লোপ করিয়া দিবে, তুমি তাহাকে বলিও যে আমি মরিব না, মৃত্যুই আমার শেষ নহে! দেশে এমন কোন ব্যক্তি নাই যে আমাদ্বারা উপকৃত হয় নাই, এমন কোন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান হয় নাই যাহাতে আমি হস্তক্ষেপ না করিয়াছি। দেশের সাহিত্য, সভ্যতা, সমাজ, শিল্প ও বিজ্ঞান আমার আশ্রয়েই প্রতিপালিত হইয়াছে! আজ নশ্বর যাহা তাহাই আমি লইয়া চলিলাম, যাহা অবিনশ্বর তাহাই শুধু পড়িয়া রহিল, তাহার নিকট এক দিন সকলেরই মস্তক অবনত করিতে হইবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধ শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অদ্ভুত অভিযান।

পূর্ব্ব বর্ণিত উপায়ে কেরামত ও জান্‌বিবির ঘনিষ্ঠ সম্মিলনে পৃথিবীতে যে মহা অনিষ্টের সূত্রপাত হইয়াছিল, জগতের ইতিহাসে সেই বিবরণ কিরূপ ভাষায় লিখিত রহিয়াছে তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেই অবগত আছেন। আমরা তাহার একটা দিক মাত্র দেখাইবার চেষ্টা করিব। মিলন অনেক প্রকারে সংঘটিত হইয়া থাকে, এবং তাহার ফলও বিভিন্ন মূর্ত্তি ধরিয়া জগতে প্রকটিত হয়। উদ্দীপনা শক্তি ও কার্য্যকরী ক্ষমতা অভিন্নভাবে মিলিত হইলে, জগতের প্রভূত ইষ্টও হইতে পারে, অনিষ্টও হইতে পারে। যে আধারে ইহারা সম্মিলিত হয়, তাহার প্রকৃতি ভেদেই ইষ্টানিষ্ট সূচিত হইয়া থাকে। কেরামত নীচ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া জান্‌বিবির সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল, আর জান্‌বিবিও নিজ স্বার্থসিদ্ধির মানসে কেরামতের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল,—উভয়ের উদ্দেশ্যই অতিশয় গর্হিত, কাজেই এই মিলনে শুধু বিষই উত্থিত হইল, আর তাহার জ্বালায় সমগ্র মুসলমান সমাজ যেভাবে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল আজও ঘরে ঘরে তাহার অভিনয় হইতেছে।

বৃদ্ধপিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া যে জান্‌বিবির নিকট ডিগ্রী পাইয়াছিল, অন্য কোন উপায়ে নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সে আসিয়া কেরামতের সাহায্য প্রার্থনা করিল। এই সব কার্য্যে কেরামত মুক্তহস্ত! একদল অনুচর সঙ্গে লইয়া যাইয়া সে বৃদ্ধকে বন্দী ও পুত্রকে সমস্ত কার্য্যভার অর্পণ করিয়া আসিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে, কনিষ্ঠ ইহা সহ্য করিতে পারিল না। পূর্ব্বোক্ত

প্রকারে কেরামতের সাহায্যে সে অগ্রজকে বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিল এবং গুপ্তভাবে হত্যা করিয়া আপনার পথ নিষ্কণ্টক করিয়া লইল।

এইরূপে প্রতিবেশীকে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে, বন্ধুকে বন্ধুর বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়া কেরামত বহরের অধিবাসীদের হৃদয়ে এমন এক আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া দিল যে সকলেই তাহার নামে ভয়ে ও ঘৃণায় কাঁপিয়া উঠিত। দুরন্ত শিশুদিগকে দমন করিবার জন্য কেরামতের নাম উল্লেখ করিয়া ভয় প্রদর্শন করা হইত। সকলেই পারিবারিক, ও সামাজিক, শত প্রকার অশান্তিতে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন সকলেই বুঝিতে পারিল যে কেরামতই অনিষ্টের মূল, তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াই মুসলমানগণ আপনাদের এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে, অতএব তাহাকে নির্ব্বাসিত করিতে না পারিলে আর কাহারও নিস্তার নাই।

তাই অমৃতের মাতাকে বন্দী করিবার উদ্দেশ্যে কেরামত প্রকাশ্যভাবে লোক সংগ্রহ করিতে সাহস করিল না। আমির যাহাতে এই অভিযানের কথা অনুমাত্রও না জানিতে পারে ইহাও এই মন্ত্রগুপ্তির দ্বিতীয় কারণ ছিল। কিন্তু জান্‌বিবি জানিত না যে আমিরকে ভয় করিবার কোনই কারণ ছিল না। আমির তখন গৃহকোণের ঘুঘু পাখী হইয়া বসিয়াছিল, তাহার মনে শান্তি নাই, প্রাণে সুখ নাই, স্মৃতির তাড়নায় সে প্রতিক্ষণে বৃশ্চিক দংশন অনুভব করিতেছিল! সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া যাহার জন্য সে দেওয়ানা হইয়া চলিয়া আসিয়াছিল, আজ তাহার এ কি ব্যবহার! অথবা আলেয়ার পাছে ঘুরিলেই বোধ হয় লোকে এইরূপ ভাবে অন্ধকারে আসিয়া দিশাহারা হইয়া পরে! আমির পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। সে এখন সঙ্গীহীন, বন্ধুবর্জ্জিত; সমবেদনার সঙ্গী তাহার নাই, দুঃখের বোঝার অংশ গ্রহণ করিবার লোক সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না! চতুর্দ্দিকেই বিশ্বাসঘাতকতা, বিদ্রূপের অট্টহাসি, ঘৃণার বক্রদৃষ্টি ও নির্ম্মমতার

নিকৃষ্ট অভিনয়! তাই বলিতেছিলাম, আমির এখন গৃহকোণে ঘুঘু পাখী হইয়া বসিয়াছিল! সর্ব্ববিধ রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, সংসারের অভাব অভিযোগের প্রতি উদাসীন হইয়া, জগতকে দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকাময় কল্পনা করিয়া, সে এখন নিজ বাসগৃহের চতুর্দ্দিকের দেওয়ালকেই অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছিল! রুক্ষ চুলগুলি জটা পাকাইয়া সর্পবৎ নামিয়া গিয়াছে, কোটরগত চক্ষু পাগলের ভাষা ব্যক্ত করিতেছিল, মলিন বস্ত্রাচ্ছাদিত অযত্ন রক্ষিত-দেহ অর্দ্ধদগ্ধ কঙ্কালের শ্রেষ্ঠ উপমাস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল! কিন্তু আমির তথাপি বাঁচিয়াছিল, তাহার দুঃখ তখনও সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই; ইহাই তাহার গৌরবের বিষয়; অকস্মাৎ তীব্র আঘাত অনুভব করিয়া ক্ষুদ্রপ্রাণী যেমন নির্জ্জীব অবস্থায় পতিত হয়, আমিরও সেইপ্রকার জড়ভাবাপন্ন হইয়া বাস করিতেছিল।

তথাপি জান্‌বিবি ভয়ে ভয়ে অতিগোপনে সকল বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। গ্রামের প্রধানগণকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া, এবং অজ্ঞ ও নিরক্ষর লোকদিগকে পুরস্কারের প্রলোভনে মোহিত করিয়া সে দলপুষ্ট করিতেছিল। কিন্তু এই প্রকারে লোক-সংগ্রহের ফল এই দাঁড়াইল যে এলেমের মন্ত্রশিষ্যগণ অনেকেই ছদ্মবেশে আসিয়া সৈন্যদলে ঢুকিয়া পড়িল। তাহারা অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি, এরূপ ভাবে তাহারা কেরামতের উপর প্রভাব বিস্তার করিল যে সৈন্যবিভাগ করিবার সময় তাহারা অনেকেই তৎকর্ত্তৃক নেতৃত্বপদে বৃত হইয়াছিল।

শুধু তাহাই নহে, বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহারা অজ্ঞ সৈন্য-দিগকে হিন্দুদিগের বীরত্ব সম্বন্ধে অনেক গল্প রচনা করিয়া শুনাইতে লাগিল। একস্থলে বিশ্রাম করিতে বসিয়া মণ্ডলীভূত শ্রোতৃবর্গের নিকট আবদুল ভীতকণ্ঠে বলিল,—"ভাই, যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে এই যাত্রা বড় শুভফলদায়ক বলিয়া বোধ হইতেছে না।"

শুনিয়া করিম বলিল,—"কেন ?"

আব্দুল—"হিন্দুদিগের বীরত্বের কথা শুন নাই ! তাহাদের মেয়েরা হাসিতে হাসিতে আগুনে পুড়িয়া মরিতে পারে, আর পুরুষগণ যখন খোলা তরবাল হস্তে যুদ্ধ করিতে বাহির হয়, তখন এক একটা যেন এক একটা দুষ্মণ ! আমার ভাই, গা কাঁপ্ছে !"

সেখানে এক নবীন সৈনিক বসিয়াছিল, এই কথা শুনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"কিন্তু তাহাদের দয়া আছে ত ?"

আব্দুল—"কি রকম ?"

নবীন সৈনিক—"এই মনে কর, যুদ্ধের সময় যদি আমি অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলি, "ভাই, আমি তোমাদের শরণাগত, আশ্রিত ও অতিথি" তবে ত আমাকে আর কেহ কিছু বলিবে না !"

আব্দুল—"কেন ?"

নবীন সৈনিক—"শুনিয়াছি, হিন্দুগণ নাকি বড় ক্ষমাশীল ও অতিথি-পরায়ণ, আমাদের মহম্মদ ঘোরী যখন পৃথ্বীরাজের নিকট প্রথম পরাজিত হয়, তখন নাকি সে এই উপায়ে মুক্তিলাভ করিয়াছিল ; আর বাদসাহ আলাউদ্দিন নাকি অতিথির ছদ্মবেশে যাইয়া চিতোরের রাণীকে পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছিল !"

আব্দুল—"সে আশা পরিত্যাগ কর, এখন হিন্দুরা বড় বেতর হইয়া উঠিয়াছে। নিরস্ত্র হইলে কি পরমুহুর্ত্তে তোমার মস্তকটা ধূলায় গড়াগড়ি যাইবে !" শুনিয়া সকলের শরীর একবার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পরে শিবির সংস্থাপন করিয়া সৈন্যগণ রাত্রি যাপনের জন্য অপেক্ষা করিল। সেখানে ঘাসের উপর উপবেশন করিয়া বৃদ্ধ ছলিম মিঞাকে সম্বোধন করিয়া হোসেন খাঁ বলিল,—"কি চাচা, বাড়ীর কথা মনে পড়িতেছে ?"

ছলিম—"পড়িবে বৈ কি? আজ সাতদিন হয় একটা নিকা করিয়াছি, মন কি এখন আর এই সব হট্টগোলে মাতিয়া উঠে!"

হোসেন—"তবে এইবার শেষ বাড়ীর চিন্তা করিয়া লও।"

ছলিম—"কেন?"

হোসেন—"আর কি ফিরিতে পারিবে? হিন্দুগ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এইবার আমাদের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইয়াছে! তাহাদের দেশে যাইতেছি, পিপড়ার মত একটী একটী করিয়া টিপিয়া মারিয়া ফেলিবে।"

ছলিম—"তবে এখন উপায়?"

হোসেন বলিল,—"আমি ভাই, এক পন্থা ঠিক করিয়া বসিয়া আছি।"

ছলিম আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—"কি?"

হোসেন—"রাত্রিকালে সকলে ঘুমাইলে প্রাণ লইয়া চম্পট!"

ছলিম—"বেশ কথা। তবে আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইও।"

এইরূপ বিবিধ উপায়ে এলেমের লোকগণ সৈন্যদিগের হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দিল যে তাহারা এইবার সাক্ষাৎ শমনের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছে। অতএব সকলেই পলাইতে প্রস্তুত হইয়া রহিল। তারপর মধ্য রাত্রিতে যখন নিজ শিবিরে শয়ন করিয়া কেরামত সুখস্বপ্ন দেখিতেছিল, তখন সৈন্যগণ একে একে যে যাহার বাড়ীর পানে ছুটিয়া পলাইল। প্রভাতে উঠিয়া কেরামত দেখিল যে মুষ্টিমেয় সৈন্য ও সেনাপতি ব্যতীত আর সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। হতবুদ্ধি হইয়া সে বহরে ফিরিয়া আসিল।

কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তাহারা যাহা অবগত হইল, তাহাতে কেরামত ও জান্‌বিবি উভয়েই নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িল। এলেম যে গোপনে সকলের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে তাহা আর গুপ্ত রহিল না। এই সংবাদ অবগত হইয়া জান্‌বিবি একেবারে বসিয়া পড়িল। কাহার

উপর রাজত্ব করিবে সে? আধিপত্য করিতে হইলেই লোক চাই, যদি তাহার ইঙ্গিতমাত্র প্রজাগণ অবনতমস্তকে তাহার আদেশ পালনে অগ্রসর না হয়, তাহা হইলে আর প্রভুত্বের বাহাদুরী রহিল কৈ! কিন্তু ইহা ব্যতীত আরও একটা গুরুতর ভাবনার বিষয় ছিল। আমির এখন তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কে বলিতে পারে এই অসন্তোষের বহ্নি তাহাকে নেতৃত্বপদে বরণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে না? তাই জান্‌বিবি বড় চিন্তিত হইয়া পড়িল, জীবনে এমনটী আর কখনও সে অনুভব করে নাই।

নির্জ্জনে বসিয়া জান্‌বিবি কেরামতের সঙ্গে এই অসন্তোষের স্রোত রোধ করিবার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য পরামর্শ করিতেছিল। ভবিষ্যতের বিপদকে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া সে কেরামতকে উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্যে বলিল,—"বুঝিতে পারিয়াছ কি, কেরামত,আমরা কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি? আজ যদি আমিরের পক্ষ সমর্থন করিয়া এই প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হইয়া উঠে, তাহা হইলে আমাদিগের অবস্থা কি হইবে? বসিয়া ভাবিও না, কেরামত, জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে আসিয়া আমরা উপস্থিত হইয়াছি; যদি আশু প্রতিকারের কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে না পার, তাহা হইলে অচিরেই তোমার ও আমার নাম পৃথিবী হইতে চিরতরে লুপ্ত হইয়া যাইবে।"

কেরামত—"আমরা এই বিদ্রোহী প্রজাগণকে টিপিয়া এক একটী করিয়া মারিয়া ফেলিব।"

জান্‌বিবি—"তাহাতে বিপদ বাড়িবে ভিন্ন কমিবে না। কিন্তু কেরামত, তোমার ক্ষিপ্রকারিতার উপরেই সকল নির্ভর করিতেছে, আমি যাহা বলি তাহা করিতে পারিবে কি?"

কেরামত—"কি?"

জান্‌বিবি—“এখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে এলেমই এই সকল অনিষ্টের মূল ; অতএব অবিলম্বে তাহাকে লোক-চক্ষুর অন্তরালে প্রেরণ করা উচিত। তুমি বুঝিতে পারিয়াছ ?”

কেরামত—“ইহা ত অতি সামান্য কাজ! আজই ?”

জান্‌বিবি—“যদি এই মুহূর্ত্তে ইহা করিতে পারিতে, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কিসের! সত্বর হও, কেরামত, আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিও না।”

কেরামত—“কিন্তু আমির রহিল যে ?”

জান্‌বিবি—“তাহার জন্য চিন্তা করিও না, যেদিন বুঝিতে পারিব, তাহা দ্বারা আমাদের সামান্য অনিষ্ট হইবারও সম্ভাবনা আছে, সেই দিনই তাহাকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিব। আমি এই ভার গ্রহণ করিলাম।”

এদিকে যখন এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া কেরামত এলেমকে বন্দী করিতে যাত্রা করিল, তখন পাগলিনী বেহুনা অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিয়া এলেমের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিয়া দিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সেও তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। তাহার আশ্রয়দাতা বৃদ্ধের সমভিব্যাহারে, সুখা ও সুখার স্বামীকে সঙ্গে লইয়া, এলেম অবিলম্বে তাহার বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। সুখার স্বামী প্রথমে তাহার এই সুখের বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কিছুতেই সম্মত হয় নাই। তারপর যখন সুখা এলেমের বিপদের কথা তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, তখন সে অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া একটা লাঠিতে ভর করিয়া সকলের আগেই রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সে একটা প্রদীপ চাহিতেছিল ; বুঝিতে না পারিয়া সুখা বলিল,—“তুমি অন্ধ মানুষ, প্রদীপ লইয়া তুমি কি করিবে ?”

সুখার স্বামী—"তুই মাগী, তাহার কি বুঝিবি? অন্ধকারে এই পথ বাহিয়া যাইতে হইবে, যদি কেহ না দেখিতে পাইয়া আমার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার লাগিবে কি না?"

এলেম সন্তুষ্ট হইয়া তাহার হস্তে একটা প্রদীপ তুলিয়া দিল; আমাদের বিশ্বাস এই প্রদীপের আলোকে পৃথিবীর অন্ধকার দূরীভূত হইবে।

তারপর কেরামত আসিয়া দেখিল শূন্য-গৃহ, অন্ধকারে সে কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। বিফলমনোরথ হইয়া সে অবিলম্বে বহরে চলিয়া আসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কৌশল।

কিন্তু জান্‌বিবি কিছুতেই লক্ষ্যচ্যুত হইবার নহে। পূর্ব্বোক্ত উপায়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া সে এখন কৌশলে নিজ অভীষ্ট-সিদ্ধি করিতে মনন করিল। গোপনে অমৃত ও তাহার মাতার গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দিয়া সে হিন্দুগ্রামে গুপ্তচর প্রেরণ করিল। তাহারা দল বাঁধিয়া হিন্দুর ছদ্মবেশে বন জঙ্গল আশ্রয় করিয়া অমৃতের প্রত্যেক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

"সেদিন ছিল শিবচতুর্দ্দশী ব্রত। অমৃতের বৃদ্ধা মাতা দূরস্থিত এক মন্দিরে দেব দর্শনার্থে যাইতেছিলেন। যাইবার সময় জান্‌বিবির লোকগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল, অতএব তাহারা প্রত্যাবর্ত্তনের পথে প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিল। বৃদ্ধা পূজা সমাপনান্তে ফিরিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার অনুচরগণ ভীষণভাবে আক্রান্ত হইয়া হত বা আহত হইয়া পড়িল। তখন জান্‌বিবির এক গুপ্তচর অগ্রসর হইয়া বৃদ্ধাকে বলিল,—"আপনাকে আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।"

বৃদ্ধা—"কোথায় ?"

গুপ্তচর—"আমির মিঞা আপনাকে লইয়া যাইতে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন।"

বৃদ্ধা সব বুঝিতে পারিলেন কিন্তু ভীত হইলেন না। বলিলেন,—"তা যাইব বৈকি! মা ছেলের নিকটে যাইবে তাহাতে আবার ভয়ের কারণ কি থাকিতে পারে ? ছেলে যতই দুর্ব্বৃত্ত হউক না কেন মাতৃমূর্ত্তি সম্মুখে দেখিলে তাহার উদ্ধত প্রকৃতি স্বতঃই সংযত হইয়া আসে। আমির

এতদিন মাতৃমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করে নাই, তাই বৃথা বিবাদে কালক্ষেপ করিয়াছে। আজ আমি যাব সত্য, কিন্তু এইবার আমিরকে কোলে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিব। চল, আমি প্রস্তুত আছি।" এই বলিয়া তিনি অনুচরগণের অনুবর্ত্তী হইলেন।

জান্‌বিবির আজ আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু মাতার হরণ-বৃত্তান্ত অবগত হইয়াই আমির ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"জীবন, তুমি আমার মাতাকে বন্দী করিয়া আনিয়াছ?"

জান্‌বিবি—"তোমার মাতা! হিন্দুর মাকে মা বলিতে লজ্জা করে না?"

আমির—"সে কথা পরে হইবে, এখন বল, আমি মাতার সহিত দেখা করিব।"

জান্‌বিবি—"তুমি তাহার দেখা পাইবে না।"

অমনি আমির ক্ষিপ্ত হইয়া জান্‌বিবির কেশাকর্ষণ করিয়া বলিল,—"পাপিয়সি, এই তোর্—" কিন্তু পশ্চাৎদিক হইতে কেরামত আসিয়া তাহাকে অপদস্থ করিয়া বাহির করিয়া দিল।

জান্‌বিবি দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল,—"কেরামত, আর বিলম্ব করিবার সময় নাই। আজ রাত্রেই আমাদের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া লইতে হইবে।"

কেরামত কুর্ণিস করিয়া বলিল,—"আমি প্রস্তুত আছি।"
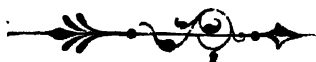
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রাণদাত্রী বেহুনা।

অন্ধকারে পাপের জন্ম হইয়াছিল, ইহা প্রবাদবাক্যে পরিণত হইবার কারণ এই যে পৃথিবীর অতি গর্হিত পাপকার্য্যগুলিই ইহার আশ্রয়ে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কেরামতও একটী অন্ধকারময় রাত্রি মনোনীত করিয়া নিজ অভীষ্টসিদ্ধি করিতে যাত্রা করিল। সে ভাবিয়াছিল, সেই দ্বিপ্রহর রজনীতে যখন সমগ্র পৃথিবীটাই সুপ্তির ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছিল, তখন আর কেহই তাহার কার্য্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বসিয়া নাই। কিন্তু বাহিরে আসিয়াই সে দেখিল অগণিত নক্ষত্ররাজি গগন ছাইয়া শোভা পাইতেছে! তাহারা হাসিতেছে কি? একটীর এত নিকটে সরিয়া আসিয়া অপরটী তাহাকেই দেখিতেছে না? কেরামত উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিল তারাগুলি তখনও ঘুমায় নাই, যেন কুক্রিয়াসক্ত পৃথিবীর উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্যই ভগবান তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন! আর এই যে নিবিড় অন্ধকাররাশি সকল গ্রন্থি শিথিল করিয়া পৃথিবীর গাত্রে লগ্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাও ঘুমাইয়াছে কি? তাহা হইলে এই অসংখ্য জোনাকির চঞ্চল দীপ্তিতে তাহার অঙ্গমধ্যে বিচিত্র পুলকের আভা বিচরণ করিতেছে কেন? আর এই যে সঞ্চরণশীল মৃদু পবন, সতত দীর্ঘশ্বাসের সহিত জগতের সকল বস্তুই আন্দোলিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, সৃষ্টির আদি-কাল হইতে তাহা কখনও ঘুমাইবার অবসর পাইয়াছে কি? পৃথিবী ঘুমাইতে জানে না, আর জানে না সেই অক্লান্তকর্ম্মা বিধাতা পুরুষ যিনি সতত জাগিয়া জগতের মঙ্গলব্রতে নিজকে নিয়োজিত করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল সজীবতা কেরামত গ্রাহ্যই করিতে পারে না, কারণ তাহার

নিজের মধ্যেই যে পরমাত্মা সতত বিবেকের আলো জ্বালিয়া জাগিয়া রহিয়াছে, যাহাতে বাহিরের সামান্য স্পন্দনটীও তাহাতে পরিস্ফুট না হইতে পারে, এমন ভাবেই সে তাহাকে তাহার দুরাকাঙ্ক্ষার পাথর চাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে! সমস্ত পৃথিবীটা বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও তাহার নির্জ্জীব বিবেক তাহাতে স্পন্দিত হইতে পারে না! বিশেষতঃ কেরামত আজ উন্নতির শীর্ষপ্রদেশে আরোহণ করিতে চলিয়াছিল, আজিকার এই একটী মাত্র কার্য্যের উপর তাহার শ্রেষ্ঠ সফলতা, জীবনের সকল সাধনার পূর্ণসিদ্ধি নির্ভর করিতেছে, অতএব বাহিরের দৃশ্য দেখিয়া কেরামত অনুমাত্রও বিচলিত হইল না। তাহার দুরাকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তিমতি হইয়া আসিয়া যেন তাহাকে সম্মুখের দিকে লইয়া চলিতেছিল, পশ্চাতেও সে জান্‌বিবির উত্তেজনার প্রভাব অনুভব করিতেছিল, কিন্তু—

কেরামত হঠাৎ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল! সে যাহা করিতে যাইতেছে তাহা অতি গোপনে সম্পন্ন করিতে না পারিলে যে তাহার সফলতা তাহার উদ্দেশ্য সাধনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে, এ কথা ত জান্‌বিবির উত্তেজনার মোহে এ পর্য্যন্ত তাহার মনে উদিত হয় নাই! মনে হইতেই সে বুঝিতে পারিল,এমন অসতর্কভাবে নিজকে প্রকাশ্য স্থানে বাহির করিয়া সে ভাল কাজ করে নাই! অমনি একটী ঝোপের অন্তরালে আসিয়া সে আত্ম-গোপন করিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহার মাথার উপর দিয়া একটা কর্কশ-কণ্ঠ পক্ষী ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া যাইতেছিল, কেরামত অতিমাত্র শঙ্কিত হইয়া কোনমতে দুইটী ঝোপের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। সে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, কেহ তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে কিনা? এমন সময় অদূরে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়া সে যেই মুহূর্ত্তে একটী ঝোপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল,অমনি ক্ষিপ্রগতিতে কে তাহাকে অতিক্রম করিয়া প্রাসাদের দিকে চলিয়া গেল। কেরামত নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া

পড়িল, তাহার সাহসের দৃঢ়বর্ম্মও ইহাতে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, দারুণ আশঙ্কায় তাহার রক্তের গতি মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল; দুইটী কম্পিত পদের উপর শঙ্কিত শরীরটাকে বহন করিয়া অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া সে প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নানাপ্রকার দুশ্চিন্তায় প্রথম-রজনী অতিবাহিত করিয়া আমির সবেমাত্র সুপ্তির ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, বিশ্রামের তৃপ্তিতে সে তখনও অভিভূত হইয়া পরে নাই। প্রকাণ্ড গৃহ, তাহার এক কোণে একটী মুক্ত বাতায়নের পার্শ্বে তাহার শয্যা স্থাপিত ছিল। কেরামত শাণিত ছুরিকা উন্মুক্ত করিয়া ধীরপদে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার চক্ষু শুধু শয্যা প্রতিই ন্যস্ত ছিল না, কিন্তু সে প্রতিমুহূর্ত্তে চতুর্দ্দিকেও দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার সম্মুখভাগে সেই প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা ভগ্ন করিয়া উচ্চ করতালি-ধ্বনির সহিত কে বিকট রবে হাসিয়া উঠিল! শুনিয়া কেরামত এরূপভাবে চমকিয়া উঠিল যে তাহার হস্ত হইতে ছুরিকাটী সশব্দে মেঝের উপর পড়িয়া গেল এবং অপ্রতিভ হইয়া ধরা পড়িবার ভয়ে সে দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

আমির জাগরিত হইয়াছিল; অর্দ্ধ জাগ্রতাবস্থায় সে যে কিছু না দেখিতে পাইয়াছিল তাহাও নহে। এখন নির্ব্বাণপ্রায় প্রদীপটী উজ্জ্বল করিতে উঠিয়াই সে দেখিল তাহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটী স্ত্রীলোক উজ্জ্বল-চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে! বিস্মিত হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কে?"

"আমি বেহুনা।"

"আর এই মাত্র যে গৃহের বাহির হইয়া গেল?"

"কই, আমি ত কাহাকেও দেখি নাই!"

"হাঁ, তোমাকে দেখিয়া সে পলাইয়াছে।"

"মিথ্যা কথা।"

"মিথ্যা নয়, বেহুনা, এই দেখ তাহার আগমনের নিদর্শনও সে ফেলিয়া গিয়াছে।" এই বলিয়া আমির কেরামত-পরিত্যক্ত ছুরিকাটী তুলিয়া লইল। উভয়েই প্রদীপের নিকট অগ্রসর হইয়া উৎসুকভাবে ছুরিকাটী পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল, হঠাৎ আমির উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "কেরামত।" ছুরিকাতে কেরামতের নাম অঙ্কিত ছিল।

বেহুনা ক্ষিপ্রতার সহিত আমিরের হস্ত হইতে ছুরিকাটী কাড়িয়া লইয়া বলিল,—"এই জিনিষটা আমার, আমার জিনিষ আমি তোমাকে দিতে পারিব না।"

আমির হতবুদ্ধি হইয়া কিছুকাল বেহুনার প্রতি চাহিয়া রহিল, পরে বলিল,—"বেহুনা, তোমাকে আজও আমি চিনিতে পারিলাম না! সেদিন কেরামতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে আসিয়াছিলে, তোমার যে কি অভি-যোগ ছিল, তাহা তুমিই বলিতে পার, কিন্তু আজ এইরূপভাবে কেরামতের হস্ত হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াও, তাহার বিরুদ্ধের একমাত্র প্রমাণটীও তুমি হস্তগত করিতে ইচ্ছা কর! কেরামত তোমার কে?"

বেহুনা শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে নিজকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল,—"লাঞ্ছিতা তোমার কে?"

এই কথার উত্তর দিতে যাইয়া আমির আত্মহারা হইয়া পড়িল। বলিল,—"এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া লাঞ্ছিতা বহুদিন হয় অস্তধামে চলিয়া গিয়াছে! কিন্তু আমি তাহার শত্রু। মোহের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, আজ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে যাইয়াই আমি শৃগাল কুকুরের ন্যায় মরিতে বসিয়াছি।" এই বলিয়া আমির শয্যার উপর বসিয়া পড়িল।

বেহুনা—"মনে কর কি তোমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট ?"

আমির—"যথেষ্ট নয়, বেহুনা, দুনিয়ার এ পারের পক্ষে ত যথেষ্ট নহেই, পরপারেও যে আমার কি হইবে তাহা কে বলিতে পারে !"

বেহুনার চক্ষে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু আমিরের দুঃখ দেখিয়া নহে। সে ভাবিতেছিল,—"স্বামি যদি এতই মিষ্টি, তবে ভগবান আমার অদৃষ্টে এ কি গড়িয়াছেন !" অমনি একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া বাহিরের উষ্ণ বাতাসে মিশিয়া গেল। সে আর সেই স্থানে দাঁড়াইতে পারিল না, ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আমির ডাকিয়া বলিল,—"যেওনা, বেহুনা, দাঁড়াও। এই নির্ম্মম পুরীতে আর আমারও স্থান নাই, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।"

"তাহা হইলে তুমিও চিরদিনের তরে নির্ব্বাসিত হইবে। উৎকণ্ঠিত হইও না, লাঞ্ছিতা মরে নাই। তাহারই পুণ্যবলে আবার তাহার দেখা পাইবে।" এই বলিয়া বেহুনা অন্ধকারে মিশিয়া গেল।
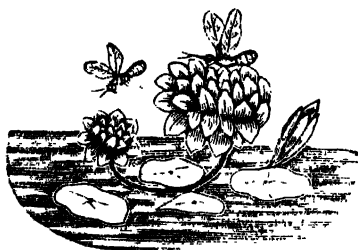
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পুনর্ম্মিলন।

"বেহুনা, রোজ তুই খাবার কোথা নিয়ে যাস্, মা ?"

"ঐ মেয়েটীর জন্যে, মা।"

"কোন্ মেয়েটী আবার ? খুলে বল্, বেহুনা, লক্ষ্মী মা আমার।"

"ঐ যাকে হিন্দুগ্রাম থেকে নিয়ে এসেছে। তোমরা তা'কে চেন।"

"শান্তা ?"

"তা হবে।"

লাঞ্ছিতা ও বেহুনার উল্লিখিত প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, পাশের ঘরে সন্ন্যাসী, পাপাত্মা ও ফকির বসিয়া শান্তার মুক্তি সম্বন্ধেই পরামর্শ ক'রিতেছিল। শান্তার নাম শুনিবামাত্র তাহারা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বেহুনাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং কত শত প্রশ্ন করিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু বেহুনা একটী প্রশ্নেরও উত্তর দিতেছিল না, দেখিয়া লাঞ্ছিতা বলিল,—"তোমরা এইরূপভাবে বিরক্ত করিওনা, ঐ ঘরে গিয়া একটু বস, আমি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।"

তাহারা চলিয়া গেলে, লাঞ্ছিতা প্রথমতঃ বেহুনাকে টানিয়া কোলের কাছে বসাইল, তারপর নিতান্ত আদরের সহিত শরীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল,—

"বল দেখি, মা, তুই সেই মেয়েটীকে দেখেছিস্ ?"

"দেখ্‌ব কি ? আমি যে তাহার কাছে কাছেই থাকি।"

"কোথায় থাকে সে ?"

"বহরের কারাগারে।"

"কেমন আছে?"

"ভাল নয়, সর্ব্বদাই কাঁদে, কিছুই খায় না।"

"বহরের আর কোন সংবাদ বলিতে পারিস্?"

"পারি, বড় বিপদ, মা, বড় বিপদ!"

"কা'র বিপদ, বেহুনা, সবটা খুলেই বল, আমাকে এমন ভাবে আকুল করিয়া দিস্‌না।"

"বড় বিপদ, মা, তোমার যাওয়া উচিত, আমি তোমাকেই নিতে এসেছি।"

বেহুনা আর কিছু বলিল না, কিন্তু লাঞ্ছিতা তখনই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। যাত্রা করিবার সময় পাপাত্মা, সন্ন্যাসী ও ফকিরকে সঙ্গে যাইতে দেখিয়া বেহুনা স্থির হইয়া দাঁড়াইল। দেখিয়া লাঞ্ছিতা বলিল,—"এখন চল্ মা, আর দেরী করিস্‌নে।"

কিন্তু বেহুনা পাপাত্মা, সন্ন্যাসী ও ফকিরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

লাঞ্ছিতা বলিল,—"বোকা মেয়ে, ওরা যে আমার ছেলে, আমার সঙ্গে যাবে না!"

"না, মা, মারবে।"

"মারবে কেন? কা'কে মারবে?"

"জাননা, মা, তুমি, ওরা মারবে।"

"না, মারবে না। আমার কথা শোন্, বেহুনা, কেরামতকে আমি রক্ষা করব। নে, চলে আয় এখন।" এই বলিয়া সে বেহুনাকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিল।

যথাসময়ে লাঞ্ছিতা আমিরের আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহার আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃতছিল, তথাপি দৃষ্টিমাত্র আমির তাহাকে চিনিতে পারিয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিল,—"কে! আসিয়াছ?"

অবগুণ্ঠন মোচন করিতে করিতে লাঞ্ছিতা বলিল,—"হাঁ, দাসীকে স্মরণ করিয়াছ, তুমি?"

আমির—"শুধু স্মরণ করি নাই, লাঞ্ছিতা, কিন্তু এইবার তোমাকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছি। এখন এস, প্রাণময়ি, তোমার পূর্ণ অধিকার দখল করিয়া লও।" এই বলিয়া সে আদরে হাত ধরিয়া লাঞ্ছিতাকে আপনার পার্শ্বে বসাইল।

এমন সময় পশ্চাতের দ্বারটী উন্মুক্ত করিয়া জান্‌বিবি সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"কিন্তু তোমার নিকট আমারও কিছু দাবী আছে। লাঞ্ছিতা, স্বামী-ভোগ্য, রাজ্যও তাহাই, অতএব এস, আমরা উভয়ে ভাগাভাগি করিয়া তাহা বণ্টক করিয়া লই। তুমি স্বামী লইবে, না রাজ্য লইবে?"

লাঞ্ছিতা,—"স্বামী দেবতা, নিত্যবস্তু, রাজ্য মোহকর ও ক্ষণস্থায়ী, আমি স্বামীই গ্রহণ করিলাম।"

জান্‌বিবি,—"তবে রাজ্য আমার; তোমরা আজ হইতে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।"

আমির—"তাহা হইবে না, জীবন! আমি লাঞ্ছিতাও চাই, রাজ্যও চাই। লাঞ্ছিতা অন্তর, রাজ্য বাহির, আমি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই আধিপত্য করিব।"

জান্‌বিবি বুঝিতে পারিল, সে পদচ্যুত হইয়াছে। তাই সে ক্ষণিক নিস্তব্ধ হইয়া একটু চিন্তা করিল, পরে মেজের উপর নতজানু হইয়া বসিয়া আমিরের দিকে দীন নয়নে চাহিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—"যে ভাবেই হউক, এতদিন তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া আমি রাজত্ব করিয়া আসিতে

ছিলাম, কিন্তু আজ আমার সেই অধিকার লোপ হইতে চলিল ! আর নয়, আমি একটীমাত্র ভিক্ষা চাহিতেছি—আমাকে আর একদিনের আধিপত্য করিতে দেও, তৎপর আর তোমাকে বিরক্ত করিতে আসিব না ।"

আমির দৃঢ়স্বরে বলিল,—"না, তাহা হইবে না ।"

লাঞ্ছিতা,—"ছি ! তোমরা বড় নিষ্ঠুর !" এই বলিয়া সে উঠিয়া জান্‌বিবিকে হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল,—"এক দিন কেন, বোন্‌, এস, ইঁহার পার্শ্বে বসিয়া আমরা চিরদিনই রাজত্ব করিয়া যাইব ।"

কিন্তু জীবন বসিল না, ত্বরিত গমনে গৃহের বাহির হইয়া গেল । যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল,—"স্বামী দেবতা, না, ভোগ্যবস্তু ? যাহাই হউক, জীবনের সন্ধিস্থলে পৌছিয়া আমার তাহা বিচার করিয়া লাভ নাই ।"
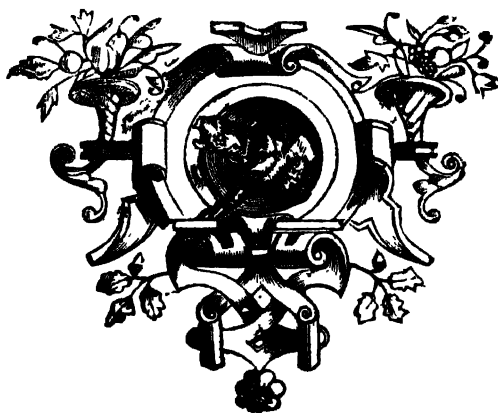
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

স্নেহের আহ্বান।

এদিকে অমৃত মাতার হরণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হিন্দুগ্রামের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া বহরের প্রান্তভাগে আসিয়া দাঁড়াইল। এতটা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া হিন্দুগণ আর কখনও বহরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় নাই! তথাপি বহরের সীমা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে অমৃত লিখিয়া পাঠাইল :—

"অমর, বহরের উপর তুমি রাজত্ব করিতেছ, ইহাতে আমার কোনই দুঃখ নাই; তুমি আমাকে শতপ্রকারে নির্য্যাতন করিয়াছ তাহাও আমি সহ্য করিয়াছি। আমাদের উভয়ের বিবাদে কাহার কি লাভ হইয়াছে, ভাবিয়া দেখিতে পার। কিন্তু যিনি গর্ভে ধরিয়া আমাদের উভয়কেই মানুষ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়া তুমি সুখী হইবে কি? ভ্রাতৃস্নেহের আব্দার করিয়া বলিতেছি না, কিন্তু মাতৃভক্তির দোহাই দিয়া তোমার নিকট মাতার মুক্তি প্রার্থনা করি। আশাকরি ইহাতে নিরাশ হইব না।"

যখন এই পত্র আসিয়া পৌঁছিল, তখন এলেমও আসিয়া আমিরের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। ভবিষ্যতে কিরূপভাবে কার্য্য করিতে হইবে তাহা স্থির করিয়া আমির লিখিয়া পাঠাইল :—

"দাদা, আমি বড়ই বিপদগ্রস্ত; আপনি সসৈন্যে প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন; আমাদ্বারা মাতার কোনই অবমাননা হইবে না।"

নবম পরিচ্ছেদ।

শেষ-বিদায়।

নিজ উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া জান্‌বিবি সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিল যে সে সকলের নিকট শেষ-বিদায় গ্রহণ করিবে। সে জানিত তাহার আহ্বানে আজ কেহ আসিবেনা, তাই সে এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বহরে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল! আবার সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে এক মহতী সভায় আসিয়া সকলে সমবেত হইল।

সভামধ্যে জান্‌বিবি উপবেশন করা মাত্র, পাপাত্মা বলিতে আরম্ভ করিল,—"বন্ধুগণ, আপনারা মুসলমান, কিন্তু আর যাহাই হউক, আপনারা ধর্ম্মপ্রাণ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। আমি জিজ্ঞাসা করি কোন্ ধর্ম্ম পরদ্বেষ ও পরপীড়নের নীতি লইয়া জগতে গঠিত হইয়াছে! কিন্তু হায়! মহাত্মা মহম্মদের প্রচারিত ধর্ম্মের মূর্ত্তি পৃথিবী ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছে! এজন্য দায়ী কে? ধর্ম্ম, না, যাহারা ধার্ম্মিক বলিয়া নিজের পরিচয় দেয়? ধর্ম্মের জন্য একপ্রাণতা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু সঙ্কীর্ণতা কেহ অনুমোদন করিবে না! ধর্ম্মের জন্য আত্মোৎসর্গ অতি স্পৃহনীয় বস্তু, কিন্তু তাহা পরপীড়নে নিয়োজিত হইলে, অতি বিগর্হিত কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়! জানিনা আবার মহম্মদের আবির্ভাব হইবে কি না, কিন্তু এই নবযুগের প্রভাবে প্রতিপালিত ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে কি এমন কেহ নাই, যিনি স্বজাতীয়গণের হৃদয় হইতে এই অন্ধ বিশ্বাস দূরীভূত করিতে সমর্থ হয়! থাকিবে কেন! জান্‌বিবি যে সকলের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে! তাহার ধ্বংস না হইলে আর নিস্তার নাই! তাই

বলি, জাগ, হে ইস্‌লাম-ধর্ম্মের অনুচরগণ, আবার হৃদয়ে বল লইয়া উত্থিত হও। জান্‌বিবি ইস্‌লাম-ধর্ম্মের বিকৃতরূপ সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশিত করিয়াছে, তোমাদের সমবেত চেষ্টায় সেই কলঙ্ক অপনোদিত হউক! কেরামত ও জান্‌বিবিকে বিসর্জ্জন কর, ইস্‌লাম-ধর্ম্ম আবার পুষ্পপল্লব-পরিশোভিত বৃক্ষের ন্যায় শোভবান হইবে।"

কেরামত জান্‌বিবির নিকটেই উপবিষ্ট ছিল, পাপাত্মার বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া সে বলিল,—

"হারেরে টিট্‌কারী সহিতে না পারি,
মোস্‌লেম শোণিত হউক প্রবাহিত!"

অমনি পশ্চাৎদিক হইতে তাহার মাথায় এক ঘা লাঠি পড়িল, কেরামত আহত হইয়া নিজ আসনে বসিয়া পড়িল।

এই ঘটনার পরেই এক অশীতিপর বৃদ্ধা রমণী সভাতলে আনীতা হইলেন। তাঁহার স্নেহময় মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই ভক্তিভাবে মনে মনে তাহার চরণে প্রণতঃ হইল। জান্‌বিবি উঠিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "কে পারিবে, অগ্রসর হও,—এই বৃদ্ধার বক্ষে দশবার পদাঘাত করিতে হইবে।" শুনিয়া একটা অস্ফুট-ধীক্কার-ধ্বনি সভা হইতে উত্থিত হইল, কিন্তু কেহই অগ্রবর্ত্তী হইল না। জান্‌বিবি আবার আহ্বান করিল, আবার, আবার, কিন্তু যখন কেহই অগ্রসর হইল না, তখন সে নিজে উঠিয়া বলিল,—"তবে এই দেখ আমিই আঘাত করিব।" জান্‌বিবি অগ্রসর হইতেছিল, অমনি পশ্চাত হইতে শব্দ হইল,—"সাবধান, জান্‌বিবি, মুসলমানজাতির উপর আধিপত্যের কাল তোমার পূর্ণ হইয়াছে, আমরা তোমাকে চিনিয়াছি!" সকলে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, আলুলায়িত-কুন্তলা এলেম ধীরে ধীরে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিতেছে! দেখিয়া সকলেই উন্মত্তপ্রায় জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, এবং পরমুহূর্ত্তেই সকলে মার্ মার্

শব্দে কেরামত ও জান্‌বিবির প্রতি ধাবমান হইল, কিন্তু আর তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া গেল না।

বিপদ বুঝিয়া তাহারা পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল। এখন যাইতে যাইতে জান্‌বিবি কেরামতের কাণে কাণে বলিল,—"আজ দরিয়া নদীর তীরে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আমার সহিত দেখা করিও এদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইব।" কিন্তু একজন তাহাদিগকে দ্রুত অনুসরণ করিতেছিল, তাহার কর্ণে এই স্বর পৌঁছিল। শুনিয়া সে উৎফুল্ল হইয়া এক দিকে চলিয়া গেল। তাহার নাম নছিব মিঞা।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল, চতুর্দ্দিক অন্ধকারময়। সেই তমসাচ্ছন্ন রজনীতে নদীতীরে কয়েক জন লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়াছিল,—দেখিয়াই বোধ হয় তাহাদের কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। দেখিতে দেখিতে এক জন পথিক সেই পথে অগ্রসর হইল, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল,—"কে যায়?" পথিক নিজের নাম বলিয়া গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেল। এইরূপে অনেকে সেই পথ দিয়া চলিয়া গেল, অবশেষে কেরামত আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রশ্নমাত্রে সে রুক্ষস্বরে বলিল,—"কে তোরা এই নির্জ্জন স্থানে কি দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য বসিয়া আছিস্? আমি কেরামত উল্লা।" তখন তাহারা বলিল,—"আমরা তোমাকেই চাই।" এই বলিয়া সকলে কেরামতের প্রতি ধাবিত হইল। কেরামত দেখিল মহাবিপদ! কিছুকাল এদিক সেদিক ছুটাছুটি করিয়াও সে শত্রুগণের চক্ষুর অন্তরাল হইতে পারিল না! তাহারা আসিয়া কেরামতকে নির্দ্দয়-ভাবে প্রহার করিতে লাগিল। অবিলম্বে কেরামত হতচেতন হইয়া পড়িয়া গেল; তখন সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে নদীতীরে লইয়া আসিল। কিছুকাল পরে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া কেরামত বলিল,—"একটু জল।" নছিব,—"জল! এই সামান্য পাণিতে তোমার পিপাসার শান্তি হইবে না।

এইবার প্রাণ ভরিয়া পান করিয়া লও।" এই বলিয়া সে কেরামতকে বর্শা-বিদ্ধ করিয়া দরিয়ার জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখিল। ঐ অবস্থায় তাহার প্রাণবায়ু পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল।

এ দিকে সভাভঙ্গের পর বহরের রাজপুরীতে এক অপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইল। সু-উচ্চ ছাদের উপর স্তম্ভাবলম্বনে দাঁড়াইয়া এলেম রূপের প্রভায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া হাসিতেছিল। নীচে অগণিত উন্মত্ত আবাল-বৃদ্ধ-যুবা তাহারই নিকটে পৌঁছিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। এলেমের আশ্রয়দাতা বৃদ্ধ, স্বীয় অনুচরগণ সাহায্যে, তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখিতেছিল। একে একে অনেকে অগ্রসর হইল, কিন্তু কেহই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিল না, অবশেষে দলে দলে অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু তাহারাও সকলেই বৃদ্ধের নিকট পরাজিত হইয়া বন্দী হইল। অবশেষে ফকির একা অগ্রবর্ত্তী হইল; সকলে বিস্ময়ের সহিত দেখিল সে একে একে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধকে বন্দী করিয়া ছাদে উঠিয়া গেল। পরিশ্রমে সে অতীব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এখন এলেমের নিকটবর্ত্তী হইয়া জানুপাতিয়া বসিয়া বলিল,—"এলেম, তোমার নিকট আসিতে এত কষ্ট!"

এলেম,—"সুখও কি নাই!" এই বলিয়া সে ফকিরের হস্তধারণ করিল। ফকির অনুভব করিল হৃদয়ের স্তরে স্তরে সেই অব্যক্ত-মধুর স্পর্শ সঞ্চালিত হইয়া, তাহার অবসন্ন বৃত্তিগুলিকে পুনরায় সতেজ করিয়া তুলিয়াছে। উঠিয়া সে এলেমের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল; তখন নীচের জনমণ্ডলী হইতে অবিশ্রান্ত জয়ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

মিলন।

ঝড় থামিল, পৃথিবী আবার শান্তভাব ধারণ করিল। পরদিন বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে সমবেত হিন্দুমুসলমানের সমক্ষে আমিরের বৃদ্ধা মাতা উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাহার একদিকে অমৃত ও আদৃতা, অন্যদিকে আমির ও লাঞ্ছিতা উপবেশন করিল। তাঁহাদের পদপ্রান্তে একদিকে সন্ন্যাসী ও শান্তা, অপরদিকে ফকির ও এলেম পরস্পর হাতে হাতে ধরিয়া উপবিষ্ট হইল। সভামণ্ডপের সর্ব্বত্র হিন্দুমুসলমানের ঐক্যতানে গীত মিলন-সঙ্গীতের স্বর উত্থিত হইল। পাপাত্মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহা হাতে তালি দিয়া গাহিতে লাগিলেন। তখন আকাশে সূর্য্যদেব বিরাজ করিতেছিল, দশদিক আলোকমালায় বিভূষিত হইয়া হাসিতেছিল। মুগ্ধ পবন বহিয়া বহিয়া সেই প্রীতির বার্ত্তা সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল।

গীত।

সমান হৃদয় হউক—ইত্যাদি

শান্তি-বচন।

"আজি শান্তি আসিয়া বিরাজ করুক পুণ্য মোদের দেশে
পরম ঐক্যে থাকুক সকলে ঘৃণা যাক্ দূরে ভেসে।
পুত্রে পিতায়, মাতা-দুহিতায় বিরোধ হউক দূর,
পত্নী-পতির মধুর মিলন হ'ক আর সুমধুর।

ভা'য়ে ভা'য়ে যদি দ্বন্দ্ব থাকে, তা' হক আজি অবসান,
ভগিনী যেন গো ভগিনীর প্রাণে বেদনা না করে দান।
জনে জনে যেন কর্ম্মে, বচনে, তোষে সকলের প্রাণ।
নানা যন্ত্রের আওয়াজ মিলিয়া উঠুক একটী তান।"

এখানে বলা উচিত যে এই ঘটনার পর হইতে আর কেহ জানবিবিকে প্রত্যক্ষ করে নাই! বেহুনাও অদৃশ্য হইয়াছিল, কিন্তু লোকে বলিত আজও তাহার বিলাপধ্বনি মৃদু পবনে বাহিত হইয়া পথহারা পথিককে চমকিত করিয়া যায়।

"তীর্থসলিল" হইতে গৃহীত